বিমল মিত্র

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীচরণেষু

॥ বিমল মিত্রের এযাবৎ লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা ॥

কড়ি দিয়ে কিনলাম		এক রাজার ছয় রানী
বেগম মেরী বিশ্বাস		প্রথম পুরুষ
সাহেব বিবি গোলাম		গুলমোহর
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)		রাণী সাহেবা
একক দশক শতক		বিষয় বিষ নয়
একক দশক শতক (নাটক)		কাহিনী সপ্তক
পতি পরম গুরু		কলকাতা থেকে বলছি
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন		বাহার
চার চোখের খেলা		বিমল মিত্রের গল্পসম্ভার
নফর সংকীর্তন		কথা চরিত মানস
শ্রেষ্ঠ গল্প		মৃত্যুহীন প্রাণ
সখী সমাচার		টক ঝাল মিষ্টি
সাহিত্য বিচিত্রা		পুতুল দিদি
মিথুন লগ্ন		মনে রইলো
ফুল ফুটুক		হাতে রইল তিন
ও হেনরির গল্প (অনুবাদ)		দিনের পর দিন
ইয়ালিং (অনুবাদ)		শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
মন কেমন করে		তোমরা দু'জন মিলে
অন্যরূপ		তিন ছয় নয়
নিশিপালন		নিবেদন ইতি
কন্যাপক্ষ		রং বদলায়
সরস্বতীয়া		সুয়োরানী
বরনারী (জাবালি)		নবাবী আমল
চলো কলকাতা		নটনী
বেনারসী	আমি বিশ্বাস করি	বিনিদ্র
কুমারী ব্রত	পরস্ত্রী	কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
তিন নম্বর সাক্ষী	আসামী হাজির	যে যেমন
এর নাম সংসার	লজ্জাহরণ	চাঁদের দাম এক পয়সা
রাগ ভৈরব	স্ত্রী	দু চোখের বালাই

[এই তালিকা-ভুক্ত বইগুলি ছাড়া বাজারে বিমল মিত্রের নামে যে শতাধিক বই চলছে তার সবগুলিই জাল]

প্রাক্‌-কথন

শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি লেখায় একবার পড়েছিলাম যে "খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়।" অর্থাৎ কড়ি খেলায় কড়িটা হলো উপলক্ষ্য, খেলাটাই আসল।

তা সাহিত্য কানাকড়িও নয় আর খেলার বস্তু তো নয়ই। কিন্তু তবু কথাটা মনে এল। মনে আসার কারণ, বহুদিন আগে, বোধহয় ১৯৫৮-৫৯ সালে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে উপন্যাস-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যতদূর মনে আছে আমি সেদিন বলেছিলাম যে উপন্যাস এমনই এক শাস্ত্র যাকে ব্যাকরণের নিগড় দিয়ে বন্দী করা যায় না। কোনও ধরা-বাঁধা ছকের আশ্রয়ে তার বিস্তার বা বিকাশ সীমাবদ্ধ নয়। সে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র একটি সত্তা। উপন্যাস সম্বন্ধে এই মতটি কোনও শাস্ত্রে লেখা না থাকলেও উপন্যাসের সৃষ্টি ও প্রসারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের ফলে এই তত্ত্বটিই আমার কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। সেই একজন কি দু'জন নায়ক আর একজন কি দু'জন নায়িকা আর তারপর তাদের মিলন বা বিরহের হের-ফের নিয়ে কোটি কোটি উপন্যাস লেখা হয়েছে। কখনও নায়ক-নায়িকার বদলে দেশ বা ইতিহাস আবার কখনও অতীত বা বা বর্তমানের ব্যাখ্যা। শিল্পের সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের কাজটাও কখনও কখনও সমাধা করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

আমার বন্ধুদের বক্তব্য ছিল যে উপন্যাসের অনেক বয়েস হয়েছে, এখন তার কর্মক্ষমতাও কমেছে, সুতরাং আজ তার অবসর নেওয়া উচিত। কারণ সব উপন্যাসই নাকি তাদের কাছে চর্বিত-চর্বণ বলে মনে হচ্ছে।

আমি সেদিন বলেছিলাম যে,—'খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়।'

আমার যুক্তির সারবত্তা প্রমাণের জন্যে আমি দু'জন পুরুষ আর একটা ইতর প্রাণীকে কেন্দ্র করে একটা তুচ্ছ কাহিনীর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম যে এই কানাকড়ি নিয়েও আমি উপন্যাস রচনা করবার চেষ্টা করতে পারি।

বন্ধুরা আমার সঙ্গে সেদিন একমত হন নি। বলেছিলেন—এ-ঘটনা নিয়ে উপন্যাস হয়ই না।

কিন্তু সেই সামান্য একটি গল্প-বিন্দু যে এই চৌদ্দ বছর ধরে এমন করে আমার ভাব-জগৎকে অনুসরণ করে আসবে তা আমি ভাবতে পারিনি। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে শয়নে-স্বপনে আমি তাকে মন থেকে আর কিছুতেই তাড়াতে পারি না। শেষকালে ১৯৬৩ সালে একটি পত্রিকায় ছ'সাতটি সংখ্যায় এই 'আমি' উপন্যাস প্রকাশ হয়ে হঠাৎ তা একদিন বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৬৫ সালে আবার আর একটি পত্রিকায়। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন চালানো সম্ভব হয়নি। শেষকালে ১৯৬৮ সাল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তৃতীয় একটি পত্রিকায় আড়াই বছর ধরে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর আবার হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে বসে বাকিটুকু শেষ করতে লাগলো ১৯৭২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আমার জীবনে কত দুর্যোগ, কত দুর্বিপাক, কত দুর্ঘটনা যে ঘটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমার মত কর্মবিমুখ লোকও যে কোন এই দুরূহ সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয়নি তা আমার নিজের কাছেই এক মহা বিস্ময়। এ কৃতিত্ব যে কার তা আমি জানি না।

আর একটা কথা। যাদের সঙ্গে তর্কসূত্রে 'আমি'র সৃষ্টি তাঁরা আজ আর ইহলোকে বর্তমান নেই। বর্তমান থাকলে তাঁদের একটা কথাই শুধু জিজ্ঞেস করতাম—জিজ্ঞেস করতাম কানাকড়ি নিয়ে আমি খেলতে পেরেছি, না কি পারিনি।

বিমল মিত্র

আমি

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে সম্প্রতি অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-মহলে আমার জনপ্রিয়তার ফলেই এই দুর্ঘটনা সম্ভব হয়েছে। ও নামে কোনও দ্বিতীয় লেখক নেই। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে সেগুলি সম্পূর্ণ জাল বই। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

সুখ নিয়ে অনেকে অনেক কিছু ভেবেছে। অনেক মাথা ঘামিয়েছে। সুখের পেছনে মানুষ অনেক দৌড়িয়েছে। সুখের আশায় সংসার ছেড়ে বনে চলে গেছে এমন নজির ইতিহাসে আছে। কিন্তু দুঃখ? দুঃখী মানুষের কথা আলাদা। তাদের কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। সংসারে সুখের রকমফের নেই, তাই সুখী মানুষকে দেখলেই চেনা যায়; কিন্তু দুঃখ আরো গভীর, আরো ব্যাপক; দুঃখ মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দেয়, দুঃখ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, দুঃখ মানুষকে ব্যক্তিত্ব দেয়। সুখের শেষ খুঁজলে তা পাওয়া যেতেও পারে, কিন্তু দুঃখ অশেষ। সুখ চাইলেই পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখ দুর্লভ। দুঃখ দুর্লভ বটে, কিন্তু অন্য দুর্লভ জিনিসের মত সংসারে কেউ দুঃখ চায় না। সুখ চেয়ে সুখ না-পাওয়ার পরও লোকে মনেপ্রাণে সুখই কামনা করে। আর না-চাইতেই দুঃখ পাওয়া যায় বলে দুঃখের এত অনাদর। কিন্তু সেই অনাদরের সামগ্রাই মূলধন হিসেবে খাটিয়ে কত মানুষ যে মোটা ডিভিডেণ্ড পেয়ে মহাজন হয়ে গেছেন, ইতিহাসে তার অসংখ্য নজির আছে।

আজ আমাকে গালাগালি দেবার লোকেরও অভাব নেই, প্রশংসা করবার লোকেরও বড় প্রাদুর্ভাব। দিনরাত চারদিকে কেবল মানুষ-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা। খাওয়ার সময়ও কেউ একলা চুপি চুপি খেতে দেবে না। সামনে এসে বসে। বলে—এ কী-রকম খাওয়া আপনার? এ রকম করে শরীর টি঳কবে কেমন করে জ্যোতিদা—

কেউ বলে—জ্যোতিদা—

আবার কেউ বলে— জ্যোতির্ময়বাবু···

জ্যোতির্ময় সেন নিজেই জানেন এটা তাঁর বাইরের পরিচয়। আড়ালে তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে। অন্য বিশেষণ। সব বিশেষণগুলোই যে তাঁর ভাল লাগে শুনতে, তা নয়। আঘাতও করে তাঁকে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী পড়া আছে তাঁর। রাশিয়ার জার বা ইংলণ্ডের প্রাইম-মিনিস্টারদের অনেকের জীবনীই পড়া আছে। কেউ কি দুঃখ চেয়েছিলেন তাঁরা? আর দুঃখ পাওয়ার পর কি তাঁরা তাঁর মত এমনি করে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিলেন? বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন? দুঃখ কি তাঁদেরও ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল? নিজের সঙ্গে সকলকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে

নিয়েছেন তিনি। নিজের জীবনের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের জীবনের ঘটনাও ওজন করে দেখেছেন।

—জ্যোতিদা—

হঠাৎ ভাবনার মধ্যে বাধা পড়লো। বহুদিন পরে এই রকম বিশ্রাম পেয়েছেন জ্যোতির্ময় সেন। কাল রাত্রে এসেছেন ময়নাডাঙায়। সেই ময়নাডাঙা। নামটা মনে আছে এখনও। নটবর, নুটু! এতদিন পরে আবার ময়নাডাঙায় আসতে হবে তা কে জানতো! কাল রাত থেকেই ভাবছেন কথাগুলো। তাঁর আসার খবর এ-ডিস্ট্রিক্টের লোকেরা অনেকদিন আগেই জেনে গেছে। এখানকার জেলা-কংগ্রেস অফিস, মণ্ডল-কংগ্রেস অফিস, এস. ডি. ও, সার্কেল-অফিসার, পুলিস সুপার থেকে শুরু করে ব্লক অফিসের সামান্য কেরানী, এমন কি এখানকার চৌকিদার পর্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে গেছে যে চিফ্ মিনিস্টার আসছে। আচ্ছা, এও তো একরকম সম্মান! রাজ-সম্মানই তো বলে একে। সেকালের রাজারা এই সম্মানটুকুর জন্যেই তো প্রজাদের গর্দান নিয়েছে। এখন গণতন্ত্রে গর্দান নেওয়া উঠে গেছে, কিন্তু অন্যরকমের গর্দান নেওয়া আছে। গর্দান নেওয়াও যেমন আছে, খেতাব দেওয়াও তেমনি আছে। শুধু নামটাই যা বদলে গেছে, এই যা।

ছেলেটা বড় ব্যস্তবাগীশ। এখানকার কংগ্রেস অফিসের একজন পাণ্ডা। খুব খদ্দর-টদ্দর পরেছে। কাল থেকেই খুব খাতির করছে। একটু বেশি রকম খোশামোদ করতে চাইছে। হয়ত কিছু চায় কিংবা হয়ত শুধু খাতির করেই, শুধু সামনে এসে সেবা করবার সুযোগ পেয়েই ধন্য হবে।

—রাত্রে কোনও অসুবিধে হয়নি তো আপনার? ঘুম হয়েছিল? চা'টা কেমন খেলেন?

—ভালো।

—তাহলে আর এক পট্ বানাতে বলি—

বলে তাড়াতাড়ি এক লাফে শংকর বাইরে চলে গেল। অর্থাৎ আমাকে সে খাতির করবেই—

শংকরকে আমি ডেকে থামাতে পারতাম। কিন্তু কী জানি কেন, থামালাম না। তবে কি এই খোশামোদ ভালো লাগছে তাঁর? এককালে তো কেউ খোশামোদ করলে তাঁর ভালো লাগতো না। এখন এই মন্ত্রী হবার

পর কি খোশামোদপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি!" কোথায় যেন একটা কথা পড়েছিলেন, মনে আছে। আজ তাঁর আবার সেই কথাটা মনে করতে ভালো লাগলো। The rich man despises those who flatter him too much, and hates those who do not flatter him at all, অথচ ছেলেটা তো স্পষ্টই তাঁকে খোশামোদ করছে বোঝা যাচ্ছে। বেশ ফরসা গায়ের রং, খাকী খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছে, বয়েস বেশি নয়। বোধ হয় ছাব্বিশও পেরোয়নি।

—তোমার বাড়ি কোথায় শংকর? এই ময়নাডাঙায়?

—না জ্যোতিদা, আমি থাকি বাঘজোলায়, এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে। কিন্তু ঘুরতে হয় সব জায়গাতেই, সেবার ফ্লাড্-রিলিফের সময় ছিলাম এখানে কয়েকদিন। সাঁতার কেটে কেটে আমরা সব রিলিফ-ওয়ার্ক করেছি এখানে।

তারপর হঠাৎ থেমে বললে—আমি আপনার জন্যে ওই চা'টা নিজে কলকাতা থেকে কিনে এনেছি, কুড়ি টাকা পাউণ্ড—

আবার ভালো করে ছেলেটার মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তারপর বললেন—মীটিং-এর কদ্দুর?

—সব রেডি, আপনি বলেছিলেন যে আপনি একটু নিরিবিলি থাকতে চান তাই কেউ আর বিরক্ত করতে আসছে না, সবাইকে বারণ করে দেওয়া হয়েছে, আমি শুধু একলাই আপনার দেখা-শোনা করতে এখানে আছি, কাল রাত্তিরে আমি নিচের ঘরে শুয়েছিলুম—

হঠাৎ, জ্যোতির্ময় সেনের কী খেয়াল হলো, বললেন—ময়নাডাঙায় দক্ষিণপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, তুমি জানো?

—দক্ষিণপাড়া? দক্ষিণপাড়ার লোকেরা সবাই তো আসছে আজকে। আপনার এখানে এসেই সবাই হানা দিত, কিন্তু নেহাত্ত পুলিস রয়েছে দরজায়, তাই...

—পুলিস রয়েছে নাকি?

—পুলিস থাকবে না? পুলিস না থাকলে এতক্ষণ কি আপনি এখানে টিঁকতে পারতেন?

বেশ মজা লাগছিল শংকরের কথাগুলো শুনতে। জিজ্ঞেস করলেন—কেন? টিঁকতে পারতুম না কেন?

—বাঃ আপনি এসেছেন, আর সবাই চুপ করে বসে থাকবে? নইলে এতক্ষণ দেখতেন আপনার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

—পায়ের ধুলো!

জ্যোতির্ময় সেন বিস্মিত হবার ভান করলেন। পায়ের ধুলো তিনি যে কাউকে দেন না তা নয়। কিন্তু দিতে ভালো লাগে না। আর তা ছাড়া পায়ের ধুলো নেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন প্রভু-ভৃত্যের একটা সম্পর্ক উহ্য থাকে। অথচ প্রভু-ভৃত্য ছাড়া সম্পর্কটা আর কী হতে পারে। জীবনে নিজে তিনি কখনো কারো পায়ের ধুলো নেননি। একমাত্র ঠাকুরের ছাড়া আর কারো পায়ের ধুলো নেওয়ার মধ্যেও মনের দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। আর বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পা দুটোও যে আর সেরকম নেই। গোড়ালির দিকটায় ফেটে ফেটে গেছে। একটু ঘাম হলেই তার ওপর ধুলো আটকে যায়। পা দুটোও নোংরা দেখায় বড়। লজ্জা করে। ওরা জানে না। ওরা বুঝতেও পারে না। ওরা ভাবে আমার বিনয় ওটা। কিন্তু আসলে এই পা নিয়ে জ্যোতির্ময় সেনের জীবনে যে কত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তা এই এরা কেউ জানে না। জানে সেই নুটু—নটবর। আজ নটবর তাঁকে চিনতেও পারবে না হয়ত। নটবরকে কেউ হয়ত খবরই দেয়নি যে তার জ্যোতি এখন মিনিস্টার হয়েছে। নটবরের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হয়েছে। নটবরের পা'টা এখন কেমন আছে কে জানে! আশ্চর্য, নটবরের পায়ের ওপরেই ছিল বিধাতার যত রাগ।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন—হ্যাঁরে নুটু, তোর পায়ের জন্যে কষ্ট হয় না?

—কষ্ট? কীসের কষ্ট? এই ছাখ্—

বলে সেই খোঁড়া পা নিয়েই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করতো নটবর। নুটুর পায়ের গোড়ালি দুটো বেঁকে দুমড়ে কেমন একরকম অদ্ভুত চেহারা হয়ে গিয়েছিল। সেই খোঁড়া পায়েই হেঁটে হেঁটে তলার চামড়াটায় কড়া পড়ে গিয়েছিল বেশ। সেই পা নিয়েই সে গরুর গাড়ি চালাতো, ক্ষেতের কাজ করতো, আর বৈকুণ্ঠকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো মাঠে মাঠে।

আশ্চর্য, সেই বৈকুণ্ঠর কথাটাও মনে পড়লো তাঁর।

—এই ছাখ্, আমিও খোঁড়া, আমার বৈকুণ্ঠও খোঁড়া, আমরা দুজনে মানিকজোড়।

বৈকুণ্ঠও লাফাতো নুটুর সঙ্গে। এই ময়নাডাঙার দক্ষিণপাড়ার একটা চালাঘরেই একদিন যেন তিনি জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন। জীবনের নাকি মানে নেই। সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে সব কবিই তো তাই-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অথচ এখানে এই ময়নাডাঙাতেই তো তাঁর প্রথম জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। একেবারে প্রথম। সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ। তারপর কত কী ঘটে গেল জীবনে। কত অদল-বদল হলো ইতিহাসের ভূগোলের আর মানুষের। কিন্তু আজ ময়নাডাঙায় এসে সেই নটবরের পা দুটোর কথাই কেবল মনে পড়ছে। ইংরেজী সাহিত্যে পা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি হয়নি। কিন্তু বাংলায় তো পায়ের ছড়াছড়ি। বাংলা কবিরা তো কবি নয়—পদকর্তা। গোটা পদাবলী সাহিত্যটাই তো পদবন্দনা, জয়দেবের 'পদপল্লবমুদারম্'। 'নমি আমি কবিগুরু, তব পদাম্বুজে'। পদাম্বুজ। রূপক কর্মধারয়। কি আশ্চর্য! কত কষ্ট করে ব্যাকরণ পড়াতেন মাস্টারমশাই।

শুধু কি ব্যাকরণ? হরিসাধন চ্যাটার্জিকে বাবা বেছে বেছে রেখেছিলেন ছেলের লেখাপড়ার জন্যে। সেই হরিসাধনবাবু যদি এখন বেঁচে থাকতেন! তিনি অবশ্য দেখে যেতে পেরেছেন তাঁরই ছাত্র আজ কী হয়েছে।

সেই মাস্টারমশাই গল্প করে সব বোঝাতেন।

বলতেন—দেখ, একটা ভূত ছিল—তার কোনও বন্ধু ছিল না—

জ্যোতি জিজ্ঞেস করতো—ভূত কি সত্যি-সত্যিই আছে নাকি মাস্টার মশাই?

মাস্টারমশাই বলতেন—পৃথিবীতে না থাক, গল্পের পৃথিবীতে তো ভূত আছে। তা সেই ভূতটা একলা-একলা কেবল ঘুরে বেড়াত, আর সব সময় ভাবতো কবে তার একটা বন্ধু জুটবে। ভাবতে ভাবতে দিন মাস বছর কেটে যেতে লাগল। কেউ আর তার বন্ধু হয় না। শেষকালে একদিন সে একটা মতলব বার করলে। শনিবার-মঙ্গলবারে অপঘাতে মরলে মানুষ ভূত হয়, তা সে জানতো। তাই শনি-মঙ্গলবারগুলোতে ভূতটার বড় আশা হতো। আজ বোধ হয় কেউ হোঁচট খেয়ে পড়বে আর মরবে। আজ বোধহয় কেউ গাছে আম পাড়তে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়বে আর মরে ভূত হবে। তার সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব করতে পারবে। কিন্তু কি কপাল, কেউ আর মরে না। মানুষ রাস্তায় কলতলায় হোঁচট খায়, পড়েও যায়, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়ায়। মরে না কেউ—ভূত আর কেউ হয় না, শেষকালে…

—একলা থাকতে ভাল লাগতো না কেন স্যার ভূতের ?

মাস্টারমশাই বলতেন—একলা-একলা থাকতে কি কারো ভালো লাগে ?

—কিন্তু আমি তো সারাদিন একলা থাকি স্যার।

—তুমি তো আর ভূত নও, তুমি মানুষ। আর তুমি একলাই বা থাকো কোথায় ? তুমি তো সারাদিন রঘুর সঙ্গে গল্প করতে পারো। রঘুর সঙ্গে খেলা করতে পারো। তোমার জন্যে খেলার মাঠ করে দিয়েছেন তোমার বাবা, তোমায় ফুটবল কিনে দিয়েছেন, তোমার বই আছে, লেখাপড়া আছে, আমি আছি—

ছোট গোলগাল মানুষটি। সকালে দু'ঘণ্টা, সন্ধ্যেবেলা দু'ঘণ্টা পড়াতে আসতেন। যতক্ষণ মাস্টারমশাই না আসতেন ততক্ষণ খারাপ লাগতো। আজকালকার ছেলেরা সে কথা ভাবতেও পারবে না। সমস্তক্ষণ ফাঁকা লাগতো। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক-একদিন হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করতো তাঁর। বাবা ছিলেন রাশভারি মানুষ। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মত গম্ভীর মুখখানা। তাঁর চেয়ে বয়েস কম। অনেকটা প্রায় ইংরেজী সাহিত্যের জি. কে. চেস্টারটনের মত। জি. কে. চেস্টারটন ছিলেন রসিক মানুষ। বাবাও রসিক। কিন্তু বাবার রসনা ছিল বড় তীক্ষ্ণ। মনের সবগুলো অনুভূতি যেন একটা কথায় প্রকাশ করে বাকি ফাঁকটা শুধু স্তব্ধতা দিয়ে ভরাট করে দিতেন। চুপ করে থাকাটাই যেন ছিল বাবার আত্মপ্রকাশ। তিনি চুপ করে থাকলেই বুঝতে পারতাম তিনি ব্যস্ত আছেন। কথা বলাটা ছিল তাঁর অবসর-বিনোদন। কথা সবাই বলতে পারে, কিন্তু চুপ করে থাকতে জানে ক'জন। বাবার কাছে ছিল শব্দটা ব্রহ্ম। তাই শব্দকে অযথা অপব্যবহার করে কলঙ্কিত করতে চাইতেন না তিনি।

মনে আছে চাকর-বাকর ঝি ড্রাইভার দারোয়ান সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো বাবার জন্যে। বাড়িতে একটা মাত্র ছেলে। অতবড় বাড়ির ভেতরেও ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে উঠতাম। মনে হতো বাড়িটা যেন এক মিনিটেই ফুরিয়ে দেওয়া যায়। ঠিক পুবদিকের ঝিলিমিলিটার ফাঁক দিয়ে সকালবেলা চেরা-চেরা রোদের ফালিগুলো বিছানায় এসে পড়তো। আর খানিক পরে বিছানা থেকে সরে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালে উঠতো। রোদগুলো ভারি দুষ্টুও ছিল আবার। ধরা দিত না মোটে। হাত দিয়ে ধরতে গেলেই হাতের ওপর লাফিয়ে উঠে বসতো। তারপর আর কিছুতেই ধরতে পারি না।

শেষকালে কখন যে রোদগুলো ঘর থেকে পালিয়ে যেত টের পেতাম না। ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে বাগানে। শেষকালে ছাদে গিয়েও আর তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। কোথায় লুকিয়ে পড়তো, সারা রাত আর তার দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। মনে হতো রোদগুলোও যেন বাবার মত। বাবাকে একটুখানি দেখতে-না-দেখতে কোথায় যে চলে যেতেন। বাবার অনেক কাজ ছিল। বাবার কাজের ঘরে আমি যেতে পেতাম না। সেদিকে গেলেই রঘু বাধা দিত। বলতো—না খোকাবাবু, ওদিকে যেও না—বাবু বকবে—

সেই বাবাই একদিন সোজাসুজি পড়বার ঘরে এসে হাজির।

মাস্টারমশাই বাবাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—কী রকম পড়ছে খোকা ?

—আজ্ঞে খুব ইনটেলিজেন্ট—

বাবা আমার দিকে চাইলেন। আমিও চাইলাম বাবার মুখের দিকে। বাবাকে দেখতে পেতুম না তো বেশি। তাই দেখতাম চেয়ে চেয়ে। কাঁচা-পাকা গোঁফ ভর্তি মুখ। কপালের নিচেয় চোখের ওপর মোটা একজোড়া ভ্রূ। বাবার দিকে চেয়ে বুঝতে পারতাম না সে-মুখে স্নেহ-ভালবাসা না মমতা, কী আছে। এক-একবার মনে হতো বাবা বুঝি খুব বুদ্ধিমান। আবার মনে হতো বাবা বুঝি খুব বোকা। আবার এক-এক সময় মনে হতো বুঝি খুব কড়া মানুষ।

—ইংলিশটার দিকেই বেশি করে দেখবেন, বিদেশী ভাষা তো—

তারপর বলতেন—এখন থেকে ওর সঙ্গে ইংরিজীতে কথা বলবেন আপনি—

ব্যস, ওই পর্যন্ত। তারপর আর মাসখানেক হয়ত দেখা নেই। তখন কোথায় যে বাবা থাকতেন তার ঠিক নেই। রঘু বলতো বাবু এলাহাবাদ গেছে। কখনও এলাহাবাদ, কখনও পাটনা, আবার কখনও বা বোম্বাই। কোথায় যে সে দেশগুলো তা জানতাম না। মনে মনে কল্পনা করতাম সে দেশগুলোর চেহারা। সেখানেও কি আমার বাবার মত বাবারা আছে ? আমার মত ছেলেরা আছে ? তারা উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির মধ্যে খেলা করে! ঠিক সন্ধ্যে হলে দেখতাম কতগুলো বাদুড় মাথার ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

রঘু বলতো—ওরা সব আঁশফল খেতে যাচ্ছে—

—কোথায় আঁশফল আছে রে?

—ওই টালিগঞ্জে। টালিগঞ্জে নবাবের আঁশফলের বাগান আছে, চিঁড়িয়াখানা থেকে সব সেইদিকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসবে ভোরবেলা—

বাদুড়গুলোর সঙ্গে আমিও যেন টালিগঞ্জের নবাবের বাগানের আঁশফল খেতে যেতুম। রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমারও মনে হতো আমি যেন হঠাৎ উড়তে শিখেছি। আমাদের বাড়ির পাঁচিলটা টপ্‌কে যেন বাতাসে ভেসে ভেসে অনেকদূর চলেছি। রঘু নেই, বাবা নেই, মাস্টার-মশাই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার আকাশের বুক চিরে চিরে আমার পিঠের পাখা দুটো শুধু হুশহুশ শব্দ করছে। উড়তে উড়তে একেবারে টালিগঞ্জের নবাবের বাগানের ভেতরে আঁশফল গাছের ডগায় গিয়ে নেমেছি। মাঝে মাঝে জোনাকি জ্বলছে, আর বাদুড়ের দল আমাকে ঘিরে রয়েছে। সমস্ত রাত ধরে মজা করছি। তারপর ভোর হবার আগেই আবার এসে বিছানায় চুপি চুপি শুয়ে পড়েছি, রঘু টের পায়নি। রঘু ভোরবেলা বিছানার পাশে এসে ডাকতো—খোকাবাবু, ওঠো ওঠো—

বাবার সব কড়া হুকুম দেওয়া ছিল রঘুর ওপর। অদ্ভুত সে-সব হুকুম। প্রথমে হাতের পাতায় সরষের তেল নিয়ে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজতে হবে। তারপর বুরুশ। তারপর জলখাবার। জলখাবারের বাঁধা লিস্ট্ ছিল রঘুর কাছে। আজ যদি লুচি হয়, কালকে তাহলে পাঁউরুটি। পরশু টোস্ট্ আর কলা আর দুধ। যাতে ভিটামিন আছে সেই সব বাছা বাছা জিনিস দিয়েই আমার জলখাবারের লিস্ট্ করা হয়েছিল। তার থেকে এক তিল নড়বার উপায় ছিল না। অথচ নটবর? মোটা মোটা চালের পান্তাভাত খেয়ে নুটুর কী শক্তি! নুটু তার গরুর-গাড়িটাকে একলা ছ'মাইল চালিয়ে নিয়ে যেত, আবার ছ'মাইল চালিয়ে নিয়ে আসতো সেই এক কাঁসি পান্তাভাত খেয়ে।

নুটু বলতো—কখনও কাঁঠাল বিচি ভাজা দিয়ে পান্তাভাত খেইছিস?

শুধু নুটু একলা নয় বৈকুণ্ঠকেও খেতে দিত পান্তাভাত। খেয়ে খেয়ে এমনি ইয়া মোটা হয়ে গিয়েছিল আগে। বৈকুণ্ঠর সে-চেহারা দেখেননি তিনি। নুটুর কাছেই শুনেছিলেন, আগে নাকি বৈকুণ্ঠকে দেখতে আরো ভালো ছিল। কিন্তু না-খেতে পেয়ে পেয়ে তখন রোগা হয়ে গিয়েছে। নুটুর সঙ্গেই মাইলের পর মাইল হেঁটে যেত আর হেঁটে আসতো।

মুটু বলতো—আমিও আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছি, জানিস—

—কেন? তাহলে তুই ডিম খাস না কেন?

—ডিম?

কথাটা শুনে মুটু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—ডিম তো ময়নাডাঙার বাবুরা খায়, আমরা যখন হাঁস পুষতুম, ডিমগুলো বেচে দিতুম বাবুদের বাড়ি—

এই যে-বাড়িতে এখন বসে আছেন জ্যোতির্ময় সেন, এককালে এই বাড়িটাই ছিল বাবুদের। বাবুদের মানে ময়নাডাঙার জমিদারদের। আগে দূর থেকে দেখেছেন এ-বাড়িটা। এ-বাড়ির ভেতরে ঢোকবার সাহস ছিল না মুটুর। এখনও সাহস হবে না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও এখানে তাকে দরজায় আটকে দেবে পুলিসরা।

—কে?

হঠাৎ জ্যোতির্ময় সেন যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। এতক্ষণ যেন ভুলেই গিয়েছিলেন নিজেকে।

—কী রে?

রতন জ্যোতির্ময় সেনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে সব সময়। তাঁর সঙ্গে ঘুরে রতনেরও অনেক দেশ দেখা হয়ে গেছে। সে বললে—একজন লোক আপনার জন্যে টাটকা রসগোল্লা এনেছে, নেব?

—কে, লোকটা কে? নাম কী? মুটু? নটবর?

প্রায় বলতে গেলে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিলেন তিনি। মিষ্টির দোকান করেছে নাকি নটবর? শেষ পর্যন্ত নটবর খবর পেয়ে গেছে বুঝি?

—আজ্ঞে না, এর রেল-বাজারে দোকান আছে,—এর নাম বিষ্টুপদ ঘোষ।

জ্যোতির্ময় সেন আবার চেয়ারে হেলান দিলেন। দরকার নেই। নিশ্চয় সার্টিফিকেট চাইবে। তার দোকানের তৈরি রসগোল্লা খেয়ে তাঁর ভাল লেগেছে—এই কথাটা তাঁর নিজের প্যাডের কাগজে লিখে নিচেয় নিজের নাম সই করে দিতে হবে। সেই কাগজখানা সে দোকানে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখবে। কিংবা বিজ্ঞাপন দেবে খবরের কাগজে।

রতন চলে গেল। ভেবেছিলেন এখানে এসে সমস্তটা দিন বিশ্রাম নেবেন। তা ঠিক হলো না। মাস্টারমশাই পড়িয়েছিলেন ছোটবেলায় প্লুটার্কের একটি কথা—Rest is the sweet sauce of labour, অথচ এককালে

সেই ভূতটার মত তাঁর সময়ই কাটতে চাইতো না। বিশ্রামের যন্ত্রণায় বাড়িতে একলা-একলা ছট্‌ফট করে বেড়িয়েছেন। সত্যি, চিরটাকাল ছট্‌ফট্ করে করেই তাঁর গেল। ছোটবেলায় যেমন বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করতো, এখনও তেমনি। এখনও সেক্রেটারিয়েট ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। রাজা দশরথের ছেলে রামেরও হয়ত এই দশা হয়েছিল। একদিন বাবার কাছে গিয়ে রামচন্দ্র বললেন—আমি সংসার ছেড়ে চলে যাবো পিতা—

—কোথায় যাবে? রাজা দশরথ জিজ্ঞেস করলেন।

রামচন্দ্র বললেন---বনে --

—তা এত সুখ-ঐশ্বর্য ফেলে বনে যাবে কেন? এখানে তোমার কিসের অভাব? তোমার কী চাই বলো?

—আমি বনে গিয়ে ভগবানের তপস্যা করবো।

রাজার ছেলের পক্ষে এ এক অদ্ভুত কথা। মহা বিপদে পড়লেন রাজা দশরথ। কোন উপায় না পেয়ে বশিষ্ঠ ঋষির কাছে রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন -- তিনি যদি তোমাকে বলেন বনে যেতে তো তখন না-হয় যেও—

তা তাই হলো। রামচন্দ্র গুরুদেব বশিষ্ঠের কাছে গেলেন। তিনিও ওই একই কথা বললেন। বললেন, ভগবান কি শুধু বনেই আছেন, সংসারে নেই?

এর আর জবাব দিতে পারলেন না রামচন্দ্র। এরই ফলে রামায়ণে কত কাণ্ড হয়ে গেল। তাড়কারাক্ষসী-বধ, হরধনুভঙ্গ, চৌদ্দ-বছর বনবাস, সীতা-হরণ, রাবণ বধ, সীতা-উদ্ধার, সীতার পাতাল প্রবেশ, কত ঝঞ্ঝাট, কত ঝামেলা ভোগ করতে হলো সারাটা জীবন। বনে চলে গেলে আর এ সব সহ্য করতে হতো না হয়ত। আর আজকাল তো সেই বনও উঠে গেল। বনমহোৎসব যত ঘটা করেই করা হোক, বন আর থাকবে না এখানে। দণ্ডকারণ্যেও তো মানুষ গিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে--

হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন জ্যোতির্ময় সেন।

—তুমি? হুটু না? নটবর?

এ কি চেহারা হয়ে গেছে! এত বয়েস হয়ে গেছে! একমুখ দাড়ি! দাড়িগুলো সাদা ধপধপে হয়ে পেকে গেছে। হুটু যদি বুড়ো হয়ে গিয়ে থাকে তো তিনিও তো বুড়ো হয়ে গেছেন! এতদিন এ-কথাটা তো ভুলে ছিলেন।

—তুমি কী করে জানলে নুটু আমি এখানে এসেছি ?

তারপর উঠে নুটুকে জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দিলেন। নিজেও পাশে বসলেন।

নুটু বসছিল না। একটু দ্বিধা করে বললে—আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন কর্তা, তাতেই আমি খুশী।

বলতে বলতে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে নুটু। তখন আর কথা বলার ক্ষমতা নেই তার।

জ্যোতির্ময় সেন হেসে ফেললেন—আরে তুমি কাঁদছো কেন নুটু ? কী হলো তোমার ? এতদিন পরে দেখা, কোথায় দুটো প্রাণের কথা বলবে, না কাঁদছো ?

নুটুর চোখ দিয়ে তখন আরো জল গড়িয়ে পড়ছে।

পরমহংসদেবের কথাটা মনে পড়লো। মাস্টারমশাইয়ের মুখে গল্পটা শোনা। চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারতে গেছেন। একটা জায়গায় গিয়ে দেখলেন একজন লোক সংস্কৃত গীতা পড়ছে, আর একজন লোক তার সামনে বসে অঝোর-ধারে কাঁদছে। চৈতন্যদেব অবাক হয়ে গেলেন। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গো, তুমি যে কাঁদছো, সংস্কৃত ভাষা বুঝতে পারছো ?

লোকটা বললে—না-ই বা বুঝতে পারলাম কর্তা, কথাগুলো তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের—

এও যেন সেই রকম। এই নুটুরাই দেবতা করে দিয়েছে তাঁকে। অথচ তার বুকের পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে গিয়েছে। কাপড়টা শতছিন্ন। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে একটা ভালো কাপড়ও নেই এদের। আহা, এদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

তারপর এক কাণ্ড করে বসলো নুটু। হঠাৎ মাটিতে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেললে। করেই চলে যাচ্ছিল নুটু।

—ছি ছি, তুমি করলে কী ? তুমি করলে কী ?

তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন নুটুকে। বললেন—আমি যে সেই জ্যোতি, নুটু, তোমার বন্ধু গো !

কিন্তু তবু নুটু যেন বুঝতে চায় না। সে যেন দেবদর্শন করে চলে যেতে প্রস্তুত। দেবতার সঙ্গে তো কেউ কথা বলে না। দেবতাকে শুধু ভক্তি করতে হয়, প্রণাম করতে হয়। তার চেয়ে বেশি কিছু যে আশা করতে নেই তাঁর কাছে।

বললাম—না না, তুমি ভুটো কথা বলো হুটু, অন্য লোকের কাছে আমি যা-ই হই, তোমার কাছে আমি মানুষ, তোমার বন্ধু। মনে নেই কতদিন তোমার গরুর-গাড়িতে আমি চড়েছি, কতদিন তোমার সঙ্গে এক কাঁসিতে পান্তাভাত খেয়েছি কাঁঠালবিচি ভাজা দিয়ে, কতদিন এক বিছানায় ঘুমিয়েছি দু'জনে। কতদিন দু'জনে হারান-কলুর ঘানি-গাছে চড়ে ঘুরেছি। সব কি তুমি ভুলে গেলে? আর তোমার সেই বৈকুণ্ঠ? বৈকুণ্ঠকে তুমি…

বলতে বলতে কথা বন্ধ হয়ে এল। আর বলতে পারলেন না তিনি। এখানে আসবার আগে অনেক কিছু বলবেন বলে ভেবে এসেছিলেন। হুটুর সঙ্গে দেখা করবেন এ-ইচ্ছেটাও তাঁর ছিল। কিন্তু সে যে এমন করে দেখা হবে তা ভাবতে পারেননি। পুলিসে আটকালো না তোমাকে? তোমাকে কিছু বললে না? তোমার এই ছেঁড়া কাপড়, খালি গা দেখেও ঢুকতে দিলে? জানো হুটু, ওরা আমাকে একেবারে ঠাকুর বানিয়ে রেখে দিয়েছে। আমি যার-তার সঙ্গে দেখা করতে পারি না, যে-সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। আমি তো এ চাইনি। আমি তো পালিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। ছোটবেলায় একদিন যেমন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম, পালিয়ে গিয়ে এই ময়নাডাঙায় এসেছিলুম, এখনও তেমনি পালিয়েই যেতে চাই। আগে ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে বাড়িতে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, এরাও আমাকে তেমনি আটকে রেখেছে। মনে হয় জীবনে আমি কি এই-ই চেয়েছিলাম? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আমিও তো একজন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা আমি এখন। তবু তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই হুটু, আমি তোমাদেরই লোক। আমি ফরসা জামা-কাপড় পরে আছি আর তোমার পরনে ছেঁড়া কাপড়। জানি তোমাকে আমার মতন ফরসা কাপড় পরাবার দায়িত্বটা এখন আমারই। জানি তুমি খেতে না পেলে আমার নিজেরও খাবার অধিকার নেই, জানি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন পৃথিবীর কোনও কোণে একজন লোকও যদি না খেতে পেয়ে মরে যায় তো তার দায়িত্ব অন্য সকলের। তোমার এ দারিদ্র্য শুধু তোমার দারিদ্র্যই নয় হুটু, এ পৃথিবীর সব মানুষের দারিদ্র্য। তোমার একলার পাপ পৃথিবীর সকলের পাপ। সব আমি জানি হুটু। পুণ্য যেমন ভাগ করে আমরা ভোগ করি, পাপও তো তেমনি ভাগ করেই ভোগ করা উচিত। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ

সকলের সব পুণ্যের ফল আমরা সবাই পাইকারি হারে ভোগ করে চলেছি, কিন্তু একজন চেঙ্গিস খাঁ কি নাদির শা কি কালাপাহাড়ের পাপের ভাগ কি আমরা নিয়েছি? সকলকে সব কথা বলাও যায় না। সবাই তা বুঝতেও পারে না। কিন্তু হুটু, তুমি তো আলাদা। তুমি তো আমাকে চেনো। তুমি বুঝতে পারো আর না-পারো তোমাকে বলেই আমি মনের ভার হাল্কা করে নিই। কাল রাত্রেই আমি এ নিয়ে আর একবার ভেবেছি। রোজই ভাবি। সুখের কোনও রকমফের নেই হুটু। তাই সুখী মানুষকে দেখলেই চেনা যায়। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করি একটা কথা, তুমি সুখী মানুষ কখনও দেখেছ? এই আমার কথাই ধরো না। আমি তো অনেক বুড়ো হলুম, অনেক তো দেখলুম—আমি তো সুখী মানুষ দেখতে পেলুম না। অনেক খুঁজেছি হুটু, ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম পেয়েছি তাদের জীবনও খুঁজে দেখেছি। জানো হুটু, কার্ল মার্কসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—হোয়াট ইজ্ হ্যাপিনেস? কাল মার্কস তার উত্তরে একটা শব্দ বলেছিলেন—স্ট্রাগল। সংগ্রাম। লড়াই। আমরা সবাই সেই লড়াই-ই করছি হুটু। তুমি তোমার নিজের অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করছো। তোমার নিজের ছেলে-মেয়ে-নাতি-পরিবার সকলের অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করছো। আমিও তাই। আমার কাছে আমার সমস্ত দেশটাই আমার পরিবার। তুমিও লড়াইতে জিততে পারোনি। আমিও পারিনি। আমরা দু'জনেই জিততে পারবো না। আমি জানি আমি তোমাকে ফরসা জামা-কাপড় পরাতে পারিনি, তোমাকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খাওয়াতে পারিনি। তোমায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই দিতে পারিনি। তবু লড়াই করে চলেছি। তাই তো বলছিলাম—দুঃখ বড় গভীর, দুঃখ বড় ব্যাপক। হাজার সাংসারিক সুখের মধ্যেও একদিন আমি এই দুঃখের তাড়নাতেই এই ময়না-ডাঙায় এসেছিলাম। আজও যে এসেছি এও সেই দুঃখেরই তাড়নায়। এতদিন যে তোমার সঙ্গে দেখা করিনি এও সেই দুঃখের তাড়নাতেই। দুঃখই তোমাকে আমাকে পৃথিবীর সব মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে হুটু—সুখ নয়। দুঃখই আমাদের সকলকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। এই দুঃখই যীশুখ্রীষ্টকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল, তথাগত বুদ্ধদেবকে পথের ধুলোয় নামিয়েছিল, চৈতন্যদেবকে নিঃসঙ্গ করেছিল। এই দুঃখই পৃথিবীতে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। সব লোকের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাঁদের বিচ্ছিন্ন

করেছিল। দুঃখের মূলধন নিয়েই তাঁরা মহাজন হয়ে আজো বেঁচে আছেন। দুঃখ কি অত সুলভ? দুঃখ দেখে ভয় পেলে চলবে কেন? আর আসলে, তোমাকে দেখবার জন্যেই একবার এখানে এলাম নুটু। মীটিংয়ের প্রসঙ্গ যখন তুললো ওরা তখন ভেবেছিলাম আসবো না কিন্তু টপ করে তোমার কথাটাই মনে পড়ে গেল। তোমাকে দেখতে আসা মানে আমার আমিকেই দেখতে আসা। যে-আমি এখানে সভাপতি হয়ে এসেছি সে-আমি আসল আমি নই। আসল আমির মালিকটা এখনও সেই ছেলেমানুষ হয়ে এই ময়না-ডাঙায় ঘুরে বেড়াতে চায়। সে-ই তোমার সঙ্গে গরুর-গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় খড়ের বোঝা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায়, সেই আগে যেমন বৈকুণ্ঠকে নিয়ে আমরা নিরুদ্দেশ হয়ে যেতাম। তুমি এখনও সেই রকমই আছো নুটু, আমিও সেই রকম আছি। আমাদের বাইরেটাই শুধু বদলেছে। এসো, আরো কাছে সরে এসো নুটু, আমার পাশে বোসো। তোমার কোনও ভয় নেই। কেউ তোমায় কিছু বলবে না, পুলিসরা তোমায় তাড়িয়ে দেবে না, এসো—। তুমি স্বামী বিবেকানন্দের নাম শোননি নুটু? তাঁর একটা চিঠিতে একটা ভারি ভালো কথা পড়েছিলাম। রাজা ভর্তৃহরি ছিলেন ভারতবর্ষে একজন সম্রাট আবার একদিকে সন্ন্যাসীও। তিনি বলেছেন—'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে দানব, তুমি কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের পথে চলে যাও—কাউকে ভয় কোর না—'

হঠাৎ শংকর বাইরের দরজা থেকে উঁকি দিলে। পাশে আরো দু'একজন লোক রয়েছেন। তারপর ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবতে লাগলো। বললে—রাত্রে বোধ হয় ঘুম হয়নি জ্যোতিদার, ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সামান্য শব্দতেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। জ্যোতির্ময় সেন আশে-পাশে চেয়ে দেখলেন। না, কেউ কোথাও নেই। তাহলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি! তারপর দরজার দিকে যেন কার শব্দ পেয়ে বললেন—কে?

সেক্রেটারিয়েট থেকে পালিয়ে এসেছেন এখানে। কিন্তু পালিয়ে এসেও মুক্তি নেই। অনেক সময় সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে পালালেও সংসার বনে গিয়ে হাজির হয়। সংসার ত্যাগ করলেই সংসার দূরে চলে যায় না। নিজেকেই ত্যাগ করতে হয়। নিজেকে ত্যাগ করলে তবে সংসার ছাড়ে। নিজেকে ত্যাগ মানেই তো অহং ত্যাগ। অহং মানে আমি। আর আমার আমিই তো আমার চরম শত্রু। তবে যেমন চরম শত্রু তেমনি আবার পরম বন্ধুও বটে।

একটা গল্প মনে পড়লো জ্যোতির্ময় সেনের।

স্বামী বিবেকানন্দ গল্পটা বলেছিলেন। একটা দেশের সীমান্তে সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে। ছাউনির ভেতরে সৈন্যরা থাকে আর বাইরে একজন পালা করে দিন-রাত পাহারা দেয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাহারা দিয়ে চলেছে তারা। হঠাৎ একজন পাহারাদার একদিন রাত্তিরবেলা চিৎকার করে উঠলো—ওহে তোমরা শিগ্‌গির এসো, একজন তাতার ধরেছি।

সত্যিই কেমন ভাবে যেন সৈন্যটা শত্রুপক্ষের একটা তাতার-সেনাকে ধরে ফেলেছিল।

ছাউনির ভেতরে সবাই তখন তাস খেলছে। খেলা ছেড়ে তাদের আর উঠতে ইচ্ছে হলো না। তারা ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো—বেটাকে ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে এসো—

সৈন্যটা তখন প্রাণপণে তাতারটাকে ধরে আছে। বললে—বেটা আসছে না -আসতে চাইছে না—

— তা হলে বেটাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি একলাই চলে এসো—

—বেটা আমাকেও ছাড়ছে না।

আশ্চর্য এরই নাম সংসার। আসবেও না আবার ছাড়বেও না। তাই তো বলছিলাম—আমিই আমার শত্রু আবার আমিই আমার পরম বন্ধু। একাধারে দুই। রামকৃষ্ণদেব বলতেন—ডিমের ভেতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তখন গাছটা মড়মড় করে আপনিই ভেঙে পড়ে। যখন খাল কেটে জল আসে, যখন আর একটু কাটলেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে,

তখন যে খাল কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায় আর নদীর জল হুড়হুড় করে খালে আসে। কিন্তু সরে দাঁড়াতেই বা ক'জন জানে?

শংকর বললে—জ্যোতিদা, ইনি হচ্ছেন এখানকার ব্লক ডেভেলপমেন্ট্ অফিসার, নিত্যানন্দ হাজরা, আমাদের কাঁকুড়গাছির ভবানন্দ হাজরা, মণ্ডল-কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, চেনেন তো?

চিনতে পারলাম না।

—সেই যে ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে ইলেকশানে দাঁড়িয়ে চল্লিশ হাজার ভোটে জিতেছিলেন? শেষকালে আবার কংগ্রেসে জয়েন করেছিলেন?

—তিনি কি বেঁচে আছেন?

শংকর বললে-না, তিনি তো নাইনটিন-ফিফটি-সিক্সেই করোনারিতে মারা গেছেন, ইনি তাঁরই বড় ছেলে, হিস্ট্রিতে সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ., রিসার্চের জন্যে থিসিস লিখছেন—

তারপর হঠাৎ নিত্যানন্দ হাজরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনার কী যেন সাবজেক্টটা?

সত্যিই সংসার থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, সেক্রেটারিয়েট থেকেও সরে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সরে দাঁড়ানো কি অত সহজ? বহুদিন আগে একবার বাড়ি থেকেই তো সরে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। সংসারের অত সুখ, অত ঐশ্বর্যও তো তাঁর ভালো লাগেনি। সব ছেড়ে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে—"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়িতে গেলে বুকে বাজে।" কিন্তু সেদিন সংসার ছাড়তে তো তাঁর কষ্ট হয়নি। সেদিন সংসার তো তাঁর নাগাল পায়নি।

সে তখন স্বদেশী যুগ। বাবা ব্যারিস্টারির কাজে কোথায় এলাহাবাদে না লখ্‌নৌতে চলে গিয়েছেন। বাড়িতে আমি একলা। আমি, আমার রঘু, আমার রোদ, আমার সূর্য, আমার আকাশ, আর আমার মাস্টারমশাই। সকালবেলা মাস্টারমশাই এসে আমাকে পড়িয়ে চলে গেছেন। ব্যাকরণ কৌমুদী, নেস্‌ফিল্ড্ সাহেবের গ্রামার আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি। বিকেল বেলাও তাঁর আর একবার আসবার কথা। যথারীতি হরিসাধনবাবু বিকেল-বেলা এলেন। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে দারোয়ান বসে থাকে। বৈজু বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয় না বটে, কিন্তু কে আসছে যাচ্ছে তার ওপর নজর

রাখে। সন্ধ্যেবেলার দিকে ছোট ঘরখানার ভেতরে বসে বসে কাঠ-কয়লার আগুনে চোদ্দ-পনেরখানা মোটা মোটা চাপাটি বানিয়ে নেয়। আর পেতলের লোটায় করে অড়র-ডাল রাঁধে। আমি যখন সন্ধ্যেবেলা বাগানে বেড়াই তখন বৈজুর অড়র-ডালের গন্ধ আমার নাকে ভেসে আসে। বৈজু আমার মতন ভিটামিন খেত না। সন্ধ্যেবেলা ওই ডাল-রুটি আর দুপুরবেলা ছাতু। ছাতু আর কাঁচা লঙ্কা। তাই খেয়েই বৈজুর চেহারা আমার থেকেও ভাল ছিল। আমার এক-একদিন বৈজুর ছাতু খেতে ইচ্ছে হতো, বৈজুর ডাল-রুটি খেতে ইচ্ছে হতো, কিন্তু লজ্জায় ভয়ে তা চাইতে পারতুম না। যখন রঘু কাছাকাছি থাকতো না, আমি গিয়ে বসতুম বৈজুর কাছে। আমি জিজ্ঞেস করতুম—তোমার দেশ কাঁহা বৈজু ?

বৈজু বলতো—দ্বারভাংগা—

—দ্বারভাংগা কোথায় গো ? কত দূরে ? কী করে যেতে হয় ? ট্রেনে না স্টীমারে ?

বৈজু বলতো—সে বহুৎ দূর খোকাবাবু !

—কত দূর ?

বৈজু বলতো—বহুৎ বহুৎ দূর—এক দিন ঔর এক রাত ভি যেতে লাগে—

আমি কল্পনা করে নিতাম মনে মনে। মনে মনে অনেক দূরের অনেকটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করতুম। কলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলা নামতে হবে মোকামা-জাংশানে। সেখানে স্টীমার পার হতে হতো। তখন গঙ্গার ওপর ব্রীজ্ তৈরী হয়নি। সেই স্টীমার পেরিয়ে সিমারিয়া ঘাটে নামতে হবে। তারপর ছোট লাইনে ছোট গাড়ি চড়ে দ্বারভাংগা। আমি বৈজুর দেশের গল্প শুনতাম। খুব আচ্ছা দেশ বৈজুর। খুব বড়িয়া দেশ। দ্বারভাংগাকা রাজা ভি হ্যায়। রাজাকা রাণী ভি হ্যায়। রাজাকা বহুৎ বড়া কোঠি ভি হ্যায়। ঔর ঘিউ, চাউল, দাল সস্তা ভি হ্যায়। বেশ মজা করে গল্প শুনছি বৈজুর ঘরে বসে বসে, হঠাৎ রঘু এসে ধরে নিয়ে যেতো আমাকে। বলতো—চলো, মাস্টারমশাই এসেছে, পড়বে চলো—

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্ন ভেঙে যেত। আবার পড়া শুরু হতো, লেখাপড়ার ভিটামিন। তদ্ধিত প্রত্যয়, কমোন্-এররস্, আকবর ওয়াজ এ নোবল্ এমপারার। সম্রাট আকবর আমার মাথার ওপর জিজিয়া-কর বসিয়ে আমাকে একেবারে গোলাম বানিয়ে ফেলতো।

সেদিন কিন্তু মাস্টারমশাই এসে আর আমাকে পেলেন না।

—কোথায় গেল খোকা? বাড়িতে নেই?

রঘুর মুখ শুকিয়ে গেছে, বৈজুর মুখও শুকিয়ে গেছে। সাহেবের কাছে কী জবাবদিহি করবে তারা? ভয় আমার জন্যে নয়, ভয় বাবার জন্যে। বাবা তাদের মাইনে দিতেন। বাবা তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। বলতে গেলে সমস্ত সংসারটার মালিকই ছিল চাকররা। আমরা, আমি আর বাবা দু'জনই যেন ছিলাম তাদের পোষ্য।

হরিসাধনবাবু মহা মুশকিলে পড়লেন—কোথায় গেল তাহলে খোকা?

ভয়ে তখন রঘুর বুক থর-থর করে কাঁপছে। আমি যে-দুধটা খেতুম না, যে-ডিমটা ফেলে দিতুম সেটা রঘুরা বেশ আরাম করে খেত। খেয়ে খেয়ে বেশ চেহারাগুলো মজবুত করে ফেলেছিল ওরা। কিন্তু তবু সেই মজবুত চেহারাগুলোই ভয়ে শুকিয়ে গেল।

—শুকদেবের সঙ্গে গাড়িতে করে বেরিয়েছিল, আর ফেরেনি—

—কোথায় শুকদেব?

শুকদেবও এল। শুকদেব ছিল বাবার ড্রাইভার। সেও এসে দাঁড়াল। সে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল গাড়ি নিয়ে। আমি তার গাড়িতেই উঠে পড়েছিলাম। বিরাট গাড়ি বাবার। বাবা বাড়িতে নেই। তাই গাড়িখানা নিয়ে কারখানায় যাচ্ছিল। আমি গিয়ে বললাম—শুকদেব, আমাকে নিয়ে যাবে?

শুকদেবের দায়িত্ব কিছু কম নয়।

বললাম—আমি গাড়িতে চুপ করে বসে থাকবো শুকদেব। কোথাও বেরোব না—

গাড়িখানা শুধু আধ ঘণ্টার জন্যে বাইরে যাবে, তারপর আবার ফিরে আসবে। এর মধ্যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটবার কথা নয়। তাই অনেক বলার পর শুকদেব রাজি হয়েছিল।

—তারপর?

শুকদেব বললে—তারপর হুজুর কারখানায় গিয়ে আমি মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছি, ফিরে এসে দেখি খোকাবাবু নেই—

—তারপর?

মাস্টারমশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মাস্টারমশাইয়ের মাথায় যেন আকাশ থেকে বাজ ভেঙে পড়লো। সেদিনের আমিকে আজকের আমি

দিয়ে বিচার করা হয়ত অন্যায় হবে না। তবু বলব আমার সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়াকে আজকের আমি কী করে সমর্থন করবো বুঝতে পারছি না। তার কুড়ি বছর পরে যখন আবার একদিন আমাকে সত্যিকারের জেলখানায় যেতে হয়েছিল তখন কিন্তু সেখান থেকে পালাতে ইচ্ছে করেনি। সেদিন জেলখানার মধ্যে মোটা চালের ভাত আর ক্যান-মেশানো ডাল খেতে বাধ্য হয়েও পালাতে ইচ্ছে করেনি আমার। আজও ভাবি, কেন ইচ্ছে করেনি? হয়ত ইচ্ছে করেনি তখন বড় হয়েছি বলে, বড় হয়ে সব বুঝতে শিখেছি বলে। তবে কি বাড়িটাকেই আমি জেলখানা মনে করতাম, আর জেলখানাকেই বাড়ি? এ-সম্বন্ধে দশ বছর আগেও একদিন ভেবেছিলেন জ্যোতির্ময় সেন। হঠাৎ একটা বই পড়তে পড়তে মাথায় এসেছিল প্রশ্নটা। আসলে তো তখন সমস্ত ইণ্ডিয়াটাই ছিল জেলখানা। মহাত্মা গান্ধী ওই একটি কাজ করেছিলেন তখন। সকলের মাথায় কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—যতদিন আমরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন ততদিন আমাদের বাড়ি বাড়ি নয়, জেলখানাও আমাদের জেলখানা নয়। বইটার সেই লাইনগুলো তিনি লিখে রেখেছিলেন তাঁর নোটবুকে। তখন যা কিছু পড়তেন, ভালো কথা কিছু পেলেই নোটখাতায় লিখে রাখতেন। While there is a lower class I am in it; while there is a criminal element I am of it; while there is a soul in prison I am not tree. সত্যিই তো, যতক্ষণ পৃথিবীতে জেলখানা আছে, ততক্ষণ মানুষ পরাধীন। আমরা কেন জেলখানায় আছি সেটা বড় কথা নয়, জেলখানা কেন এখনও পৃথিবীতে আছে সেইটেই প্রশ্ন। জেলখানা থাকবে না এমন স্বাধীনতা কখনও আসবে নাকি পৃথিবীতে? কোথাও এসেছে? ওয়েলফেয়ার স্টেট তো অনেক কিছু উন্নতি করেছে মানুষের, কিন্তু জেলখানা বন্ধ করতে পেরেছে? আশ্চর্য, এসব কথাই বা ভাবছি কেন? লোকদের খেতে পরতে দিতেই পারিনি এখনও, আর জেলখানা তুলে দেবার কথা ভাবছি!

আচ্ছা ধরা যাক, পৃথিবীর সব লোক সৎ হয়ে গেল, সব রাজা সব প্রেসিডেণ্ট সৎ হয়ে গেল, কারো খাবার পরবার কষ্ট রইল না, যুদ্ধ, লড়াই সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেল, কোথাও চুরি-ডাকাতি খুনোখুনি নেই। কিন্তু তাহলে তো রাজারও প্রয়োজন হবে না, মন্ত্রীরও প্রয়োজন হবে না, প্রেসিডেণ্টেরও প্রয়োজন হবে না—

হঠাৎ শংকর বললে—তাহলে জ্যোতিদা, ওই কথাই রইল ?

বললাম—হ্যাঁ—

ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার নিত্যানন্দ হাজরা বললে—আমি তাহলে স্যার, এই ফাইলটা নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো, আচ্ছা আসি স্যার—

চলেই যাচ্ছিল ওরা। শংকরকে ডাকলাম। বললাম—শংকর শোন—

শংকর ফিরে এল। এসে আমার প্রশ্নের আশায় চুপ করে সামনে দাঁড়াল।

বললাম—আচ্ছা, এ-বাড়িটা এই ময়নাডাঙার বাবুদের তো ?

—হ্যাঁ, বাড়িটা তো পড়েই থাকে, বাবুরা কেউ আসেন না। জমিদারী চলে যাবার পর এঁরা কলকাতায় কব্‌জার ফ্যাক্টরি করেছেন সেই টাকা দিয়ে। তাতে প্রচুর প্রফিট হচ্ছে—

—কব্‌জা ?

—হ্যাঁ, কব্‌জা, লোহার কব্‌জা। গভর্ণমেণ্ট বিলিতি কব্‌জা তো ইমপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে, তাই তা এখন ইণ্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার করছে এই বাবুদের কোম্পানী। এখন খুব লাভ হচ্ছে। আপনাদের দয়াতেই তো হলো।

—আমাদের দয়াতে মানে ?

—আপনি মানে গভর্ণমেণ্ট! গভর্ণমেণ্ট জমিদারী না নিলে তো আর ওদিকে মাথা ঘামাতো না বাবুরা। জমিদারী বেচা টাকা দিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষকালে সুইজারল্যাণ্ড থেকে একজন এক্সপার্টকে ডেকে আনলেন মোটা মাইনে দিয়ে। এক্সপার্ট এসে অনেক রকম অ্যাড-ভাইস দিলে। বাবুরা চেয়েছিলেন ফ্ল্যাট-বাড়ি করে দেবেন কলকাতায়, তার ভাড়া থেকেই আয় হবে। কিন্তু এক্সপার্ট সাহেব এই কব্‌জার ব্যবসা করতে বললে। সমস্ত স্কীমটা দিয়ে যখন লস-প্রফিট-গেন দেখিয়ে দিলে, তখন সেই ব্যবসাতেই এখন হিউজ প্রফিট করছে। লাস্ট ইয়ারে শুনেছি ইনকাম ট্যাক্সই দিয়েছে বাবুরা দু'লাখ তেত্রিশ হাজার টাকা—

—সে কি!

জ্যোতির্ময় সেন নিজের অজ্ঞাতেই চমকে উঠেছেন। অথচ কত জমিদার তাঁর কাছে এসে কতদিন হা-হুতাশ করেছে, কত হাজার হাজার দরখাস্ত করেছে।

—তাছাড়া দিল্লীতেও বাবুদের ইনফ্লুয়েন্স ছিল।

—কী রকম ?

শংকর বললে—আমি পুরোপুরি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি মেশিনারির ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স পাবার জন্যে অনেকদিন ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে ওঁদের, শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে কার্যসিদ্ধি হয়েছিল—

যখন জমিদারী আইন পাশ হয়েছিল তখন উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের বাড়তি টাকা, যেটা তার অন্যায্য পাওনা, সেইটে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। তাতে জমিদারের না হোক প্রজাদের অন্ততঃ দুঃখ ঘুচবে। তিনি নিজে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট একদিন নিজের চোখে দেখে গিয়েছেন। এই ময়নাডাঙাতেই এসে দেখে গিয়েছেন নুটুদের ঘরের চালে খড় ছিল না। নুটুর বাবা একখানা কাপড় পরে দিন চালিয়েছে। নুটুর মা অনেক দিন কিছুই খায়নি। খাবার কিছু ছিলই না ঘরে। আর বৈকুণ্ঠ ?

বৈকুণ্ঠকেও দেখে খুব দুঃখ হতো আমার।

সত্যি, এখন তারা কেমন আছে কে জানে। এখন তো বাবুরা চলে গিয়েছে। এখন তো আর নুটুর বাবাকে বাবুদের বাড়ি বেগার দিতে হয় না।

মহাভারতে শান্তিপর্বে যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর চারদিকে আত্মীয়-স্বজন সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে তখন ভীষ্ম পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন। গোটা শান্তিপর্বটাই সেই ভীষ্মের কথায় ভরা। ভীষ্মদেব বলেছিলেন—মানুষ বনে গিয়ে কিংবা ব্রহ্মচর্যাশ্রম অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে থেকে যে ধর্ম সঞ্চয় করে, রাজা কেবল প্রজাপালন করেই তার শতগুণ ধর্ম লাভ করে। আজ জ্যোতির্ময় সেন রাজাই হয়েছেন বলতে গেলে। অন্ততঃ নুটুদের চোখে তো তিনি রাজাই বটে। আজ দেখা হবার পর নুটু তাঁকে কী বলবে ? নুটু কি সুখে আছে ? নুটুর দুঃখ কি ঘুচেছে ? যে নুটুদের বাড়িতে হাঁসে ডিম পাড়লে বাবুদের বাড়িতে গিয়ে বেচে দিয়ে আসতে হতো পয়সার অভাবে, যে জমিদার খাজনা আদায় করতো ষোল আনা, কিন্তু প্রজাপালন করতো না, তারা তো আজ আর নেই। তারা চলে যাবার পর নুটুদের অবস্থা তো ফেরবারই কথা।

—মন্মথবাবুকে আপনি চিনতেন ?

—মন্মথবাবু কে ?

—আপনি ময়নাডাঙায় একবার এসেছিলেন বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। এ বাড়িটা তাঁর ভাগেই পড়েছে। আপনি আসবেন বলে বাড়িটা

আমরা চেয়ে নিয়েছি, বাড়িটা তো এমনি পড়েই থাকতো, আপনি এসে থাকবেন শুনে তিনি তিন হাজার টাকা খরচ করে চুনকাম-মেরামত করিয়ে দিলেন। বিরাট বাড়ি তো, বহু বছর পড়ে ছিল। অথচ ভোগ করবার কেউ নেই—

তারপর একটু থেমে বললে—সেই মন্মথবাবুও আজ মীটিংয়ে আসছেন—

—কেন ?

—বাঃ, আপনি এসেছেন, আপনি তাঁর বাড়িতে রয়েছেন শুনে দেখা করতে আসবেন না ? আপনি এখানে এসে এই বাড়িতে একদিন থাকবেন, এতেই তো তাঁর কৃতার্থ হয়ে যাবার কথা।

—কিছু উদ্দেশ্য আছে নাকি ?

শংকর বললে—উদ্দেশ্য আর কি ? আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাঁর বাড়িতে তাইতেই তো যে কেউ ধন্য হয়ে যেতো! তিনিই বলেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—

—এখনই আসবেন নাকি ?

—না না, সে আমি বারণ করে দিয়েছি। তিনি বলছিলেন সে-কথা। কিন্তু আমি বলেছি, না, জ্যোতিদার শরীর খারাপ, তিনি একটু নিরিবিলিতে থাকতে চান, কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না, যা কিছু দেখা-শোনা আলাপ করা সব মীটিংয়ের মধ্যে হবে, তার আগে নয়—

জ্যোতির্ময় সেন একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শংকরের মুখের দিকে। আসলে শংকর আর মন্মথবাবু সবাই এক। দু'জনেই যেন একাকার হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে। এই ছেলেটাও একদিন সুযোগ পেলে মন্মথবাবু হয়ে উঠবে। কিংবা হয়ত একদিন তাঁরই চেয়ারে এসে বসতে চাইবে। আজ ঠিক যেমন করে তাঁকে খোশামোদ করছে, তাঁর জায়গায় আর কেউ বসলে তাঁকেও ঠিক এমনি করে খোশামোদ করবে। কিম্বা হয়ত এর চেয়েও বেশি।

—আমি আসি তাহলে জ্যোতিদা, আপনার খাওয়ার ব্যবস্থার দিকটাও দেখতে হচ্ছে কিনা—

অথচ সেদিন, সেই হুটুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বাড়ির দিকে চেয়েই কত ভয় পেয়েছিল। ভয় তাঁর ঠিক নয়, ভয়টা ছিল হুটুর।

হুটু বলেছিল—এই, ওদিকে যাসনি, মেজবাবুর বন্দুক আছে—গুলি করে দেবে—

—কেন, গুলি করবে কেন? আমরা কী করেছি?

নুটু বলেছিল—না, বাবুরা আমাদের ময়লা জামা-কাপড় দেখতে পারে না—

নুটু তো ছেলেমানুষ। তিনিও তখন ছেলেমানুষ ছিলেন। কেন যে ময়লা জামা-কাপড় দেখলে বড়লোকেরা বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারবে তার কোনও কারণ খুঁজে বার করতে পারেননি তিনি। তবু নুটুর কথায় চলে এসেছিলেন। বৈকুণ্ঠ সঙ্গে ছিল, সেও তাদের সঙ্গে চলে এসেছিল। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস আজ তিনি সেই বাড়ির ভেতরেই বাস করছেন, বাস করে বাড়ির কর্তাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছেন, আর সেই বাড়ির মালিক মন্মথবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শংকরের কাছে দরবার করছে। এ ঘটনা নুটু কি জানে? নুটুর কানে কি এ ঘটনা গেছে?

সেই নুটুর কথাটা মনে পড়তেই আবার তাঁর সেদিনকার ঘটনাগুলো মনে আসতে লাগলো।

সেদিনও বোধ হয় এমনি খাঁ খাঁ করা আকাশ রোদে পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। শুকদেব গাড়ি নিয়ে কারখানায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে গেছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন হল্লা উঠলো। হৈ হৈ চিৎকার। রাস্তাঘাট ট্রাম ঘোঁড়ার গাড়ি সব কিছু যেন থমথম করতে লাগলো। প্রথম কেউ বুঝতে পারেনি এমন ঘটনা কলকাতায় তার আগে কখনও ঘটেনি। জ্যোতির্ময় সেনও তার আগে কখনও তেমন করে একলা একলা রাস্তায় বেরোননি। কিছু ভেবে ওঠবার আগেই একদল লোক লাঠি-সোটা নিয়ে কোথা থেকে ছুটে এল। আর দেখতে দেখতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল সেই দুপুরবেলার কলকাতায়। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস বোধ হয় সেটা। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হলো কলকাতায় সেই প্রথম। পুলিসের গুলি চলেছিল বিকেলবেলা। তারপর তার কিছুদিন পরেই আবার জুলাই মাসেও দাঙ্গা হলো। পাইকপাড়ায় রথযাত্রা উৎসবের মিছিল চলছিল সেদিন। আর বড়বাজারে চলছিল রাজ-রাজেশ্বরীর মিছিল। আর চলেছিল মহরমের মিছিল। সেই দাঙ্গাতেই সে-

আমরা চেয়ে নিয়েছি, বাড়িটা তো এমনি পড়েই থাকতো, আপনি এসে থাকবেন শুনে তিনি তিন হাজার টাকা খরচ করে চুনকাম-মেরামত করিয়ে দিলেন। বিরাট বাড়ি তো, বহু বছর পড়ে ছিল। অথচ ভোগ করবার কেউ নেই—

তারপর একটু থেমে বললে—সেই মন্মথবাবুও আজ মীটিংয়ে আসছেন—

—কেন ?

—বাঃ, আপনি এসেছেন, আপনি তাঁর বাড়িতে রয়েছেন শুনে দেখা করতে আসবেন না ? আপনি এখানে এসে এই বাড়িতে একদিন থাকবেন, এতেই তো তাঁর কৃতার্থ হয়ে যাবার কথা।

—কিছু উদ্দেশ্য আছে নাকি ?

শংকর বললে—উদ্দেশ্য আর কি ? আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাঁর বাড়িতে তাইতেই তো যে কেউ ধন্য হয়ে যেতো! তিনিই বলেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—

—এখনই আসবেন নাকি ?

—না না, সে আমি বারণ করে দিয়েছি। তিনি বলছিলেন সে-কথা। কিন্তু আমি বলেছি, না, জ্যোতিদার শরীর খারাপ, তিনি একটু নিরিবিলিতে থাকতে চান, কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না, যা কিছু দেখা-শোনা আলাপ করা সব মীটিংয়ের মধ্যে হবে, তার আগে নয়—

জ্যোতির্ময় সেন একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শংকরের মুখের দিকে। আসলে শংকর আর মন্মথবাবু সবাই এক। দু'জনেই যেন একাকার হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে। এই ছেলেটাও একদিন সুযোগ পেলে মন্মথবাবু হয়ে উঠবে। কিংবা হয়ত একদিন তাঁরই চেয়ারে এসে বসতে চাইবে। আজ ঠিক যেমন করে তাঁকে খোশামোদ করছে, তাঁর জায়গায় আর কেউ বসলে তাঁকেও ঠিক এমনি করে খোশামোদ করবে। কিম্বা হয়ত এর চেয়েও বেশি।

—আমি আসি তাহলে জ্যোতিদা, আপনার খাওয়ার ব্যবস্থার দিকটাও দেখতে হচ্ছে কিনা—

অথচ সেদিন, সেই হুটুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বাড়ির দিকে চেয়েই কত ভয় পেয়েছিল। ভয় তাঁর ঠিক নয়, ভয়টা ছিল হুটুর।

হুটু বলেছিল—এই, ওদিকে যাসনি, মেজবাবুর বন্দুক আছে—গুলি করে দেবে—

—কেন, গুলি করবে কেন ? আমরা কী করেছি ?

হুটু বলেছিল—না, বাবুরা আমাদের ময়লা জামা-কাপড় দেখতে পারে না—

হুটু তো ছেলেমানুষ। তিনিও তখন ছেলেমানুষ ছিলেন। কেন যে ময়লা জামা-কাপড় দেখলে বড়লোকেরা বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারবে তার কোনও কারণ খুঁজে বার করতে পারেননি তিনি। তবু হুটুর কথায় চলে এসেছিলেন। বৈকুণ্ঠ সঙ্গে ছিল, সেও তাদের সঙ্গে চলে এসেছিল। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস আজ তিনি সেই বাড়ির ভেতরেই বাস করছেন, বাস করে বাড়ির কর্তাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছেন, আর সেই বাড়ির মালিক মন্মথবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শংকরের কাছে দরবার করছে। এ ঘটনা হুটু কি জানে ? হুটুর কানে কি এ ঘটনা গেছে ?

সেই হুটুর কথাটা মনে পড়তেই আবার তাঁর সেদিনকার ঘটনাগুলো মনে আসতে লাগলো।

সেদিনও বোধ হয় এমনি খাঁ খাঁ করা আকাশ রোদে পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। শুকদেব গাড়ি নিয়ে কারখানায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে গেছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন হল্লা উঠলো। হৈ হৈ চিৎকার। রাস্তাঘাট ট্রাম ঘোঁড়ার গাড়ি সব কিছু যেন থমথম করতে লাগলো। প্রথম কেউ বুঝতে পারেনি এমন ঘটনা কলকাতায় তার আগে কখনও ঘটেনি। জ্যোতির্ময় সেনও তার আগে কখনও তেমন করে একলা একলা রাস্তায় বেরোননি। কিছু ভেবে ওঠবার আগেই একদল লোক লাঠি-সোটা নিয়ে কোথা থেকে ছুটে এল। আর দেখতে দেখতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল সেই দুপুরবেলার কলকাতায়। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস বোধ হয় সেটা। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হলো কলকাতায় সেই প্রথম। পুলিসের গুলি চলেছিল বিকেলবেলা। তারপর তার কিছুদিন পরেই আবার জুলাই মাসেও দাঙ্গা হলো। পাইকপাড়ায় রথযাত্রা উৎসবের মিছিল চলছিল সেদিন। আর বড়বাজারে চলছিল রাজরাজেশ্বরীর মিছিল। আর চলেছিল মহরমের মিছিল। সেই দাঙ্গাতেই সে-

দিন মিলিটারী এসে গুলি চালালো। সঙ্গে সঙ্গে আটাশ জন মারা গেল সেখানেই। কুড়িজন হিন্দু, আটজন মুসলমান। তখন তিনি ছেলেমানুষ। কিন্তু পরে জেনেছেন সেদিন কলকাতার বুকে যে তাণ্ডব শুরু হলো তারই পরিণতি হলো দেশ দু'ভাগ করে।' সেদিন আর কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি তাঁর। কোথায় রইল শুকদেব আর কোথায় রইল তাঁদের গাড়িখানা। আরও অনেক লোকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে কোথায় যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তাও বুঝতে পারলেন না। এখন যেখানে বরানগর, হয়তো ওই রকমই কোন জায়গায়, ঠিক মনে নেই। একটা ছোট একতলা বাড়ির ভেতরে গিয়ে এক রাত্রের মধ্যে তাদের লোক হয়ে গিয়েছিলেন। সে-বাড়িতে অনেকগুলো ছোট ছোট ভাই-বোন। আর তাদের মা।

ছেলেগুলোর মা জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কাদের বাড়ির ছেলে গো ?

আশ্চর্য, সেদিন অজানা অচেনা বাড়িতে গিয়েও তাঁর কিন্তু ভয় হয়নি। একটা নতুন অভিজ্ঞতায় কেমন যেন রোমাঞ্চই হয়েছিল, সেই ভাইবোন-গুলোদের সঙ্গে মিশে বাড়ির কথাও মনে পড়েনি, মাস্টারমশাইয়ের কথাও মনে পড়েনি, শুকদেব, রঘু, বৈজু দারোয়ান, কাবোর কথাই মনে পড়েনি তাঁর। বিকেল চারটের সময় দুটো রসগোল্লা আর এক গ্লাস দুধ খাবার কথাও মনে পড়েনি। মনে পড়েনি মাস্টারমশাই যখন এসে জিজ্ঞেস করবে খোকা কোথায় গেল, তখন কী উত্তর দেবে, সে-কথাও মনে আসেনি। মনে হয়েছিল বেশ ভালোই হয়েছে, আরো যদি কিছুদিন দাঙ্গা চলে তাহলে বোধ হয় আরো ভালো হয়।

মনে আছে বড় ছেলেটার নাম সুশীল। সুশীল ঘোষ না সুশীল চ্যাটার্জি, আজ তাও মনে নেই। সেই ছেলেটাই বেশি আদর করেছিল তাঁকে। সেই সুশীলই বলেছিল—তুই এখানে আমাদের বাড়িতে থেকে যা ভাই—

তাদের সে-পাড়ায় দাঙ্গা হয়নি, কিন্তু দাঙ্গার খবর এসেছিল মানুষের কানে কানে। তারাই বলেছিল সমস্ত কলকাতার হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া লেগে গেছে। কলকাতায় যত দোকান বাড়ি ঘর-দোর সব তারা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সুশীল আর তার ভাই-বোনেরা সবাই একটা থালায় ভাত খেতে বসেছিল মনে আছে। সকলের ভাত একটা থালায় নিয়ে তার মা সকলের মুখে তুলে তুলে দিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। টিনের চালের রান্নাঘরের দাওয়ায়

বসে সেই সুশীলের মার হাতে ভাত খাওয়ার কথাটা আজও মনে আছে তাঁর। আজ সে কলকাতাও নেই, সে বরানগরও বোধ হয় আর তেমন নেই। সেই বিপিন পাল, তুলসী গোস্বামী, জে. এন. বসু, পদ্মরাজ জৈন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্দার হরি সিং, সেই পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ কেউই আজ নেই। শুধু কলকাতার কেন, সারা ইণ্ডিয়ার তখন তাঁরাই লীডার। সেই লর্ড লীটনও এখন আর নেই। অথচ সেই তুলসী গোস্বামী তখন কত গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন। আজকের ইণ্ডিয়ার মানুষ তাঁদের নামও আর মুখে আনে না। একদিন তাঁকেও যেতে হবে। এখন জ্যোতির্ময় সেনের বয়েস হয়েছে। একদিন আরো বয়েস হবে। এখন যারা ছোট, শংকরের মত কম বয়েস, এখন এরাই মণ্ডল কংগ্রেস চালাচ্ছে, একদিন হয়ত এই ডিস্ট্রিক্ট-কংগ্রেসও চালাবে, তারপর ওয়েস্ট-বেঙ্গল কংগ্রেসও হয়ত চালাবে। যে রকম করিৎকর্মা ছেলে, এখন থেকেই যে-রকম তাঁকে তদ্বির-তদারক করছে তাতে শেষ পর্যন্ত এরাই একদিন হয়ত আবার সব কিছুর কর্তা হয়ে বসবে। এমনি করেই পৃথিবী এগিয়ে চলে, আর মানুষ পিছিয়ে পড়ে।

সেই দিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো।

সুশীলের সঙ্গে খাওয়ার পর গল্প হচ্ছিল। বরানগরের এ-বাড়িটা নাকি তাদের ছোট। শিল্প ময়নাডাঙায় তাদের মামার বাড়িটা অনেক বড়। মস্ত বড় বাগান আছে সেখানে। ময়নাডাঙার পুকুরে কত বড় বড় মাছ। সেই মাছ ধরে ধরে খায় সুশীলরা।

—তুই নিজে মাছ ধরতে পারিস ?

সুশীল বললে—হ্যাঁ—

—কী করে ধরিস ?

—ছিপ দিয়ে।

ছেলেমানুষ জ্যোতির্ময় সেন গল্প শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই মতো বয়েস, অথচ তিনি কিছুই জানেন না কেমন করে মাছ ধরতে হয়, কেমন করে পুকুরের জলে সাঁতার কাটতে হয়। কেমন করে ঘুঁড়ি ওড়াতে হয়, কেমন করে সাইকেল চালাতে হয়। অথচ শুকদেব তাকে মটরের ষ্টিয়ারিং হুইলটা পর্যন্ত ছুঁতে দিত না।

—তুই ময়নাডাঙায় যাবি ? আমার মামার বাড়িতে ?

—হ্যাঁ যাবো, আমাকে নিয়ে যাবি তুই ?

সুশীল বলেছিল - হ্যাঁ—

—ময়নাডাঙায় কী করে যেতে হয় ?

—ট্রেন আছে। ট্রেনে চড়ে তোকে নিয়ে যাবো। দেখবি খুব মস্ত বড় ফুটবলের মাঠ আছে একটা, সেইখানে আমরা সবাই ফুটবল খেলি। আমি এমন সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেলবো না, দেখে তোর তাক লেগে যাবে—

শুধু মাছ ধরার গল্পই নয়, শুধু ফুটবল খেলার গল্পই নয়, সুশীল গল্পের জাহাজ যেন। তার মুখে গল্প শুনে শুনে সত্যি-সত্যিই তিনি যেন সেদিন সশরীরেই ময়নাডাঙাতে চলে গিয়েছিলেন। মামাদের একটা ময়ূর আছে। সেই ময়ূরটা আবার নাচে। পেখম তুলে নাচে। আর যখন আকাশে কালো করে মেঘ জমে ওঠে তখন আমরা মাছ ধরতে যেতুম। ঝড় উঠেছে দক্ষিণ পাড়ার দিকে। ওই দিকে মামাদের আমবাগান। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের খেয়াল নেই। আমরা তখন ধামায় করে আম কুড়োচ্ছি। কী মিষ্টি আম তোকে কী বলবো! কিন্তু একটা গাছের আম খুব টক। আমার মামা সে গাছের নাম দিয়েছে—কাক-তাড়ানে। আর কাঁঠাল গাছ ? কাঁঠাল গাছও আছে। এক-একটা কাঁঠাল এই এখান থেকে তোর মাথা পর্যন্ত। গাছের গোড়া খুঁড়ে দিতে হয়। নইলে মাটিতে ঠেকে যায়।

দুঃখের পৃথিবীতে একটু শান্তির একটু সুখের আশা যে দেয়, সেই তো বন্ধু। মানুষকে যে প্রথম বলেছিল -তুমি অমৃতের সন্তান, সেই তো মানুষের বন্ধু হয়ে আজও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই মানুষের বন্ধুরাই যুগে যুগে এসে মানুষকে অভয় দিয়ে গেছে, অমৃতের বাণী শুনিয়ে গেছে। নিউ টেস্টামেণ্টে আছে—In my Fathers house there are many mansions মণ্টোগোমারীর একটি কবিতায় আছে—Beyond this vale of tears there is a life above. হোক সুশীলরা গরীব, হোক তাদের টিনের চালের বাড়ি। এক থালায় তারা সবাই মিলে ভাত খেত। একটা তক্তপোশে সবাই গড়া গড়া শুয়ে থাকতো। কিন্তু সেই সুশীলই তো তাকে ময়নাডাঙার নাম শুনিয়েছিল। এই যে-ময়নাডাঙায় প্রথম বাবুদের বাড়িতে এসে তিনি উঠেছেন।

বিকেলবেলা পর্যন্ত সারাদিন কেবল দাঙ্গার খবর। কোথায় কারা ঠনঠনে কালিবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় কারা মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় পুলিস কত রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে। কিন্তু যখন অনেক

রাত হলো তখন সুশীলের বাবা ফিরে এল অফিস থেকে। বাড়িতে ফিরে এসে নতুন মুখ দেখে অবাক।

—এ কে? কাদের ছেলে?

সুশীলের বাবাকে মোটে ভালো লাগেনি সেদিন। কী রকম মোটা-সোটা চেহারা, যেন ঠিক সুশীলের উল্টো।

—তোমাদের বাড়ি কোথায়? তোমার বাবার নাম কি?

নামটা শুনেই চমকে উঠেছিল সুশীলের বাবা।

—কী সর্বনাশ। এখানে এসে উঠলে কেমন করে? এখন কী হবে? না, দেখছি কালকে সকালেই তোমায় বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কী মুশকিলেই যে পড়া গেল!

সুশীল বললে—না বাবা, ওকে নিয়ে আমি ময়নাডাঙায় যাবো, সেখানে গিয়ে ও মাছ ধরবে—

সুশীলের বাবা রেগে উঠলো—

—ও কার ছেলে জানিস? কত বড়লোকের ছেলে সে খেয়াল আছে?

বাবার পরিচয়ে ছেলের পরিচয় হওয়ার মত দুর্ভাগ্য বোধহয় আর দুটি নেই। বংশ নয়, পোশাক নয়, স্ত্রী নয়, কোনও কিছুরই ছায়া নিয়ে গৌরব করায় বড় অপমান। তাই তো বলেছিলাম, অহংকে ত্যাগ না করলে দেশসেবাও ভণ্ডামি। সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়লো। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে গেছেন পরমহংসদেব। বিজয়কৃষ্ণ বললেন—আপনি কিছু উপদেশ দিন—

—উপদেশ!

বলে চারিদিকে চাইলেন পরমহংসদেব। বললেন—আমি আর কী উপদেশ দেব? আমি যে বেশি কাটিয়ে একেবারে জ্বলে গেছি—

—তার মানে?

—তার মানে, নক্সা খেলা জানো? একরকম তাসের খেলা! সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি—

সেই রাত্রেই কাণ্ডটা ঘটলো। রাত ভাল করে তখনও পোহায়নি। আমি বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়লুম। বাইরে পাতলা জ্যোৎস্না থমথম করছে। সেই ঝাপসা অন্ধকারেই রাস্তায় পা বাড়ালুম। তখন রঘুও নেই,

বৈজুও নেই, শুকদেবও নেই, মাস্টারমশাইও নেই। কেউ আর আমাকে ধরে রাখবার নেই তখন। আমি তখন একেবারে বেশি কাটিয়ে জলে গেছি। একেবারে সতের ফোঁটা কেটে বসে আছি। আমার আর তখন ভয় কীসের ?

দূর থেকে ক্ষীণ আওয়াজ আসছে—আল্লা হো আকবর—

আর আরো দূর থেকে ক্ষীণ আওয়াজ আসছে—বন্দেমাতরম্—

আমার একটা ঝি ছিল ছোটবেলার। মা মারা যাবার পর সেই-ই বলতে গেলে আমাকে মানুষ করেছিল। আমি তাকেই বলতাম—দাই-মা। বুড়ী শেষকালে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর কাজকর্ম করতে পারতো না। শেষ বয়েসে আর আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইলে না। দেশে চলে গিয়েও মাঝে মাঝে এক-একবার আসতো। গঙ্গায় স্নান করতে কিংবা কালীবাড়িতে ঠাকুর দর্শন করতে আসতো। এসে আমাদের বাড়িতেই উঠতো। এসেই আমাকে কোলে তুলে নিতে চাইত। সে মনে করতো আমি বুঝি সেই দু'মাসের ছোট শিশুটিই আছি। আমি যত বোঝাই যে আমি বড় হয়েছি, তোমার কোলে উঠবো না, তবু সে কিছুতেই বুঝতে চাইত না। বলতো—আয় আমার কোলে ওঠ্, সেই আগেকার মত—

আমার যত বয়েস বাড়তে লাগলো ততই বুড়ীকে আমার ঘেন্না করতে লাগলো। কিন্তু আমার মনেও পড়তো না যে যখন আমি আরো ছোট ছিলাম তখন ওই দাই-মাই আমার জন্যে কত নোংরা ঘেঁটেছে। দাই-মা আমার কথা শুনে ভারি কষ্ট পেত বুঝতে পারতাম।

আমি বোধহয় আসলে স্বার্থপর। আমার সঙ্গেই কংগ্রেসের কাজ করতো ভবনাথ। আমার চেয়ে অনেক বেশিবার জেল খেটেছে। অনেক খাঁটি লোক। সে কিছুই হতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। অথচ অত খাঁটি লোক জ্যোতির্ময় সেন জীবনে কম দেখেছেন। কাউকে উপোস করতে দেখলে পকেটে যা থাকতো দিয়ে দিত। সেই ভবনাথ একদিন একটা লোককে চাকরির জন্যে আমার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম—ভবনাথ কেমন আছে ? তার কী খবর ?

লোকটার কাছে যা শুনলাম তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম। তার স্ত্রী পাগল, একটা ছেলে হয়েছিল, তার পা দুটো পঙ্গু। খোঁড়া। অথচ চিঠিতে সে-সব কথা কিছুই লেখেনি। নিজের সাহায্যের জন্যেও কোনও দিন দেখা করেনি। আমিই নিজে চেষ্টা করে গভর্ণমেণ্ট থেকে মাসে আশি টাকার মত একটা পেনশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। সে টাকাও সে নেয়নি। টাকা ফিরে এসেছিল।

আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। দুঃখ হয় ভবনাথের কথা ভেবে। আমি মিনিস্টার থাকা পর্যন্ত ভবনাথ টাকা নিতে পারবে না। টাকা নিতে ভবনাথের কষ্ট হবে।

দাই-মা আমার ব্যবহার দেখে বলতো—হ্যাঁরে খোকা, তুই আমাকে একেবারে ভুলে গেলি ?

ভবনাথও যদি আমাকে ভুলতে পারতো ভালো হতো। অন্ততঃ ওর স্ত্রী ওর ছেলে সবাই দু'টো খেতে পেত। কিন্তু ভাগ্যের ওপর রাগ করে ভবনাথ তো নিজেকেই খুন করেছে।

১৯৪৭ সালের কথা। মহাত্মা গান্ধী তখন পার্কসার্কাসে সুরাবর্দির বাড়িতে উঠেছেন। চারিদিকে তখন রায়ট চলছে। হিন্দু দেখলেই মুসলমানরা কেটে ফেলছে, আবার মুসলমান দেখলেই হিন্দুরা কেটে ফেলছে। এই অবস্থা। সবাই আসছে দেখা করতে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, রাজাগোপালাচারীজী, দিনেশ মেটা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কিন্তু একলা শরৎ বোসই শুধু আসেননি। গান্ধীজী তাঁকে ডেকে পাঠাননি। কিন্তু মহাত্মাজীর আমরণ উপোস করার খবর পেয়েই তিনি নিজে ছুটে এসেছেন।

শরৎ বোসকে দেখেই মহাত্মাজী হাসলেন। বললেন—শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পাওয়ার জন্যে আমাকে উপোস করতে হলো ? So, it needed a fast on my part to bring you to me ?

এরও বোধহয় কোনও প্রতিকার নেই। আমার দাই-মা আর ভবনাথ, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বোধহয় তারাও ভুল বুঝবে। ডাব কত উঁচুতে গাছের ডগায় থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা। ডাবের জলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। আর পানিফল ? পানিফল জলের ভেতরে থাকে—তবু 'পানিফল গরম।

মুটুরা পান্তাভাত খেত শরীর ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে। সেই পান্তাভাত,

তাতে নুনও অনেকদিন জুটতো না তাদের। ভোরবেলাই গরুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তো খড় আনবার জন্যে। দশ মাইল খড় বইলে মজুরি পেত চার আনা। চার আনাই বা কম কী? চার আনাই বা কে দেয় হাত বাড়িয়ে!

সেদিন রেল-বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গাড়ির ওপর থেকেই থমকে দাঁড়াল নুটু। খালি গাড়ি। পেছনে বৈকুণ্ঠ চলেছে। বৈকুণ্ঠের গলায় ঘুঙুর বাঁধা। হঠাৎ বুড়ো শিবতলায় বটগাছের তলায় নজর পড়তেই বললে—কে? কে রে ওখানে শুয়ে?

ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ। ক'দিন থেকেই ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ উঠছে। বৃষ্টি হবার নাম নেই ময়নাডাঙায়, সেই ভোরবেলাতেই যেন ঘেমে নেয়ে উঠেছে নটবর। নটবরও ঘেমেছে, বৈকুণ্ঠও ঘেমেছে।

আবার চেঁচালে নুটু—কে রে ওখানে? কে তুই?

আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলা কখন ট্রেনে উঠেছিলাম। ভোর মানে তো শেষ রাত। ট্রেনে উঠেই ময়নাডাঙায় যাওয়া যায় বলেছিল সুশীল। অন্ধকার তখন চারিদিকে। স্টেশনে প্লাটফরমের ওপর কুলি, মজুর, প্যাসেঞ্জাররাও গড়া গড়া ঘুমোচ্ছিল। টিকেট-কালেক্টররাও কেউ কোথাও নেই। ট্রেনও নেই। তাই রেলের বাবুরাও কেউ নেই। এর আগে কখনও ট্রেনে চড়িওনি আমি। টিকিট কাটবার পয়সাও নেই কাছে। টিকিটের কত দাম তাও জানি না। ট্রেনও ফাঁকা ছিল, প্লাটফরমও ফাঁকা। কলকাতায় দাঙ্গা বেধেছে, প্যাসেঞ্জার থাকবে কোত্থেকে। হুস্‌হুস্ করে ট্রেনটা আসতেই আমি উঠে বসেছি। ভয়-ভয় করছিল। ফাঁকা গাড়ির ভেতর থেকে বাইরে চেয়ে দেখছি শুধু ঝাপসা-ঝাপসা সকাল আর মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া।

—কে রে তুই? কে?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চোখ রগড়ে নিয়ে দেখলাম ভাল করে। একটা বিরাট ঝাঁকড়া ডাল-ওয়ালা বটগাছ। ফাটা-সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল। আর একটা গোল পাথরের নুড়ি। ওরই নাম বুড়ো শিব। আসলে ওই বুড়ো শিবই ছিল নুটুদের ভগবান। ভগবান বা ডাক্তার ওষুধ সব। নুটুর অসুখ করলে নুটুর মা ওই বুড়ো শিবের শানবাঁধানো চাতালে এসেই মানত করতো। বেলপাতা ফুল কি দু'পয়সার গুড়ের বাতাসা

দিলেই সব অসুখ সেরে যেত। তা সে কলেরাই হোক আর ম্যালেরিয়াই হোক।

—এখানে শুয়ে আছিস কেন? কাদের ছেলে তুই?

বৈকুণ্ঠও একেবারে গায়ের কাছে ঝুঁকে এসে আমার মুখটা ভাল করে দেখছিল। এক গা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল, গোল-গোল লাল চোখ। যদি গুঁতিয়ে দেয়।

—ও কিছু বলবে না, ও তোকে দেখছে।

ট্রেন থেকে নেমে কোথায় যাবো, কী করবো, কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু স্টেশনের প্লাটফরমের পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'ময়নাডাঙা'। ময়নাডাঙা নামটা দেখেই নেমে পড়েছিলাম। তখন বেশ রোদ উঠেছে।

—সুশীলের মামার বাড়ি যাবি?

—কে সুশীল?

প্লাটফরমের টিকিট-কালেক্টরও বোধহয় শুনেছিল কলকাতার রায়টের কথা। যারা দু'একজন ট্রেন থেকে নামলো তাদের টিকিট চাইলে না। সবাই ভোরবেলার খবরের কাগজ পড়তেই ব্যস্ত। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সামনে ফাঁকা ধু-ধু মাঠ। সেই সকালবেলাই ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। যারা ট্রেন থেকে নামলো তারা একে একে হাঁটতে হাঁটতে সোজা যে-যার রাস্তায় পা বাড়ালো। স্টেশনের ভেতরে টরে-টক্কা চালাচ্ছে স্টেশন-মাস্টার।

হুটু বললে—আয়, আমার গাড়িতে উঠে আয়—

আমি বললাম—সুশীলের মামার বাড়িতে আমায় নিয়ে চল—

—সেখানে গিয়ে কী হবে? সে কোন্ পাড়ায়?

তা জানতাম না। শুধু জানতাম সুশীলের মামার বাড়িতে পুকুর আছে, সে পুকুরে মাছ আছে। সে মাছ ছিপ দিয়ে ধরা যায়। আর আছে একটা ময়ুর। আকাশে কালো করে মেঘ উঠলে সে-ময়ুরটা পেখম তুলে নাচে।

হুটু তখন তার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। খালি গরুর গাড়ি। আমরা দু'জন শুধু ওপরে আর পেছন-পেছন আসছে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ বরাবর হেঁটে হেঁটেই আসতো। আমরা যেখানেই যেতুম, আমাদের পেছন-পেছন যেত সে। যখন গাড়িটা খুব জোরে চালাতো হুটু, তখন বৈকুণ্ঠও দৌড়তো আমাদের গাড়ির পেছন-পেছন।

একদিনের মধ্যে, বলতে গেলে একরাত্রের মধ্যেই যেন আমি একেবারে বদলে গেলুম। হুটুর বয়স আমাদেরই মত। কিন্তু আমার চেয়েও মজবুত তার শরীর। খালি গা, শুধু কাপড়টা মালকোঁচা-মারা। আমাদের রঘুর মতই মালকোঁচা-মারা কাপড়। কিন্তু রঘুর সঙ্গে হুটুর আকাশ-পাতাল তফাত ছিল। আমার গায়ের জামা আর প্যাণ্টের দিকে একবার চেয়ে দেখলে হুটু।

বললে—তোরা বড়লোক বুঝি? আমাদের ময়নাডাঙার বাবুদের মতন বড়লোক?

—কেন?

—এত ফরসা জামা পরেছিস যে?

তারপর বললে—ওই দ্যাখ্, বাবুদের বাড়ি দেখ—

এক মুহূর্তের মধ্যে যেন হুটু আমাকে আপন করে নিয়েছিল সেদিন। আপন করে নিতে সবাই জানে না। আপন করে নেওয়ার মধ্যে কোনও অসত্য থাকতে নেই। থাকলে আপন হয় না কেউ। গান্ধীজী দিল্লীতে একবার এই কথা বলেছিলেন। জ্যোতির্ময় সেনও তখন দিল্লীতে। বিড়লা হাউসের মধ্যে থাকতেন গান্ধীজী আর মনে মনে কষ্ট পেতেন। রেফুজীরা বাড়ির একটা আউট-হাউস দখল করে রয়েছে। একদিন পুলিস তাদের তাড়িয়ে দিতে এল। গান্ধীজী খবর পেয়ে গেলেন তাদের কাছে। বললেন—ওদের তাড়াচ্ছ কেন? তার বদলে আমাকে তাড়িয়ে দাও, আমিও তো এখানে এসে উঠেছি—আমিও তো রেফুজী—

তারা বললে—গভর্মেণ্ট স্টাফ্ ওখানে থাকবে, তাদের কোয়ার্টার দরকার।

গান্ধীজী বললেন—Why cannot the Ministers put their spacious bungalows at the disposal of the State, reserving for themselves just enough space for their needs?

আর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ময় সেনের মনে হলো যেন সকলের আপন লোক হয়ে গেলেন গান্ধীজী। তারপর থেকেই শরণার্থীরা বুঝতে পারলে গান্ধীজী তাদেরই একজন। যাদের কেউ নেই তাদের গান্ধীজী আছেন? গান্ধীজীর দেখাদেখি মিনিস্টারদের মেয়ে-বউরাও সোশ্যাল-ওয়ার্ক করতে শুরু করেছিল। তারা ভোরবেলা বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সিল্কের শাড়ি পরে ঠোঁটে লিপষ্টিক আর গালে রুজ মেখে রেফুজী কলোনীতে শরণার্থীদের সেবা করতে

আসতো। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, কব্জিতে রিস্ট্‌ওয়াচ। গান্ধীজী দেখে একদিন একজনকে ডেকে খুব ধমকে দিলেন। বললেন—তোমাদের লজ্জা করে না সিল্কের শাড়ি পরে এখানে আসতে ?

মেয়েটা লজ্জায় পড়ল।

জ্যোতির্ময় সেনের মনে হলো গান্ধীজী মেয়েটিকে বকছেন না, যেন নিজেকেই তিনি তিরস্কার করছেন।

গান্ধীজী বললেন—নিজে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এখানে এসেছ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে ? After doing full justice to your over-loaded breakfast tables in your spacious bungalows you alight from posh cars dangling your stylish vanity bags while those you are supposed to serve cannot even afford the luxury of a bath for lack of a change of clothes. Social service these days has become a means for getting on in this world. Many people have consequently taken to this profitable hobby.

সবাই আজকাল বোধহয় এইজন্যেই সমাজ-সেবক হতে চায়। সবাই-ই এই শংকর। শংকর তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খদ্দর পরেছে, আমাকে কুড়ি টাকা পাউণ্ডের চা খাইয়েছে, আমার তদারকি করছে। কিন্তু একলা শংকরেরই বা দোষ কী ? যে লোকটা একটু আগে রেল বাজার থেকে আমার জন্যে রসগোল্লা নিয়ে এসেছিল তার আসল নাম যাই-ই হোক, আসলে সেও তো এই শংকরই। বহুদিন আগে, বোধ হয় ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মুখ থেকে শোনা কথাগুলো এই বাবুদের বাড়িতে বসে মনে পড়তে লাগলো। সেই সময়ে সেই অন্ধ্র দেশ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন গান্ধীজী। চিঠি লিখেছিলেন অন্ধ্র দেশের একজন লীডার। তিনি লিখে-ছিলেন—Several of the M. L. A.s and M. L. C.s are following the policy 'make hay while the sun shines', making money by the use of influence even to the extent of obstructing the administration of justice in the criminal courts.

চিঠি পেয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন—Our moral standards are going down at such a rate that I can now see why our

Satyagraha fights in the past lacked the real content and were reduced to mere passive resistance of the weak.

—রতন !

রতন বাইরেই ছিল। ভেতরে এল।

—শংকরবাবুকে ডেকে দে তো !

শংকর দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এল।

—আমায় ডেকেছেন জ্যোতিদা ? চা খাবেন ?

—না, চা নয়, এই বাড়ির দরজায় কি এখনও পুলিস পাহারা দিচ্ছে ?

শংকর চোখ পাকিয়ে উঠলো।

—সে কি। পুলিস পাহারা দিচ্ছে না ? আপনি নিজের চোখে দেখেছেন ? অথচ থানাতে স্পেশাল অর্ডার দেওয়া আছে পুলিস-সুপারের। শুধু পুলিস ? পুলিস আছে, স্পাই আছে···কোনও ত্রুটি···

—না, আমি সে-কথা বলছি না। ওদের যেতে বলো, আর পাহারা দিতে হবে না—

—কেন স্যার ?

—না, ওদের আর দরকার নেই। পুলিসের পাহারা দিয়ে আর নিজের জীবন বাঁচাতে চাই না—

—কিন্তু জ্যোতিদা, আপনি জানেন না ময়নাডাঙ্গার লোকরা কত ত্যাঁদড়। সব ছোটলোক, আমি বাঘজোলায় থাকলে কী হবে, এ ডিস্ট্রিক্টের সব তো আমার নখের ডগায়, বড় বদমাইশ লোক এরা সব—

—বদমাইশ লোক, তা আমার কী করবে ? আমি তো কারোর ওপর কিছু অত্যাচার করিনি, আমার কী ক্ষতি করবে ওরা ? নইলে পুলিস থাকলে তো আমারও বদনাম। ওদের যেতে বলো—

শংকর তবু দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম—যাও—

শংকর আর দাঁড়াল না, চলে গেল। শংকর যেন পুলিস দিয়ে আমাকে টিঁকিয়ে রাখতে পারবে। যেদিন সমস্ত মানুষ আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সেদিন কি আমার রাইটার্স-বিল্ডিং, আমার গভর্ণর, আমার লালবাজারের পুলিস ফোর্স আমাকে বাঁচাতে পারবে।

জ্যোতির্ময় সেনের মনে পড়ে গেল। একটা দ্বীপের ভেতরে একটা কবর-

খানা ছিল। শান্ত নিরিবিলি কবরখানা। দেখাশোনা করবার, তদারক করবার একটা লোকও ছিল না সেখানে। সেই কবরখানার গেটের সামনে লেখা ছিল মাত্র একটা ছোট্ট লাইন: "Here is the Cross of Golgotha, the Home of the Homeless. পৃথিবীতে যত জিনিয়াস্ জন্মেছে, আর যত প্রতিভা জন্মাবে, তাদের সকলের সম্বন্ধেই ওই ছোট্ট কথাটা প্রযোজ্য। শ্রেণী-সমাজে যারা নিরাশ্রয়, সেই জিনিয়াস্‌দের কাছে গোলগোথার ক্রস্‌ই একমাত্র আশ্রয়-স্থল। রুশোকে আশ্রয় দেয়নি ফ্রান্স, কার্ল মার্ক্স্‌কে আশ্রয় দেয়নি জার্মানী। ইণ্ডিয়া থেকেও কত জিনিয়াস্‌কে ইণ্ডিয়ার বাইরে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা সবাই আজ গোলগোথার ক্রসের তলায়ই আশ্রয় পেয়েছে।

ছোট গরুর গাড়ি। খুরোতে বোধ হয় তেল দেওয়া হয়নি, তাই ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করতে করতে চলছিল। সামনে বসে হুটু গাড়ি চালাচ্ছে। আর গল্প করছে। তখন আর রোদের তেজ লাগছে না মাথায়, ক্ষিধেও পাচ্ছে না। গায়ে সেই সার্ট আর হাফ-প্যাণ্ট। ঘামতে ঘামতেই চলেছি। বেশ লাগছিল। কোথাকার কোন্ দেশ, সেখানকার একটা অচেনা ছেলে অকারণেই আমার বন্ধু হয়ে গেল। ছোটবেলায় বন্ধু পাওয়া বড় সহজ। কোথায় তোমার বাড়ি, তুমি কী করো, কার ছেলে তুমি, তুমি বড়লোক না গরীব লোক, কত মাইনে পাও সে-সব জানবার দরকার হয় না। দেখা হলেই ভাব, ভাব হলেই বন্ধু।

হুটুরও বোধ হয় বেশ ভাল লাগছিল। বললে—তুই ডাব নিবি না গাড়ি নিবি?

আমি ভাবছি কী নেব। হুটু হঠাৎ বললে—তুই ডাব নে ভাই, তাহলে তোর সঙ্গে আমার ভাব হবে, গাড়ি নিলেই আড়ি হয়ে যাবে—

তারপর একটু থেমে বললে—সুশীলদের মামার বাড়ি গিয়ে কী করবি, তার চেয়ে বরং আমাদের বাড়ি চল—

তোদের বাড়ি? তোদের বাড়ি কোথায়?

—দক্ষিণপাড়ায়।

আমার কাছে উত্তরপাড়াও যা, দক্ষিণপাড়াও তাই। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। হুটু আমার দিকে চেয়ে বললে—আমিও তোকে মাছ ধরা শেখাতে পারি; আমিও তোকে ফুটবল খেলা শেখাতে পারি।

—আর ময়ূর ?

—ময়ূর আছে বাবুদের বাড়ি, যেদিন ময়ূরটা ছাদে ওঠে সেদিন তাকে দেখতে পাই, তোকেও একদিন দেখিয়ে দেব—

এই সেই বাবুদের বাড়ি। এককালে এই বাড়িতেই ময়ূর ছিল, কাকাতুয়া ছিল, কুকুর ছিল। আজ এ বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে এই বাবুরাই বোধ হয় কলকাতায় আবার নতুন বাড়ি করেছে। সে-বাড়িতে বাবুরা হয়তো আজ গাড়ি পুষেছে, রেডিও পুষেছে, রেডিওগ্রাম, রেফ্রিজারেটার পুষেছে। আমেরিকা, জার্মানী, ইংলণ্ডে যা কিছু তৈরি হয় সবই পুষেছে, শুধু ময়ূর পোষেনি, কাকাতুয়া পোষেনি, কুকুর পোষেনি।

তারপর গরুর গাড়িটা গিয়ে থামলো একটা বাজারে। ময়নাডাঙ্গার বাজারে সবই ছিল। হাট বসেছে সেদিন ময়নাডাঙায়। একটা গুদামের সামনে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালো নুটু। তারপর গরু দুটোকে ছেড়ে দিলে। আর তারপর বৈকুণ্ঠর দিকে চেয়ে বললে—কোথাও যাসনি বৈকুণ্ঠ, কাছাকাছি থাকবি, আমি আসছি—

বৈকুণ্ঠ যেন নটবরের কথা বুঝতো। গলার ঘুঙুরটা শব্দ করে উঠলো। তারপর নুটু আমাকে নিয়ে গদির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। সার সার অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গদি-বাড়ির সামনে।

গদির মালিক ছিল সাহাবাবু। তখন তামাক খাচ্ছিল সাহাবাবু, কালো মোটা চেহারা, বিরাট একটা ভুঁড়ি।

সাহাবাবু বললে—কী রে নুটু, আবার এইচিস্ ? তোকে না বলে দিয়েছি আর আসবি নে আমার গদিতে—

—আজ্ঞে, এবার ক্ষেমা-ঘেন্না করে নেন সা'মশাই, আমার মায়ের জ্বর হয়েছিল, তাই আসতে পারিনি !

সাহা মশাই হুঁকোটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে বললে—তোর মায়ের জ্বর হয়েছিল তা আমার কী রে ? আমার কী ? তোর জন্যে আমি লোকসান দেব কারবারে ?

তারপর হুঁকোতে একটা ছোট টান দিয়ে বললে—যা, আজকে বরাত নেই—

নুটু পা জড়িয়ে ধরলো সা'মশাইয়ের।

—আজকে বরাত দিতেই হবে সা'মশাই, বাড়িতে চাল নেই, এই

চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে চাল কিনে নিয়ে গেলে ভাত সেদ্ধ হবে, তবে খাবো।

সা'মশাই আরো রেগে গেল।

—যা, বেরো এখান থেকে, বেরো। পয়সার টান পড়েছে কিনা তাই অমনি আমার কাছে ধন্না দিতে এসেছে। সেদিন তোর জন্যে চারখানা ওয়াগন খালি গেল আমার, তার দাম নেই? রেল-কোম্পানী আমার কান ধরে টাকা আদায় করবে না? যা, বেরো এখান থেকে—

তারপর পাশের সরকারকে ডেকে বললে—ক্যাদার, মুটুকে আজকে মাল দিবি নে, এই বলে রাখলুম—

বলে সাহাবাবু গামছাটা কাঁধে ফেলে কোথায় চলে গেল। মুটু পেছন-পেছন ছুটতে লাগল। এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেলাম মুটু খোঁড়া। খোঁড়া মানে দুটো পায়ের পাতা দোমড়ানো। সেই দোমড়ানো পা নিয়েই মুটু দৌড়লো সাহাবাবুর পেছন-পেছন। বৈকুণ্ঠ ছিল বাইরে। মুটুকে দৌড়তে দেখে সে-ও পেছন পেছন দৌড়তে লাগলো।

আমি খড়ের গুদামের মধ্যে চুপ করে বসে রইলুম। এ এক অদ্ভুত জগৎ আমার কাছে। ভেতরে খড় বোঝাই রয়েছে। একেবারে পাহাড় করা। সামনে খোলার চালের ছোট একটা ঘর। ভেতরে একটা তক্তপোশ। সেইটেই গদিবাড়ি। সেই গদির ওপরেই কেদার বসে ছিল। আমি কাউকেই চিনি না, আমাকেও কেউ চেনে না।

আমি সেইখানে বসে বসেই বাইরে বাজারের চারদিকটা দেখতে লাগলুম। চারদিকে কেবল ধুলো। সেই ধুলোর ওপরেই হাট বসেছে ময়নাডাঙ্গার। সে-হাট এখনও সেই রকম আছে কি না কে জানে। আজ হয়ত আর হাটে যেতে পারবেন না জ্যোতির্ময় সেন। যদি হাটে যাবার ইচ্ছেও হয় তো গিয়ে দেখবেন হয়তো সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মিনিস্টার হাটে যাবে শুনলেই পুলিস-সুপার তাড়াতাড়ি হুকুম দিয়ে সব ময়লা জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলবে। আমি মিনিস্টার, আমাকে ওরা নোংরা হাট দেখাতেই চাইবে না হয়তো।

—তুমি কে? কে তুমি?

ফিরে চেয়ে দেখি সেই কেদার। কেদার সা'মশাইয়ের লোক। আমার দিকে গোঁফ-জোড়া পাকিয়ে চেয়ে রয়েছে।

—কী চাও তুমি?

কিন্তু আমাকে আর উত্তর দিতে হলো না। ততক্ষণ আরো অনেক লোক দাঁড়িয়ে জড়ো হয়েছে। তারা গাড়ি নিয়ে এসেছে। তারাও মাল নিয়ে ময়না-ডাঙা স্টেশনে যাবে। সেই মাল রেলের সাইডিং-এ গিয়ে রেলের ওয়াগনের মধ্যে বোঝাই হবে। তারপর সেই ওয়াগন যাবে কলকাতায়। চার আনা পয়সা খেপ-পিছু ভাড়া। এইটেই মুটুর রোজগার। এই রোজগার নিয়েই সে বাপকে গিয়ে দেবে। কেদারের সঙ্গে ভাব থাকলে কখনও কখনও দু খেপও হয়ে যায়। দু খেপ পেলে আট গণ্ডা পয়সা রোজগার হয়। তিন খেপ পেলে বারো গণ্ডা পয়সা। খড়ের মরসুম সব সময় থাকে না। কার্তিক-অঘ্রাণ থেকে সারা শীতকালটা এই রকম চলে। তারপর গরম পড়লেই ক্ষেতের কাজ।

গদিওয়ালা অন্য গাড়োয়ানদের নিয়ে তখন ব্যস্ত। হঠাৎ মুটু এসে হাজির হলো খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তার শুকনো মুখখানা দেখে বড় মায়া হলো আমার।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রে মুটু, কী বললে সাহাবাবু?

আমার কথায় কান দেবার সময় নেই তখন তার। পেছন-পেছন বৈকুণ্ঠও ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে এসেছে। বৈকুণ্ঠর মুখখানাও যেন দেখলাম কেমন শুকনো শুকনো। বৈকুণ্ঠটা যেন মানুষের মনের কথা বুঝতো। আমি চুপ করে বসে ছিলাম। মুটু চুপি-চুপি-কেদারবাবুর কানে কী যেন বলতে লাগলো। তারপর হঠাৎ আমার কাছে এল।

বললে—চল্—

আমিও তার পেছন-পেছন বাইরে এলাম। বললাম—কী রে মুটু, হলো না?

—হবে না মানে? আলবাৎ হবে—

ততক্ষণে গরু দুটোকে আবার জোয়ালে বেঁধে ফেলেছে সে। আবার খড় বোঝাই হতে লাগলো তার গাড়িতে। বোঝাই হতে বেশি সময় লাগে না। সব গাড়িতেই মাল বোঝাই হচ্ছে। মুটু খুব ব্যস্ত। তার কথা বলার সময়ই নেই। গুনে গুনে খড়ের তরপা তুলতে লাগলো সে। সেগুলোকে দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বাঁধলে। তারপর এক লাফে উঠে বসলো সামনে। আমার দিকে চেয়ে বললে—ওঠ্, উঠে আয়—দেরি হয়ে গেছে—

তারপর বৈকুণ্ঠর দিকে চেয়ে বললে—আয় রে বৈকুণ্ঠ—

গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁরে মুটু,

শেষ পর্যন্ত তাহলে সা'মশাই রাজি হলো ?

—দূর, সা'মশাই তো রাজি হয়নি, ওটা যে হারামজাদা—

—তা হলে ?

—ওই কেদারবাবুর হাতে এক গণ্ডা পয়সা গুঁজে দিলুম, কাজ ফতে হয়ে গেল !

—তাহলে তোকে কত দেবে ?

—তিন গণ্ডা।

বলেই হাসলো নুটু। অনেকক্ষণ পরে আবার নুটুর মুখে হাসি দেখতে পেলুম। নুটু বললে—আমি খেটে মরবো আর ও-বেটা আরাম করে আমার পাওনার ভাগ মারবে—

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

নুটু বললে—আজ আর এক খেপ পেলেই সাত গণ্ডা পয়সা হবে—ফেরবার সময় বাজার থেকে চাল কিনে নিয়ে যাবো—

তারপর গরু দুটোকে তাড়া দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলতে লাগলো। গাড়ি যত ছুটছে বৈকুণ্ঠও তত ছুটছে। আমি পেছন দিকে বার বার চেয়ে দেখছিলাম বৈকুণ্ঠ আসছে কি না।

নুটু বললে—ওর জন্যে ভাবতে হবে না রে, ও ঠিক আসবে—

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলো—আজ বৈকুণ্ঠও কিছু খায়নি আমার মত, জানিস্—কালকেও ও কিছু খেতে পায়নি—

—কেন ?

নুটু বললে—মা'র যে জ্বর হয়েছিল, রাঁধবে কে ? আর সা'মশাইও কদিন থেকে রেগে গিয়ে আমাকে খেপ দিচ্ছিল না—

নুটুর কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছিল। নুটু বললে—তুই আজ কী খেইছিস্ ?

বললাম—কিছু না—

—কিচ্ছু খাস্নি ? তা হলে ঠিক আছে, আজকে পাঁচ সের চাল কিনে নিয়ে যাবো,—ফ্যান দিয়ে ভাত খাবো, দেখবি পেট ভর্তি হয়ে যাবে, সেই রাত্তিরের আগে পর্যন্ত দেখবি আর খিদে পাবে না—

তারপর যেতে যেতে আমার দিকে চেয়ে নুটু আবার বলতে লাগলো—বাবা কী বলে জানিস্ ? বাবা বলে বৈকুণ্ঠকে বেচে দিতে—

—কেন ?

—বলে বৈকুণ্ঠটা শুধু বসে-বসে খাচ্ছে, ওকে যদি কসাইদের কাছে বেচে দেয় তো তারা চল্লিশ টাকা দর দেবে বলেছে—

আমি বললাম—কিন্তু কসাইরা তো ওকে কেটে ফেলবে—

—চুপ।

ঘুটু হঠাৎ একটা হাত দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিলে। বললে—অত জোরে কথা বলিসনি, বৈকুণ্ঠ টের পাবে—

সেই বৈকুণ্ঠ। আজ এতদিন পরে বৈকুণ্ঠকে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন জ্যোতির্ময় সেন। সেই সারা গায়ে পশমের মত কোঁকড়া-কোঁকড়া লোম। কান দুটো ঝোলা। বড় নিঃসহায়ের মত চেয়ে থাকতো। অথচ সামান্য একটা ভেড়া। যেন ঈশ্বর তাকে মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে ভুল করে ভেড়া করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অথচ ওই বৈকুণ্ঠই জ্যোতির্ময় সেনকে একদিন মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, সে-কথাও কি জীবনে কোনও দিন ভুলতে পারবেন জ্যোতির্ময় সেন! মনে আছে বহুদিন আগে হিষ্ট্রির বইতে তিনি পড়েছিলেন একটা ঘটনার কথা। নেপোলিয়ান বেসানোর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফিরছিলেন। নিজের আর্মির অনেক লোক মরে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ দেখলেন একটা কুকুর একজন সৈন্যের মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছে। সেই সৈন্যটারই পোষা কুকুর সেটা। প্রভু মারা গেছে, তবু কুকুরটা সেখানে দাঁড়িয়ে তার প্রভুকে পাহারা দিচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে নেপোলিয়ন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর দলের লোকদের ডেকে বললেন—There, gentlemen—that dog teaches us a lesson on humanity.

আজ এতদিন পরে বৈকুণ্ঠর কথা মনে আসতেই নেপোলিয়ানের সেই কথাটা আমার মনে পড়লো—That Baikuntha teaches us a lesson on humanity.

রেল স্টেশনে মালগাড়ির মধ্যে খড় তুলে দিয়ে বাজার থেকে চাল কিনে যখন বাড়ি ফিরলো ঘুটু তখন সূর্যটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। তখন স্নান করবে, তখন মা ভাত রান্না করবে, তবে আমরা খাবো। সত্যিই তখন আমার পেট চোঁ চোঁ করছে।

ঘুটু বললে—আজকে খেতে একটু দেরি হবে তোর। কিছু মনে করিসনি,

কাল তোর জন্যে সকাল-সকাল ভাত রাঁধতে বলবো মাকে—

—কিন্তু ভাই, কাল যদি সা'মশাই আর খেপ না দেয় ?

—দেবে না মানে ? খেপ-পিছু এক গণ্ডা করে পয়সা দেব না,—পয়সা পেলে সব বেটা জব্দ, তা জানিস—

আমিও ভাবছিলাম হুটুর বাবা-মা আমাকে দেখে কী বলবে। ওদের তো অবস্থা খারাপ, আমার জন্যে আবার মিছিমিছি অনেক কষ্ট হবে ওদের।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই এক অবাক কাণ্ড। ছোট খড়ের চালের বাড়ি। দেওয়ালের মাটি খসে পড়েছে। মধ্যিখানে একটা উঠোনে পৌঁছতেই দেখি দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা। গলায় কালো কার। মধ্যিখানে একটা পেতলের তক্তি ঝুলছে—

তাদের দেখেই হুটুর মুখখানা কেমন কালো হয়ে গেল।

—বাবা, আমি বৈকুণ্ঠকে বেচবো না, আমি বৈকুণ্ঠকে বেচবো না—

বলে হঠাৎ দু'হাতে বৈকুণ্ঠকে জড়িয়ে ধরলে হুটু।

—আমি কিছুতেই কসাইদের হাতে বৈকুণ্ঠকে বেচবো না, কিছুতেই না — বলে সেই অবস্থাতেই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো সে।

বৈকুণ্ঠ বেচারীও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। সে-ও হুটুর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে যেন এক পরম আশ্রয়ের আতিথ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঁজে রইল।

—কে ?

শংকরকে দেখে জ্যোতির্ময় সেন উঠে বসে সোজা হলেন।

—স্যার, পুলিসরা যাচ্ছে না।

—কেন ?

—আমি তো জ্যোতিদা সেই জন্যেই থানায় গিয়েছিলুম, ও সি'র সঙ্গে দেখা করতে। তারা বললে আপনার রিট্‌ন্ পারমিশন্ ছাড়া পুলিস কন্‌স্টেবল্ রিমুভ করতে পারে না। আপনার যদি কোনও বিপদ হয় তো সে রেস্‌পন্‌সিবিলিটি কে নেবে ?

শংকর যেন আমায় পরীক্ষা করছে। এ-রকম পরীক্ষার মধ্যে অনেকবার পড়তে হয়েছে জ্যোতির্ময় সেনকে। আর শুধু জ্যোতির্ময় সেনই বা কেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই এ-রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয়। ছেলের মৃত্যুশয্যা, সেখানেই অনেক সময় এসে হাজির হয় ঈশ্বরের পরীক্ষা। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবো, না তাঁকে বিশ্বাস করবো? বিপদের সময়েই যে-মানুষ বলতে পারে ঈশ্বর করুণাময়, সে-ই তো প্রকৃত ভক্ত। নারদের ধারণা ছিল তিনিই বুঝি বিষ্ণুর বড় ভক্ত। নারদ বলেছিলেন—আমি সারাদিন আপনার নাম-গান করি, আমার মত এমন গোঁড়া ভক্ত আর কে আছে?

বিষ্ণু বললেন—না নারদ, তোমার চেয়েও আমার আর একজন বড় ভক্ত আছে—

—কে সে?

—সে একজন গেঁয়ো চাষা। তুমি নিজে গিয়ে তাকে দেখে এসো আমার কেমন ভক্ত সে—

নারদ পৃথিবীতে এলেন। সেই গ্রামে এসে দেখলেন নেহাতই গরীব এক চাষা। সারাদিন ক্ষেতে-খামারে চাষ করে। ধুলো-কাদার মধ্যে সারাদিন খেটেখুটে নিঃশ্বাস ফেলবার সময়ই পায় না। রাত্রে শোবার আগে শুধু একবার হরির নাম করে।

বিষ্ণুর কাছে ফিরে এসে নারদ বললেন—দেখে এলাম আপনার ভক্তকে, সারাদিনে মাত্র একবার নাম করে আপনার, আর আমি তো সারা দিন-রাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বীণা বাজিয়ে আপনার নাম করি, আমার চেয়ে ওই চাষাটাই কিনা আপনার বড় ভক্ত হলো?

বিষ্ণু বললেন—তুমি এক কাজ করো তো নারদ, এই এক বাটি তেল নিয়ে পৃথিবীটা একবার ঘুরে এসো তো—

—কেন?

—সে তোমাকে পরে বলবো।

এক বাটি টই-টম্বুর সরষের তেল হাতে নিয়ে নারদ তো ঘুরতে বেরোলেন। সমস্ত বিশ্বটা পরিক্রমা করে আবার এসে হাজির হলেন।

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন—ক'বার আমার নাম করেছিলে নারদ ?

—আজ্ঞে, নাম করবার সময় পেলাম কোথায় আপনার ? এক বাটি তেল নিয়ে কেবল ভয় এই বুঝি চল্‌কে পড়ে, তেল নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম যে।

বিষ্ণু বললেন—তোমায় আমি পরীক্ষা করলাম নারদ। তাহলে ভাবো তো সেই চাষাটার কথা! সারাদিন কত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থেকেও আমার নাম করতে সে ভোলে না—

হুটুরও অভাবের শেষ ছিল না। হুটুদের সংসারেও অভাব আর দারিদ্র্য দু'জনে একসঙ্গে দুটো থাবা পেতে চিরকাল মাথার ওপর হাঁ করে থাকতো। অভাব আর দারিদ্র্য—ওর চেয়ে প্রাণান্তকর জিনিস আর সংসারে দুটি নেই। হুটুর বাবা মাঠে মাঠে ঘুরতো। যেদিন কাজ পেত সেদিনটা বেশ চলে যেত। বারো আনা রোজগার করতো। যেদিন তাও পেত না সেদিন মাছ ধরতো বিলে গিয়ে। সারাদিন ধরে মাছ ধরতে বসে শেষকালে হয়তো একটা পুঁটিমাছ নিয়ে এসে হাজির হতো। কিন্তু গাঁয়ের কেউ মরলে সেদিন আর মুখে হাসি ধরতো না হুটুর বাবার। তাড়াতাড়ি কাঁধে একটা গামছা নিয়েই বেরিয়ে পড়তো। শ্মশানে যাওয়া মানে সেইদিনকার মত অল্-ফাউণ্ড্। অর্থাৎ সন্দেশ-রসগোল্লা থেকে শুরু করে পান বিড়ি সিগারেট সরবত সবকিছু সাপ্লাই করবে মড়ার পার্টি। যে গাঁজা খায় তাকে গাঁজা দেবে। যে ধান্যেশ্বরী খায় তাকে ধান্যেশ্বরীই দেবে। এখান থেকে চাঁপাতলার ঘাট পর্যন্ত মড়া বয়ে নিয়ে যাও পালা করে, আমরা তোমার খাওয়া-দাওয়া সব দেব। মানে চাঁপাতলার গঞ্জের হোটেলে বেশ সরু চালের ভাত, দু'তিন পিস্ মাছ, মাছের ঝোল, ঝোলের ভেতর আলু-পটল-বড়ি, তার পর মুগের ডাল, আলু-ভাতে। সেই ভাত—যত চাইবে তত দেবে। পেট ভরে দম্‌ভোর খেয়ে নাও। পয়সা দেবে মড়ার পার্টি। তারপর মড়া পুড়িয়ে নাইকুণ্ডুটি জলে ফেলে দিয়ে তখন তাড়ি ভাল লাগলে তাড়ি খাও, দিশি ধেনো ভাল লাগলে দিশি ধেনোই খাও।

তা এ-রকম সৌভাগ্য তো রোজ-রোজ জোটে না। ময়নাডাঙ্গার লোক রোজ-রোজ মরতোও না। বড়লোক কেউ মরো-মরো হবার খবর পেলেই হুটুর বাবা গিয়ে হাজির হতো সেখানে। কেমন আছে লোকটা জিজ্ঞেস করতো।

—তোমাদের কর্তা কেমন আছে গো ?

যদি শুনতো নাভিশ্বাস উঠেছে তো আর উঠতো না সেখান থেকে। ডাক্তার আসতো, কবিরাজ আসতো, হোমিওপ্যাথির ডাক্তারও আসতো। ন্নুটুর বাবা সেই যে বসে থাকতো তাদের উঠোনে, আর নড়তো না।

বার বার জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো, ডাক্তার কী বলে গেল? কর্তা বাঁচবেন তো?

বাড়ির লোক বলতো—কে জানে, ভগবান মালিক, তিনিই বলতে পারেন।

ন্নুটুর বাবা বলতো—আহা, বসে বসে তাই তো ভগবানকে ডাকছি গো। কর্তা তো মানুষ নন, তিনি আমাদের দেবতা—

এমনি করে যদি তিন-চারদিন কেটে যাবার পর টাল্‌টা কেটে যেত ন্নুটুর বাবার বড় কষ্ট হতো। এত কষ্ট করেও এ-সুযোগটা হারিয়ে গেল। মারা গেলে পাওনা-থোওনা কিছু হতো। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আরো অনেক কিছুই মিলতো ন্নুটুর বাবার। ময়নাডাঙার বড়লোকরা মারা গেলে গাঁয়ের লোকদেরই সুবিধে হতো।

কিন্তু এমন ঘটনা রোজ-রোজ ঘটতো না। ভারি অসুখের খবর পেলেই ডাক্তার আসতো সদর থেকে। তারপর ওষুধ চলতো, ইন্‌জেক্‌শন্‌ও চলতো। কিন্তু টিঁকতো না শেষ পর্যন্ত। সে-সময়ে ন্নুটুর বাবা কর্তাদের ছেলেদের কাছে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করতো।

বলতো—আহা, দেবতুল্য মানুষ ছিলেন গো তিনি। তিনি গেলেন, আমরাও অনাথ হলাম—

তারপর শ্মশানে যাওয়া থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ন্নুটুর বাবার নাগাড়ে বেগার খাটুনি চলতো। তার বদলে ওই একদিন পাত পেতে খাবে। লুচি, ডাল, ভাজা, পান্তুয়া, রসগোল্লা। ওইটুকুরই লোভ। আর কিছু নয়! ময়নাডাঙার ন্নুটুদের বাবারা তখন ওইটুকুতেই খুশী হতো।

তারপরে খেয়ে-দেয়ে এসে যখন বাড়ি ঢুকতো তখনও ন্নুটুর মা হয়তো জেগে বসে আছে।

—কী গো, খাওয়া-দাওয়া করবে না?

ন্নুটুর বাবা বলতো—না, খুব পেট ভরে খেইছি গো আজ, শুধু ছোলার ডাল দিয়ে কুড়িখানা লুচিই খেয়ে ফেলেছি—তারপর তিন হাঁড়ি দই—

—কোথায় খেলে?

—ঈশ্বরপুরের যাদব কুণ্ডুর বাড়িতে। প্রথমে মনেই ছিল না, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। আমাকে পঞ্চানন মনে করিয়ে দিলে, আর একটু দেরি হলেই খ্যাটটা মাটি হয়ে যেত আর কি। জানো, খাঁটি ঘিয়ের লুচি—গরম গরম—পাতে দিয়েছে আর উড়িয়েছি—পেটটা খুব দম্ মেরে আছে, এক ঘটি জল দাও তো খাই—

যখন কেউই মরতো না ময়নাডাঙায় তখনই মুশকিল হতো হুটুর বাবার। তখন ক্ষেত-মজুরিই ভরসা। তিনটে পেট সংসারে। আর বৈকুণ্ঠ। কিন্তু আট আনা রোজে এই চারটে পেটের সুরাহা করতে গিয়ে হুটুর বাবা নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল! শেষকালে আর কিছু করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। হুটুর বাবার যেদিন খুব ক্ষিদে পেত সেদিন বাড়ির রান্নাঘর থেকে কাঁসার বাসন নিয়ে বেচে আসতো বাজারে—

বাজারের পেতল-কাঁসার দোকানদার বলতো—কী রে দিগম্বর, আজকে আবার কী এনেছিস ?

—আজ্ঞে এই কাঁসিটা।

—চুরির মাল নাকি ?

কথাটা শুনে রেগে যেত দিগম্বর।

—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবেন সেন-মশাই, গরীব বলে আমি কি আপনার কাছে ধারি যে খামোকা গালাগাল দিচ্ছেন।

সেন-মশাই হাসে। খাগড়াই বাসনের কারবার করে করে চুল পাকিয়ে ফেলেছে সেন-মশাই। এই পুরনো বিক্রী করা বাসনই আবার পালিশ করে নতুন বলে চালিয়ে দিচ্ছে বহু বছর ধরে। এটাও তার ব্যবসা। এই গরীব-গুর্বোর কাছ থেকে সস্তায় কিনতে পারলে লাভটা বেশি থাকে।

দিগম্বরের কথায় সেন-মশাই ঘাবড়ায় না।

বলে—তুই দেখছি একেবারে সত্যপীর যুধিষ্ঠির এলি। কলির শুক্রাচার্য একেবারে। বলি চুরি করিস্‌নি কখনও তুই ?

—তা চুরি করলে কি আর এই দশা হয় সেন-মশাই, চুরি করলে দেখতেন য্যাদ্দিন বাড়ি-ক্ষেত-খামার সব কিছু করে ফেলতাম। চুরি করতে শিখিনি বলেই তো আমার আজ এই হেনস্থা—

এত কথার পর পাঁচ সিকে পয়সা নিয়ে চাল কিনে বাড়িতে এসে রান্না করে

খেয়ে তবে শান্ত। একবার ভাত পেটে পড়লে কিন্তু দিগম্বর আবার অন্য মানুষ। তখন নুটুকে কাছে ডাকে, বৈকুণ্ঠকেও কাছে ডাকে। তখন যেন দিগম্বরের মত ভালমানুষ আর দু'টি নেই।

দিগম্বর বলে—চাষার কেবল এগারো মাস দুঃখু রে, আর সব মাস সুখ—

ঠিক এই সময়েই আমি নুটুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি। সারাদিন খেটেখুটে এসে বাড়িতে পৌঁছেই ওই কাণ্ড।

সেদিনও বোধহয় পেটে কিছু পড়েনি দিগম্বরের। রক্তবর্ণ চোখ, আগের দিন থেকে বাড়িসুদ্ধ লোকের ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। গঞ্জ থেকে কশাইরা এসে হাজির হয়েছে। আর বৈকুণ্ঠকে একদৃষ্টে দেখছে।

নুটু সেই খোঁড়া পায়েই দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বৈকুণ্ঠর গায়ের ওপর।

দিগম্বর সামনে এগিয়ে এল।

—ছাড়্ ওকে, ছেড়ে দে—

নুটু বললে—ওকে কাটলে আমাকেও কাটতে হবে, আমাকেও কেটে দু'ফাঁক করতে হবে—

দিগম্বর বললে—কাল থেকে আমাদের পেটে কিছু পড়েনি আর তুই এলি ইয়ার্কি করতে—?

নুটুও তখন তেড়ে উঠেছে বাপের দিকে।

—গায়ে হাত দাও দিকিনি বৈকুণ্ঠর, দেখি তোমার কত আস্পর্ধা—

—তুই আমাকে চোখ রাঙাস্?

সে এক হাতাহাতি কাণ্ড হলো নটবরদের সেই উঠোনের মধ্যে।

আমি নতুন মানুষ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। হঠাৎ নুটুর বাবা চিৎকার করে উঠলো—ছাড়বি না তো? ছাড়বি না তো বৈকুণ্ঠকে?

নুটু রুখে উঠে বললে—না, ছাড়বো না—

নুটুর বাবাও চিৎকার করে উঠলো আরো জোরে।

—তাহলে খাবি কী? কলা খাবি? কিন্তু আমি তোকে খাওয়াতে পারবো না আর, এই বলে রাখছি। আমার আর ক্ষেমতা নেই খাওয়াবার, আমিও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো, যেদিকে দু' চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাবো—আমার কী? আমি কার পরোয়া করবো?

নুটু তখনও বৈকুণ্ঠকে জড়িয়ে ধরে আছে প্রাণপণে।

কশাই দুজন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক আশা করে এ-বাড়িতে এসেছিল তারা। বেশ মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া। এ-বাড়িতে মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু ভেড়াটাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করেছিল নুটু। সেই ভেড়াটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে তারা চলে গেল। পেছন পেছন নুটুর বাবা দিগম্বরও বেরিয়ে গেল বাইরে।

নুটু বললে—দুত্তোর সংসারের নিকুচি করেছে, আমিও এ-বাড়িতে আর থাকবো না—

বলে আমার দিকে চাইলে নুটু।

বললে—আয় রে, চলে আয়, এ-শালার ছোটলোকের বাড়িতে আর থাকবো না আমি, যেখানে বেকুণ্ঠর ঠাঁই নেই সেখানে আমারও ঠাঁই নেই—আয়, চলে আয়—

ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমিও নুটুর সঙ্গে বাইরে চলে আসছিলাম। আমার কাছে তখন নুটুও যা, নুটুর বাবাও তাই। এ এক অদ্ভুত বাড়ির মধ্যে, অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে আমি এসে পড়েছিলাম। আমার সেই বয়েসের সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরের এক নতুন জগতে এসে আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোথায় সেই আমাদের বাড়ি, সেই শুকদেব, সেই দরোয়ান, সেই মাস্টারমশাই, সেই রঘু, সেই বাবা। কোথায় সেই পরিজ আর ডিম, কোথায় সেই অবিশ্রান্ত আরামের উপকরণ আর কোথায় এই অভাব, এই দারিদ্র্য আর এই ঝগড়া।

এতক্ষণে নুটুর মা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

—কোথায় যাচ্ছিস তুই নুটু ?

নুটু যেন শুনতেই পেলে না।

কিন্তু আমি দেখলাম দড়ির মত পাকানো একজন মেয়েমানুষ। গায়ে একটা সেমিজ কি সায়া-ব্লাউজ কিছু নেই। ছেঁড়া শাড়িটাকে গায়ে জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

নুটু আমার দিকে চেয়ে বললে—ওদিকে দেখিসনি, ও রাক্ষসী, আমার বাবাটা আর মা'টা দু'জনেই রাক্ষুসী—কেউ ভাল নয়। আমার বৈকুণ্ঠকে ওরা বেচে দিতে চায়, ওদের মুখই দেখবো না আর—চলে আয়—

সারা সকাল খাওয়া হয়নি। ক্ষিধেও পেয়েছিল আমার খুব।

নুটুর মা আবার ডাকলে—ওরে, কোথায় যাচ্ছিস তুই নুটু—চাল এনেছিস্ ?

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো। চালের থলিটা উঠোনের এক কোণে পড়েছিল। সেটা মা'র দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—খা, যত পারিস ভাত রেঁধে খা, আমি আর এ বাড়িতে ঢুকছি নে—

বলে বৈকুণ্ঠর গলাটা ধরে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

আমি বললাম—তাহলে কী করবি মুটু? খাবি কী? থাকবি কোথায়?

মুটু বললে—দূর, খাবার আবার ভাবনা! বীরচকের ইটখোলায় গেলে এখ্খুনি আমায় লুফে নেবে। বারো আনা রোজ। এতদিন তো সাধাসাধি করছিল ইটখোলার সরকার, তোকেও কাজ পাইয়ে দেব আমি। তুই ইট বইতে পারবি না? মাথায় করে ইট বইতে পারবি না? খেপ-পিছু দশখানা ইট?

সেই-ই প্রথম শুরু। জ্যোতির্ময় সেনের জীবনে সে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। বইতে পড়া জগতের সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য ছিল না সে-জগতের। তখনও এমনি করে ইহকাল পরকালের ধারণা ভেঙে যায়নি। বইয়ের পাতায় ছাপানো কথাগুলোই তখন সবাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত। হরিসাধনবাবু বলতেন—পাপের পরাজয় অনিবার্য। তিনি বলতেন, যে মিথ্যে কথা বলবে পরকালে তার নরকবাস নিশ্চিত।

নরক সম্বন্ধেও কেমন একটা ঝাপসা-ঝাপসা ধারণা ছিল আমার।

কিন্তু আজও কি সে-ধারণা স্পষ্ট হয়েছে?

আমি জিজ্ঞেস করতাম—নরক দেখতে কী রকম স্যার?

নরক যে কী রকম দেখতে তা আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে টাঙানো একটা ছবিতে খুব ভাল করে আঁকা ছিল। ছবিটা কোথা থেকে এসেছিল, কে টাঙিয়েছিল ওখানে, তা জানতাম না। যখন ঘুরতে ঘুরতে সারা বাড়িটাতে আর কোথাও ঘোরবার বাকি থাকতো না তখন আকাশ, রোদ, হাওয়া, চৌবাচ্চা দেখাই কাজ ছিল আমার। যখন সেগুলোও পুরনো হয়ে যেত তখন দেখা জিনিসগুলোই আবার চেয়ে চেয়ে দেখতাম। দেখতাম আমাদের দরোয়ান কেমন করে রুটি তৈরি করে। কেমন করে আমাদের বুড়ী ঝি রোদে পিঠ দিয়ে বড়ি দেয়। কেমন করে রঘু সাবান দিয়ে কাপড় কাচে।

আর যখন তাও ভালো লাগতো না তখন মাঝে মাঝে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতাম।

ভাঁড়ার ঘরটার মধ্যে সারাদিনের মধ্যে কোনও সময়েই রোদ ঢুকতো না। অন্ধকার ঘুপসির মতো একটা গুমোট গন্ধ। সে এক অদ্ভুত গন্ধ ভেতরে। গুড়, মশলা, বড়ি, আরশোলা, তেজপাতা, ইঁদুর, সরষের তেল সব কিছু একসঙ্গে মেশালে যে রকম অদ্ভুত একটা গন্ধ হয় ঠিক সেই রকম। ওগুলো কখনও একসঙ্গে মেশাইনি। কিন্তু মেশালে যে ঠিক ওই রকম গন্ধ বেরোবে তা আমি নির্ঘাত বলে দিতে পারতুম।

তার ভেতরেই ছিল আচার। আমের, কুলের, আমড়ার আর আরো কত কিসের। আমাদের বুড়ি ঝি'র বিশেষ কাজ ছিল না। বসে বসে কেবল ওইসব করতো। অথচ অত আচার যে কে খাবে কে জানে! বাবাও আচার খেতো না, আমিও খেতাম না। আমি খেতে চাইলেও রঘু আমাকে খেতে দিত না। কিন্তু আমি জানতাম কোথায় সেগুলো থাকে। বড়ির বড় বড় জারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চুরি করে ওগুলো খেতাম।

চুরি করে খেয়ে জিভ-এর তৃপ্তি হতো কিন্তু মনের তৃপ্তি হতো না। কারণ বইতে লেখা ছিল 'চুরি করা মহা পাপ'।

জিজ্ঞেস করতাম—নরক কী রকম দেখতে স্যার ?

হরিসাধনবাবু বলতো—খুব ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—। যারা চুরি করে, যারা মিথ্যে কথা বলে তারা সেই নরকে যায়—

ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে দেওয়ালে টাঙানো সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি অনেকক্ষণ দেখতাম। যমের দরোয়ানরা কাউকে হাত-পা বেঁধে মুগুরপেটা করছে, কাউকে গরম তেলের মধ্যে ডুবিয়ে মারছে, কাউকে উদুখলে বেঁধে প্রাণপাত করছে। সত্যিই সে-সব নারকীয় দৃশ্য। রঘু যেদিন বললে যে ওগুলো নরকের দৃশ্য সেদিন থেকেই আমি আচার চুরি করে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

আসলে ১৯৩৯ সালের আগে পর্যন্ত নরক সম্বন্ধে মানুষের সেই সব পুরনো ধারণাই ছিল। পাপ করলে নরকে যেতে হয়, চুরি-বাটপাড়ি করলে নরকে যেতে হয়, ব্ল্যাক মার্কেট করলে নরকে যেতে হয়। এই নরকের ভয়ই অনেক মানুষকে সাধু করে রেখেছিল তখনকার দিনে। মানুষ না খেতে পেয়ে মরলেও কেড়ে খেতে পারতো না। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় লোকে না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরেছে তবু দোকান লুটপাট করেনি। ওই নরকের ভয়ে। পুলিসের গুলির ভয়ের চেয়েও ভীষণতর ভয় ছিল নরকের ভয়। গুলিতে মানুষ

এক মিনিটে মরে কিন্তু নরকে দগ্ধে দগ্ধে মরে। জার্মানীতে মার্টিন লুথারও একদিন এমনি করে বিদ্রোহ করেছিল। সে সেই ১৪৮৩ থেকে ১৫৪৬ সালের কথা। চাষার ছেলে। একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো যে চার্চের পুরুতরা সব বুজরুক। পোপকে কিছু টাকা দিলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। স্বর্গে যাবার রাস্তা ক্লিয়ার হয়। কিংবা পাদরীর সামনে নিজের পাপ অকপটে স্বীকার করলেই সাত খুন মাপ। লুথার বললে—এ সব মিছে কথা। লুথার আরো বললে—চার্চ কেউ না, পোপ কেউ না, পাদরীও কেউ না। একমাত্র চাই বিশ্বাস। একমাত্র চাই faith। 'The just shall live by faith.' মানুষের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিশু নয়, চার্চও নয়, ত্রাণকর্তা তার বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায়ে ভক্তি তর্কে বহুদূর।

সেই সময়ে য়ুরোপের মানুষও বুঝি আস্তে আস্তে ভগবানে বিশ্বাস হারাচ্ছিল। দেশে যখন মানুষের হাতে আস্তে আস্তে প্রচুর টাকা আসতে লাগলো, তখন ভগবান যে টাকার চেয়ে দামে ছোট হয়ে যাবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে। তারা বলতে আরম্ভ করলো—ও-সব পরকাল-টরকালের কথা ছেড়ে দাও, বুড়ো বয়েসে যাতে আরামে থাকতে পারি সেই টাকার সংস্থান আগে করতে দাও। টাকা থাকলে সেন্ট ফ্রান্সিসও খাতির করবে আমাকে। কেউ তখন পর নয়—

এর পর থেকেই ওদের দেশে মিডল-ক্লাস সমাজের শুরু আর ফিউড্যাল সমাজের পতনের সূত্রপাত। হুটুরা ওদের দেশে জন্মালে এতদিনে ওদের পরের জমিতে খেটে খাবার পালা অন্ততঃ শেষ হতো। নিজের একটু ক্ষেত হতো, নিজের জমিতে নিজেরা খেটে ফসল ফলাতো। ইণ্ডিয়ায় জন্মেছে বলে হুটুরা চারশো বছর পেছিয়ে আছে। চারশো বছর পরে আজো হুটুদের সেই একই দুর্দশা।

দুপুরবেলা আমাকে মাঠের ধারে বসতে বলে ইটের ভাঁটায় কাজ করতে লাগলো হুটু।

বললে—একটু বোস তুই এই গাছতলাটায়, আমি একটু খেপ মেরে আসি—

জ্যোতির্ময় সেনের সেদিন খুব ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল। কাকে বলে ক্ষিদে তা তার আগে তেমন করে আর কখনও অনুভব করেননি তিনি। বিষ্টু মণ্ডলের ইটের ভাঁটার লোকেরা ভোরবেলায় পান্তাভাত নিয়ে কাজে যেত।

তারপর দুপুরবেলা এক ঘণ্টা ছুটি। সেই সময় বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে আসতে পারো। সারাদিন মাথায় করে ইট বয়ে গাড়িতে তুলতে হবে। সারাদিন কাজ করে মজুরি দেবে তিন আনা।

সেই কাঠফাটা রোদ্দুর, তার মধ্যেই একটা বাবলা গাছতলায় বসে সেদিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। হঠাৎ একটা চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গিয়ে জ্যোতির্ময় সেন চেয়ে দেখলেন মুটু যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছে জোরে জোরে।

—নগদ পয়সা দেবেন না, তা আগে বলেননি কেন আমাকে?

যে লোকটা ইটের ভাঁটার ম্যানেজার, সেও বেশ তিরিক্ষে মেজাজের মানুষ। তারও গলার জোর খুব।

সে বলছে—নগদ পয়সা যে তোকে দেব, তখন কাল যদি আর না আসিস? তোকে আমি চিনিনে ভেবেছিস? তোর কি কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে, তুই তো তিন আনা পয়সা পেলেই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবি তিনদিন—তখন তো আর তোর পাত্তাই পাওয়া যাবে না—

—তা আমার ন্যায্য পাওনাটা দেবেন না?

লোকটা পয়সা দেয়, সুতরাং কারোর মাথাগরম সহ্য করবে কেন?

বললে—সাতদিন পরে আসিস, দেব—এখন যা—কাজ করগে—

—কিন্তু আপনাকে বলেছি এখুনি আমার পয়সার দরকার, আমার সাঙাত ওখানে বসে আছে, ওরও খাওয়া হয়নি, আমারও উপোস, পয়সা না দিলে খাবো কী আমরা? হরি-মটর খাবো? আমাদের বুঝি ক্ষিদে পায় না?

লোকটা এতক্ষণে বাবলা গাছতলাটার দিকে চেয়ে আমাকে দেখতে পেলে।

আমি শুয়েই পড়েছিলাম মাটির ওপর। চেঁচামেচিতে তখন উঠে বসেছি।

—ওই তো, দেখুন না ওর দিকে চেয়ে, ও মশাই আমার মত গরীবের ছেলে নয়, বড়লোকের ছেলে, নেহাত আমার সঙ্গে ভাব হয়েছে তাই আমাদের বাড়িতে এসেছে, নইলে ও কেন উপোস করতে যাবে আমার সঙ্গে? ওর কিসের দায় পড়েছে?

ভদ্রলোক আমাকে এ অবস্থায় দেখে সত্যিই কেমন যেন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। খাঁ-খাঁ করছে মাঠ। সেই মাঠের মাটি কেটে-কেটে ইট তৈরী

হচ্ছে। দূরে ভাঁটায় আগুন জলছে, ধোঁয়া উঠছে দাউ-দাউ করে। আর এ পাশে ছোট একটা হোগ্‌লার চালের ঘর। সেইটেই ছিল বিষ্টু মণ্ডলের ইটের ভাঁটার অফিস। শুধু হুটু নয়, হুটুর মতই আরো কত ছেলে বিষ্টু মণ্ডলের ইট বয়ে নিজেদের বুকের পাঁজর ফোঁপরা করে ফেলেছে। বিষ্টু মণ্ডলের জন্যে খেটে খেটে তিন আনা পয়সার দাসখত লিখে দিয়ে ময়নাডাঙা তার জোয়ানদের সেদিন বলি দিয়েছে। এতদিন পরে সে-কথাগুলো মনে করে জ্যোতির্ময় সেন যেন নিজেকে অপরাধী মনে করলেন। কই, তিনি তো একবারও এখানে আসেননি। এখন তো তাঁর হাতে খানিকটা প্রতিকার আছে। এখন তো তিনি ইচ্ছে করলে হুকুম দিয়ে দিতে পারেন যে মজুররা তাদের দিন-মজুরি নগদে পাবে। কিংবা এমন আইনও করতে পারতেন যে যারা দিন-মজুর তাদের ওপর অবিচার হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্যে এই ময়নাডাঙায় একজন লেবার অফিসার কিংবা ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বসিয়ে দিতে পারতেন। হয়ত তাতে কিছুই কাজ হতো না। যাকেই এই ময়নাডাঙায় ওয়েলফেয়ার অফিসার করে পাঠাতেন সে-ই হয়ত ঘুঁষ নিয়ে মজুরদের চেয়ে মালিকদের সুখ-সুবিধে বেশি দেখতো। এ-রকম কতবার হয়েছে, কতবার হচ্ছে, আবার কতবার হবে।

সেই দুপুরবেলা যখন হুটু আমি আর বৈকুণ্ঠ তিনজনে তিন আনা পয়সায় পেট ভরাবার চেষ্টা করছি ঠিক সেই সময়ে হুটুর মা এসে হাজির।

মা গরীবই হোক আর বড়লোকই হোক, তবু সে তো মা! আমি নিজের মাকে দেখিনি কিন্তু হুটুর মাকে দেখেছিলাম। স্বামী তো বাউণ্ডুলে মানুষ। কোথাও যদি খেতে পেলে তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে ভুলে গেল। কারো বাড়িতে লুচি ভাজার গন্ধটা নাকে লাগতে যেটুকু দেরি। তখন আর দিগম্বর কারো নয়। সোজা একেবারে সে বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে, নিজেই কাটারি দিয়ে বাঁশ কাটতে শুরু করে দিয়েছে, কিংবা কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে আরম্ভ করেছে।

যারা চিনতে পারবে না তারা দিগম্বরকে স্বভাবতই জিজ্ঞেস করবে—তুমি কে হে?

দিগম্বর কৃতার্থের মত দাঁত বার করে উত্তর দেবে—আজ্ঞে, আমারে চিনলেন না, আমি দিগম্বর—

শুধু দিগম্বর বললে চিনতে না পারারই কথা। কিন্তু তবু লোকে চিনতে

পারে দিগম্বরকে। তার হাব-ভাব-চেহারাখানাই তার আসল পরিচয়। তাকে দেখলে আর পরিচয় জানার প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের অসংখ্য ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরদের সে একজন। যখন ক্ষেতের কাজ পায় না তারা তখন বীরচকের বিষ্টু মণ্ডলের ইটের ভাঁটায় কাজ করে তিন আনা রোজ পায়। বর্ষাকালে তাও বন্ধ। তখন শ্মশান-যাত্রী। কোথাও কেউ মরলো তো খবর পেলেই সেই শ্মশান-যাত্রীদের দলে ঢুকে পড়ে। বড়লোকের মড়া হলে তো কথাই নেই।

এমন যার স্বামী আর এমন যার ছেলে, সে মানুষটিকে ঠিক না দেখলে চেনা যায় না। বাংলাদেশের কত সংসারে যে এমনি মানুষ আড়ালে বসে কত জীবনযন্ত্র এক হাতে চালিয়ে নিয়ে চলেছে তার বোধহয় গোনাগুনতি নেই। এদেরই প্রতিনিধি দিগম্বর, হুটু, বৈকুণ্ঠ আর তার মা। এরা সকালবেলা ভাত রাঁধলে সে ভাত দুপুরবেলাও খাবে, আবার রাত্রিবেলাও খাবে। কিন্তু ভাত দিলে যেন আবার ডাল চেয়ে বসো না। নুন দেব এক খাবা। সেই নুন দিয়ে একথালা ভাত খেতে পারবে না ? যারা বড়লোক তারা ভাতের সঙ্গে একটু ডাল খাক। দরকার হলে তরকারি খাক। আলু কুমড়ো পটল ওসব শ্রাদ্ধ-বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলে দিগম্বর খেয়ে থাকে মাঝে-মাঝে। খেয়ে এসে মাঝে-মাঝে আবার তার গল্পও করে।

দিগম্বর তার লম্বা তালিকা দেয়। বলে—আলু-পটলের দম্ খেলাম—ছানার ডাল্না খেলাম, শাক-ভাজা খেলাম—

যারা শোনে তারা জিজ্ঞেস করে—আর ? আর কিছু খেলি না ?

দিগম্বর আরো উৎসাহ পায়। বলে—ছোলার ডাল খেলাম—

—ভাজা ? শুধু শাক-ভাজা ? বেগুন-ভাজা করেনি ?

—না বেগুন-ভাজা করেনি।

বেগুন-ভাজা করেনি শুনে বন্ধুরা মুষড়ে পড়ে বলে—দূর, বেগুন-ভাজা না-করলে নেমন্তন্ন খাওয়া কিসের ? শুধু ছোলার ডাল দিয়ে খেলি কী করে ? ভাজা না হলে ডাল মুখে রোচে ? আর শাক-ভাজা কি আর ভাজা ?

যারা খাওয়া নিয়ে আলোচনা করে, তাদের সকলেরই দিগম্বরের মত অবস্থা। সকলেরই নুন-ভাত বরাদ্দ। কিন্তু তাদের যুক্তিটা অন্যরকম। তারা বলে—নেমন্তন্ন বাড়িতে খারাপ খাবো কোন্ দুঃখে শুনি ? নেমন্তন্ন করলেই তোমাকে কালিয়া-পোলোয়া খাওয়াতে হবে—

খাওয়ার আলোচনা করতে বড় ভাল লাগতো দিগম্বরের। আলোচনা করতে করতে এক-এক সময় তর্ক হতো। তর্ক করতে করতে শেষমেষ সে-তর্ক গালাগালি মারামারিতে পর্যন্ত গিয়ে ঠেক্‌তো।

—তুই খাওয়ার কী বুঝিস রে? খাওয়ার তুই কী বুঝিস্?

দিগম্বরের গাঁজার বন্ধু তারক দে। তারক দে বলতো—আমি বুঝি না তো তুই বুঝিস্? জানিস আমরা চাঁদপাড়ার দে? আমাদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় তিন হাজার লোক পাত পেতে নেমন্তন্ন খেতো—

ঝুটুর বাবা দিগম্বরের সাতকুলে নাম করবার মত কেউ ছিল না। তবু বলতো ওরকম মুখে সবাই বড়াই করতে পারে; খাইয়ে দেখিয়ে দে দিকিনি তুই কতবড় খাওন্‌দার!

—তোকে খাওয়াতে যাবো কেন শুনি? তুই আমার কে যে তোকে খাওয়াবো? তুই আমার কুটুম না জ্ঞাতি? তুই তো মড়ি-পোড়ানোর খাইয়ে—

কথাটা বলতে-না-বলতেই দিগম্বরের মাথায় চড়াক করে রক্ত উঠে গেছে। গাঁজার দম দেওয়া রক্ত, বড় পাজি রক্ত। একবার চড়লে আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত। হাতের কাছে গাঁজার কলকেটা ছিল, সেটা নিয়ে তারক দের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে। তারপর সে এক রক্তগঙ্গা কাণ্ড। তাড়াতাড়ি বাড়ি এসেই কাপড়ের রক্তটা ধুয়ে ফেলে দিন দশেক কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়ে রইল, পুলিসে তার খোঁজখবর পেলে না। তারপর যখন তারক দে সেরে উঠলো তখন আবার বেরিয়ে এল দিগম্বর। তখন আর পুলিসে করবে কী! তখন তো তারক দের সঙ্গে দিগম্বরের আবার ভাব। তখন তো আবার গাঁজার আড্ডায় খাওয়া নিয়ে আলোচনা করে একসঙ্গে।

তখন নেমন্তন্ন খেয়ে এসেই দিগম্বর বলে আলু-পটলের দম খেলাম—ছানার ডাল্‌না খেলাম, শাক-ভাজা খেলাম—

—আর? আর কিছু খেলি না?

তারপরে আবার কখনও ঝগড়া হয়, কখনও আবার হয়ও না। কখনও গলায় গলায় ভাব। আবার কখনও গাঁজার কল্‌কে নিয়ে মাথা ফাটানোর মত ব্যাপারও ঘটে। এমনি যখন অবস্থা তখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম ময়নাডাঙায় ঝুটুদের বাড়িতে।

ঝুটুদের না-আছে খাবার সংস্থান, না আছে বাঁধা রোজগার। চালে খড়

নেই, জ্বালায় রোজকার খাবার চাল নেই, মহাজনের কাছে দেনা, মুটুর মার শরীর খারাপ, সেই অবস্থায় আমার মত একজন অজ্ঞাতকুলশীল ছেলে গিয়ে রাজ-সমাদর পেয়ে গেল।

মুটুর মা হঠাৎ বীরচকের ইটের ভাঁটায় নিজে এসে হাজির।

আমাকে দেখে বললে—হ্যাঁ বাবা, মুটু কিছু খেয়েছে ?

আমি বললুম—না, কিছু খায়নি—মুটুও কিছু খায়নি, আমিও কিছু খাইনি—

—আহা, আমি দুটি চাল চড়িয়েছি হাঁড়িতে, কিন্তু মুটু না খেলে আমি তো সে ভাত মুখে তুলতে পারবো না—একবার মুটুকে ডেকে দাও না তুমি—

অনেক দূরে মুটু ইটের মোট বইছিল। কাছে গিয়ে ডাকলুম তাকে।

কিন্তু মাকে দেখেই মুটু ক্ষেপে উঠেছে একেবারে।

বললে—তুমি কেন এলে ? কী জন্যে এলে ? আমি তো বলেছি আমি তোমাদের মুখদর্শন করবো না—

মুটুর মা বললে—তা তুই না খেলে যে আমি খেতে পারছি নে—আমারও তো ক্ষিদে পায়, আমিও তো কিছু খাইনি সকাল থেকে—আমিও তো মানুষ রে একটা, আমারও তো বয়েস হচ্ছে—

—তা তোমরা কী বলে আমার বৈকুণ্ঠকে কশাইয়ের কাছে বেচতে যাচ্ছিলে ?

বৈকুণ্ঠ এতক্ষণ গাছতলায় চুপ করে ঝিমোচ্ছিল। তার কথা উঠেছে সেটা বোধহয় সে বুঝতে পারলে। বুঝে বেঁটে ল্যাজটা একটু নাড়িয়ে দিলে। গলার ঘুঙুরটা একটু ঠুন ঠুন করে বেজে উঠলো।

আমরা সবাই এতক্ষণে চেয়ে দেখলাম বৈকুণ্ঠর দিকে। নিজেদের ক্ষিদের জ্বালায় তার কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিলাম। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে যে এই আমার পাশেই এতক্ষণ চুপ করে বসে আছে, তা জানতেই পারিনি।

আমি এতক্ষণে বললাম—এই দেখ্ না, বৈকুণ্ঠরও খুব ক্ষিদে পেয়েছে, বৈকুণ্ঠও কিছু খায়নি সকাল থেকে—

বৈকুণ্ঠর কথা ভেবেই মুটু বোধহয় একটু নরম হলো। বললে—ও কথা বলতে পারে না কি না, তাই ওর ওপরে তোমাদের যত তেজ—

মুটুর মা বললে—আমি তো বলছি আমি ওকেও খেতে দেব- দু রেক চাল চড়িয়েছি হাঁড়িতে—

—ওকে কিন্তু বেশি ভাত দিতে হবে—

—তা দেব। আমি কি বলছি দেব না ?

তারপর মুটুর যেন এতক্ষণে আমার কথাটাও মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—কি রে, তোরও তো ক্ষিদে পেয়েছে খুব ?

আমি বললাম—কেন, তোর ক্ষিদে পায়নি ?

মুটু বললে—আমার কথা ছেড়ে দে, আমার তো গা-সওয়া হয়ে গেছে—বলে মা'র দিকে চেয়ে বললে—চলো, গিন্নি গো—পোড়া পেটের জ্বালায় গিলতে তো হবেই, বৈকুণ্ঠর জন্যেই আজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। জানিস রে জ্যোতি, আমার জন্যে আমি ভাবি নে, আমি বাপের জন্যেও ভাবি নে, মায়ের জন্যেও ভাবি নে। এই বৈকুণ্ঠটাই হয়েছে আমার গলার কাঁটা—এর জন্যে আজ আমাকে খেটে খেতে হচ্ছে, নইলে কবে বাড়ি ছেড়ে জাহান্নমে চলে যেতুম—

বৈকুণ্ঠ না থাকলে মুটু যে কোথায় চলে যেত তা কিন্তু কোনও দিন বলতো না। সত্যিই যেন বৈকুণ্ঠর জন্যেই মুটু আট্‌কে আছে তার বাপের সংসারে। যেন সত্যি এ-সংসার তার নিজের সংসার নয়, তার বাপের সংসার। দিগম্বরই যেন সাধ করে নিজের সুখের জন্যে এই সংসার পেতেছে।

মুটুর মাও আমার পাশে পাশে যাচ্ছিল।

সারাদিন মুটুর মাও ছেলের জন্যে মুখে কুটোটি দেয়নি, মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল।

আমার দিকে ফিরে মুটুর মা বললে—দেখলে তো বাবা আমার ছেলের মেজাজ, যেমন ও মানুষটা ছেলেও আমার তেমনি হয়েছে। দুজনে মেজাজ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর আমার হয় যত জ্বালা—যেন যত পাপ আমিই করেছি, যেন আমার শরীর-গতিক বলে কিছু থাকতে নেই—

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে মুটুর মা। আর আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না। শুধু সঙ্গে সঙ্গে মুটুর পেছন পেছন বোবার মত চলতে লাগলাম।

এমনি করেই ছেলের সঙ্গে মায়ের ঝগড়া হতো আর এমনি করেই আবার একদিন তাদের ভাব হয়ে যেত। একেই হয়ত বলে সংসার। সংসারের হয়ত নিয়মই এই। এই অভাব আর এই ভাব। ভাব আর অভাবের আঘাত-প্রত্যাঘাতেই সংসারের চাকা আদিকাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে

চলেছে সামনের দিকে। ইঞ্জিনের পিস্টনের মত। রেলের ইস্টিশানে অনেক বার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের চলা দেখেছি। পিস্টন্‌টা একবার সামনের দিকে যায় আর একবার পেছনে হটে আসে। কিন্তু চাকাগুলো সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

ন্টু যখন খেতে বসে, তখন কিন্তু সব রাগ ভুলে যায়।

আমার দিকে চেয়ে বলে—খা, পেট ভরে খা—

ন্টুর মা বলে—তুমি বাবা রাজার ছেলে, তুমি কেন মরতে এলে আমাদের বাড়িতে!

আমারও অপরাধবোধ জেগে উঠতো মনের ভেতর। আমি কেন এদের বাড়ির এত কষ্টের ভাত খাচ্ছি। এদের অন্ন বহু পরিশ্রমের অন্ন। সেই অন্নে ভাগ বসাতে কেমন লজ্জা করতো জ্যোতির্ময় সেনের।

জ্যোতি বলতো—এবার আমি এখান থেকে চলে যাবো ভাই—

কেন? তোর খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে?

জ্যোতি বলতো—খাবার কষ্ট নয়, আমার তো ভালোই লাগছে, কিন্তু তোর মা-বাবা কী ভাবছে বল্ তো—

কথাটা শুনে ন্টু ক্ষেপে উঠতো। হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠতো—মা, মা, ও মা, কোথায় গেলি তুই—

ছেলের ডাক শুনে মা দৌড়ে আসতো। বলতো—কী বাবা, আর দুটো ভাত দেবো?

ন্টু বলতো—দিতে হবে না ভাত, তুমি জ্যোতিকে কী বলেছ শুনি? জানো, আমি তোমায় খুন করে ফেলবো যদি জ্যোতিকে কিছু বলো!

মা তো শুনে অবাক। বলতো—আমি? আমি ওকে কী বলেছি?

আমি বলতাম—না মাসিমা, ন্টুর কথা তুমি শুনো না, ও একটা পাগল, পাগলের কথায় কান দিও না তুমি—

ন্টু বলতো—পাগল-ছাগল হলে কি হবে, মনে করো না আমি কিছু বুঝি না। আমি সব বুঝি! ওই রাক্ষুসীটার যত রাগ আমার বৈকুণ্ঠর ওপর আর তোর ওপর।

—ওমা, কী বলছিস তুই?

ন্টু বলতো—হ্যাঁ, ঠিক বলছি, শালা আমি নিজে রোজগার করছি, সেই রোজগার ওরা খাচ্ছে। তোর কী বলবার আছে? আমি কি বাবার

রোজগার খাচ্ছি? বাবা কটা পয়সা রোজগার করে শুনি? এ মাসে কটা পয়সা রোজগার করেছে বাবা?

জীবনে জ্যোতির্ময় সেন সুখের মুখ কিন্তু কম দেখেননি। যখন দিল্লিতে গেছেন, কিংবা কলকাতায় কোনও হোটেলে গেছেন—সে সরকারী মর্যাদাতেই হোক আর বেসরকারী মর্যাদাতেই হোক—আরাম আনন্দ বিলাসিতা তাঁর প্রাপ্য বলেই তিনি ধরে নিয়েছেন।

এই যেমন আজকে। কাল রাত থেকেই তো তাঁর খিদ্‌মতের জন্যে এলাহী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নিচে থেকে রান্নার গন্ধ আসছে, আর শংকর তো আছেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেবল আসছে। আসলে উদ্দেশ্য কাছে থাকবে। কাছাকাছি থাকলে মানুষের মন পাওয়া যায়। মন পাবার জন্যেই সবাই ব্যস্ত। কিন্তু সংসারে মন পাওয়া কি অত সহজ? আর একবার মন পেলেই কি চিরকালের মত মনের মানুষ হওয়া যায়!

আমি জানি পলিটিক্সে চিরকালের বলে কিছু নেই। আজ আমি চিফ্‌ মিনিস্টার তাই আজ আমার এত খাতির। কিন্তু আর পাঁচ বছর পরে যদি আমি ভোটে হেরে যাই, তখন অন্য চিফ্‌ মিনিস্টার এখানেই এসে আবার ঠিক আজকের আমার মতই খাতির পাবে।

আসলে সংসারী লোকের কাছে খেতাবটাই সব। খেতাব থাকলেই খেদমত্‌ পাবে তুমি। অন্ততঃ আমার এতদিনের অভিজ্ঞতাতে তো সেই কথাই জেনেছি। কিন্তু আজকে যা টাটকা কালকে তা বাসি হয়ে যাবে। যে খেতাব আর সবাই-ই পেয়েছে সে খেতাবের মূল্য কী? সে খেতাবের খাতির কতটুকু? চিফ্‌ মিনিস্টারের পোস্ট তো একটাই। ভাগ্যিস একটা পোস্ট! একটা পোস্ট বলেই সব খাতিরটুকু কেন্দ্রীভূত হয়ে আমার মাথাতে এসেই পড়ে। নইলে কী হতো!

বহুদিন আগে একটা কথা পড়েছিলুম। সত্যি, জীবনে কত জিনিসই আছে পড়বার মত, আর পড়ে মুখস্থ করবার মত। তবু সেই লাইনটা মনে আছে। কথাটা ছিল সাহিত্য সম্বন্ধে। আসলে ঠিক সাহিত্য সম্বন্ধে নয়, গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে। একজন লেখক লিখেছিলেন—'Tell me what fiction is, and I will tell you what truth is.'

আজকে এতদিন রাজনীতি করে আর এতকালের রাজনীতির ইতিহাস পড়ে আমিও বলতে পারি—'Tell me what politics is, and I will

tell you what treachery is.' এ-কথাটা যদি আমি কোনও মীটিঙে গিয়ে বলি তো আমার এই পোস্টটা সবাই মিলে কেড়ে নেবে। সত্যিই তো আমি কীই না করেছি এই পোস্ট পাবার জন্যে। কত লোককে চাকরি দিতে হয়েছে অযোগ্য জেনেও। শুধু পাঁচ বছর পরের ভোটের কথা ভেবে আজকে একটার পর একটা অন্যায় আমাকে করে যেতে হচ্ছে।

অথচ আজকে আমার ক্যাবিনেটের প্রত্যেকটি মেম্বারকে যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনারা কটা অন্যায় করেছেন ভোট পাওয়ার জন্যে? কত মিথ্যে কথা বলেছেন, কত চুরি করেছেন, কত বেনামী পারমিট লাইসেন্স দিয়েছেন? বলুন তো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে আপনার কত সম্পত্তি ছিল, আর এই কুড়ি বছর পরে সে সম্পত্তির পরিধি কত পার্সেণ্ট বেড়েছে?

একবার আমার ফাইনান্স মিনিস্টার বলেছিল—না জ্যোতিদা, এ-সব কথা তুলবেন না আপনি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন তুলবো না? আর আমি না তুললেও একদিন না একদিন এ-প্রশ্ন তো আমাদের ভোটাররা তুলবেই—

ফাইনান্স মিনিস্টার বলেছিল—না, তারা তুলবে না। সে-ব্যাপারে আপনি জ্যোতিদা নিশ্চিন্ত থাকুন—

আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলুম—কিন্তু পাঁচ বছর পরে তো আবার আমাদের ভোটারদের দ্বারস্থ হতে হবে—

ফাইনান্স মিনিস্টার বলেছিল—সে ভয় নেই। দেশের মানুষরা সব গাধা, সে তো আপনি জ্যোতিদা জানেনই। আমাদের মেজরিটি থাকবেই।

—কিন্তু নিউজ-পেপার? খবরের কাগজ?

ফাইনান্স মিনিস্টারের নিজেরই একটা বিরাট ফ্যাক্টরি আছে দমদমে। বললে—কী যে বলেন আপনি জ্যোতিদা, খবরের কাগজে আমাদের কত লাখ টাকার বিজ্ঞাপন থাকে তা জানেন? সেটা কি মিছিমিছি দেওয়া হয় বলতে চান?

—কিন্তু সেটাও তো অন্যায় শম্ভু। এও তো একরকমের লোক-ঠকানো। এও তো একরকমের ট্রেচারি—

শম্ভু আমার চেয়েও সাকসেসফুল মানুষ। ব্যবসার জগতে সে কুড়ি বছরে

অনেককে ছাপিয়ে মাল্‌টি-মিলিওনেয়ারের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এবার হেসে ফেললে সে, বললে—আপনি জ্যোতিদা, এতদিন পলিটিক্স করছেন, আপনাকে আমরা চিফ্‌ মিনিস্টার করেছি, আর আপনি আজ এটাকে ট্রেচারি বলছেন? আর ট্রেচারিই যদি বলেন তো স্ট্যালিন ট্রট্‌স্কিকে খুন করে ট্রেচারি করেনি? পলিটিক্স-এ কে ট্রেচারিতে কম বলুন? হিটলার ট্রেচারি করেনি? আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ট্রেচারি করেনি? ট্রেচারির জন্যে জুলিয়াস সিজার খুন হয়নি? আইসেনহাওয়ার ট্রেচারি করেনি? অত কথা কিসের, আমাদের মহাত্মা গান্ধী ট্রেচারি করেননি? নইলে কেন তাঁকে খুন হতে হলো? আর নেহরু?

আমি শম্ভুর কথা শুনে চুপ করে রইলুম। এই আমার ক্যাবিনেট মিনিস্টার আর এরাই পাবলিক মীটিঙে গিয়ে ত্যাগের বাণী, মহত্ত্বের বাণী, জ্ঞানের বাণী দেয়।

ভাগ্যিস ক্যাবিনেট মীটিং, তাই রক্ষে। নিউজ পেপারের রিপোর্টার কেউ নেই। শম্ভু বললে—না জ্যোতিদা, স্টাফ-রিপোর্টারদের ভয় করবেন না, ওরা আমাদের হাতে। সে-সব বন্দোবস্ত পাকা হয়ে আছে। যে আমাদের দলে থাকবে না সে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবে না। আর শুধু কি তাই নাকি, ওদের তো বছরে একবার করে আমেরিকা ইংলণ্ড জার্মানী রাশিয়া ঘুরিয়ে আনছি—

অনেকদিন মনে মনে ভেবেছি আর কতদিন! আর কত মাস! আর কত বছর!

কিন্তু যতই ভেবেছি ততই আরাম পেয়েছি, শ্রদ্ধা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি আর [illegible]য়েছি ভোগ। জীবনকে উপভোগ করবার যত রকম আধুনিক উপকরণ আছে পৃথিবীতে সবই ভোগ করেছি। কিন্তু তবু ভয় হয়েছে। ভেবেছি—আর কতদিন! আর কত মাস! আর কত বছর? 'Tell me what fiction is, and I will tell you what truth is.'

কিন্তু আমার মাথায় কেবল একটা উত্তরই ঘুরে বেড়িয়েছে—'Tell me what politics is, and I will tell you what treachery is.'

দিগম্বরের গাঁজার আড্ডার বন্ধু তারক দে সেদিন হঠাৎ বড় রক্ত গরম করে ফেললে। নেশার ঘোরে আবোল-তাবোল কথা উঠেছিল আড্ডায়। অনেকদিন মড়া পোড়ানোর কোনও বরাত পায়নি কেউই।

তারক দে বললে—শালা লোকে আর মরছে না মাইরি আজকাল—সবাই অমর হয়ে যাচ্ছে—

দিগম্বর বললে—তুই শালা খেয়ে-খেয়েই একদিন মরবি—

হঠাৎ তারক দে রেগে গেল। বললে—মুখ সামলে কথা বলবি দিগম্বর, আমরা শালা চাঁদপাড়ার দে।

দিগম্বরের আবার মাথা গরমের রোগ। একে খাওয়ার লোভ, তার ওপরে মাথাগরম। গাঁজা খেতে খেতে উঠে দাঁড়ালো। বললে—আমাকে তুই শাসাচ্ছিস? আমি কে তুই জানিস?

—জানি, তুই শালা একটা আহাম্মক—

—কী বললি?

গাঁজায় তখন পুরো দম টেনে নিয়েছে দিগম্বর। বেশ তর্ রয়েছে মেজাজটা। সেই অবস্থাতেই গাঁজার কলকেটা ছুঁড়ে মারলো তারক দের দিকে। কলকেটা গিয়ে লাগলো তারক দের রগের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

—খুন হয়েছে, খুন হয়েছে—

দলের যারা এতক্ষণ নেশা করছিল তাদের যেন এবার টনক নড়লো। রক্তে তখন ভেসে যাচ্ছে তারক দে'র মুখ। দেখেই দৌড়তে লাগলো সবাই। দিগম্বরও দৌড়লো। বিষ্টু সামন্তর ইটের খোলা পেরিয়ে ময়নাডাঙার বিলের পাড় বেয়ে দিগম্বর দৌড়তে লাগলো রেল-লাইন লক্ষ্য করে। তখন আর তার কোনও দিকে জ্ঞান নেই। পোঁ পোঁ করে দৌড়চ্ছে দিগম্বর। কোথায় রইল বউ, কোথায় রইল ছেলে, সে সব কথা ভাববার আর তখন সময় নেই তার। একেবারে সোজা গিয়ে একটা চলন্ত মালগাড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

এরকম পালিয়ে যাওয়া দিগম্বরের নতুন নয়। যার পেছুটান নেই তার

ঘরও যা বাইরেও তাই। তারপর তোমরা বাঁচো আর মরো আমি তো আর দেখতে আসছি নে। আর তারপর একদিন আবার হঠাৎ হাসতে হাসতে বাড়িতে এসে হাজির—

—কই গো, কোথায় গেলে গো সব তোমরা ?

যেন বিশ্বজয় করে এসেছে এমনি ভাবখানা। নুটুর মা মানুষের মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থাকতো।

দিগম্বর বলতো—কী গো, সব কেমন আছো তোমরা ?

নুটুর মা'র রাগ হয়ে যেত। বলতো—মরে গেছি কিনা তাই দেখতে এসেছো ?

দিগম্বর বলতো—রাগ করো কেন গো, খবর পেলুম তারক দে বেঁচে উঠেছে, তাই চলে এলুম। বেটা আমার সঙ্গে দেয়ালা করতে এসেছে! চাঁদপাড়ার দে তো আমার কী ? আমি কি তার ধারি, না খাই ? এক দম্ গাঁজা খেতে গিয়ে যার চোখ উলটে আসে, সে আসে আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে—

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে—নুটু কই ? নুটু—

বউ বলে—নুটুর খোঁজ করে তোমার কী হবে ? তুমি কি তাকে খাওয়াবে—

—আবার রাগ করে। এ ক'দিন ছিলুম না তাতে তোমার তো ভালোই হলো গো, তোমার চাল বেঁচে গেল—বেশ পেট পুরে মায়ে-পোয়ে আমার ভাতগুলো খেয়েছ—

—কী খেয়েছি, দেখবে ?

বলে সত্যিই নুটুর মা রান্নাঘরের ঝাঁপ্‌টা খুলে দেখালে। দিগম্বর দেখলো। চাল নয়, ডাল নয়, আলু নয়, কুমড়ো নয়, কিছু নয়। কচু। কচুর শাক। এক হাঁড়ি কচুর শাক সেদ্ধ হচ্ছে উনুনে।

রাগ হয়ে যেতো দিগম্বরের। বলতো—তোমাকে বলে দিয়েছি না আমি যে কচু খেতে আমার ভাল লাগে না ? আবার সেই কচুর শাক রাঁধছো ?

নুটুর মা বললে—না খেতে ভালো লাগে তো খেও না, আমাদের ভাল্লাগে তাই আমরা খাই।

ঠাট্টাও বুঝতে পারতো দিগম্বর। বলতো—আবার ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে, কিন্তু বলে দিচ্ছি, এবার চলে গেলে আমি কিন্তু আর ফিরে আসবো না—

বলে সেই মাটির দাওয়ার ওপরেই বসে পড়তো দিগম্বর। বলতো—দাও, কচুই হোক আর ঘেঁচুই হোক, দাও খাই। আমি না হয় বুঝলুম, কিন্তু পেট তো আর ঠাট্টা বুঝবে না—

বলে সেই কচুর শাকই গরম গরম গিলতো দিগম্বর।

তা সেই তারক দে'র সঙ্গে পরের দিনই আবার খুব ভাব। আবার দেখা গেল তারক দে দিগম্বরের প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এক কলকেতে আবার দুজনে গাঁজা খাচ্ছে আর প্রাণ ভরে হাসছে। এক গাঁয়ে পাশাপাশি বাস করতে গেলে ঝগড়াও যেমন করতে হয়, আবার ভাব না করলেও চলে না। অবস্থা দুজনেরই এক। পেশাও তাই এক রকম। মড়া জুটলো তো ভাল-মন্দ জুটলো, নইলে নয়।

তারক দে বলতো—শালার ডাক্তারগুলোই হয়েছে ডাকাত, কাউকে আজকাল মরতে দিচ্ছে না—

ময়নাডাঙার বাবুদের বাড়ির বুড়োদের দেখলেই তাদের দিকে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। এইবার বুড়ো মরবে। বাবুদের বাড়ির বড় কর্তাকে অনেকদিন ধরে টাক করে আসছিল। বুড়ো পাকা আমের মত টুস্ টুস্ করতো। এই পড়ে তো এই মরে।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বুড়োকর্তার অসুখ।

দিগম্বর দরোয়ানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো—কী গো, তোমার বুড়োকর্তা কেমন আছে ?

দরোয়ান বলতো—তবিয়ত খারাপ, ডাক্তারবাবু দেখছে—

এমনি রোজ, রোজ-রোজ গিয়ে খবর নিতো দিগম্বর। শেষকালে যখন শ্বাস উঠলো তখন আর সেখান থেকে নড়তো না। গেটের সামনে বড় পাকুড় গাছটার তলায় বসে থাকতো। আর খবর নিত কেমন আছে বুড়ো-কর্তা। ডাক্তার বেরিয়ে গেলেই খবর নিতো। বলতো—বুড়োকর্তা কেমন আছে ডাক্তারবাবু?

শুধু দিগম্বর নয়, তারক দে, শশী হাজরা, নিমাই দাস সবাই। সবাই হাঁ

করে শকুনের মত বসে থাকতো। শ্মশানের ঘাটের ধারে গাছের মগডালে যেমন শকুন বসে থাকে তেমনি। গাঁজার আড্ডার যত ইয়ার-বক্সী ছিল ময়নাডাঙায় সবাই একে একে খবর পেয়ে আসতো।

—কী গো দরোয়ানজী, কী খবর? কেমন আছে তোমার বুড়োকর্তা!

শেষকালে এমন অবস্থা হতো যে আনন্দের চোটে ছিলিম ছিলিম গাঁজা উড়তো। কিন্তু বুড়োকর্তার মরবার নাম নেই। যখন সত্যি-সত্যিই অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল তখন বুড়োকর্তার ছেলেরা বাপকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। সেখানেই মারা গেল বুড়োকর্তা। বুড়োকর্তা সেই-ই মরলো, অথচ ময়নাডাঙায় মরলো না। সেই কলকাতাতেই একদিন সৎকার হলো বুড়োকর্তার। শ্রাদ্ধও হলো একদিন। লোকজন পাত পেতে খেলো। খুব ঘটা করেই শ্রাদ্ধ হলো। এ-পাড়া ও-পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক নেমন্তন্ন হলো, কিন্তু দিগম্বর, তারক দে, শশী হাজরা, নিমাই দাস তাদের কারো সে নেমন্তন্নতে ডাক পড়লো না।

এমনি যখন অবস্থা ঠিক সেই সময়েই ময়নাডাঙায় এসে হাজির হয়েছিলাম আমি।

সে একেবারে পৃথিবীর উল্টো পিঠ। জ্যোতির্ময় সেনের নিজের বাড়িতে যে অবস্থা, তার সম্পূর্ণ উল্টো দশা। একদিকে প্রাচুর্য আর একদিকে শূন্য। কিংবা শূন্যও বুঝি তার থেকে ভালো বলতে গেলে বলা যায় মাইনাস। হুটু আর দিগম্বর সেই মাইনাস শ্রেণীর মানুষ। যাদের না দেখলে মানুষের উল্টো পিঠটা দেখা যায় না।

বলতে গেলে হুটু আর দিগম্বররাই ইণ্ডিয়ার মানুষদের মধ্যে মাইনাস একশো।

তাই যখন প্রথম মন্ত্রী মীটিং হলো ক্যাবিনেটের, তখন বলেছিলাম— আমাদের প্রথম কাজ হবে মাইনাস একশোদের ভালো করা, তাদের প্লাস-পর্যায়ভুক্ত করা—

ক্যাবিনেটের কয়েকজন আপত্তি করেছিল। বলেছিল—স্যার, এটা আপনার বাড়াবাড়ি—বড়লোক গরীব লোক আছে বটে, কিন্তু তাদের আপনি প্লাস-মাইনাস বলবেন না, ওতে কংগ্রেসের বদনাম হবে—

রেগে গিয়েছিলেন জ্যোতির্ময় সেন। বলেছিলেন—এ কী বলছো

তোমরা? কংগ্রেসের বদনাম হবে, কি সি. পি. আই-এর বদনাম হবে, সেইটেই বড় কথা, না গরীবদের ভালো হবে সেইটেই বড় কথা?

শম্ভু তখন ছিল ফাইন্যান্স মিনিস্টার। শম্ভু বলেছিল—এটা আপনি কী বলছেন, জ্যোতিদা? মাইনাস যে বলছেন, মাইনাস আপনি দেখেছেন কখনও? জানেন, লাস্ট সেন্‌সাসে দেখা গেছে ইণ্ডিয়ার পার ক্যাপিটা ইনকাম কত পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এই ক'বছরে?

—তুমি থামো শম্ভু।

শম্ভু বলেছিল—না স্যার, আপনি দেখেননি। দিল্লির National Council of Applied Economic Research সব স্টেটের সার্ভে করে লিখেছে—'West Bengal enjoys a higher per Capita income (Rs 281) compared to whole of India—'

জ্যোতির্ময় সেন আর থাকতে পারেননি। বলেছিলেন—স্ট্যাটিস্‌টিকস্-এর কথা ছেড়ে দাও শম্ভু। কত টাকার মণি-অর্ডার স্টেটের বাইরে চলে যাচ্ছে তা জানো? তার হিসেব রাখো?

শম্ভু সব জানে। সব জেনেও যারা চোখ বুঁজে থাকে তাদের নামই ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট। এই ভেস্টেড ইণ্টারেস্টরাই একটা দল গড়ে তার নাম দিয়েছে কংগ্রেস। কিম্বা অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সেই ভেস্টেড ইণ্টারেস্টরাই কংগ্রেসে এসে দল বাড়িয়েছে। আমরা এখন পাওয়ার পেয়েছি তাই তারা এখন আমাদের দলে। যেদিন দেখবে আমাদের দলে থেকে তাদের আর সুবিধে হচ্ছে না তখন আবার তারা আমাদের দল ছেড়ে অন্য দল তৈরি করবে। যেমন এখন আগাছার মত অনেক দল গজাচ্ছে—

কিন্তু মুটুরা দিগম্বররা কোনও দিন কারোর দলে নেই, কেউ তাদের কোনও দিন দলে টানেনি। শুধু দরকারের সময় তাদের আমরা ভোট দিতে বলেছি।

মুটু এসব জানতো না। আমিও তখন এসব জানতুম না। এসব হয়ওনি তখন।

মুটু আর আমি তখন গরুর গাড়িতে চড়ে এ-পাড়া ও-পাড়া দিন-মজুর খেটে বেড়িয়েছি। বীরচকের বিষ্ণু সামন্তর ইটের খোলায় গিয়ে মুটু ইট ডেলিভারি দিয়েছে। খেপ পিছু দশখানা ইট। বারো গণ্ডা রোজ। তারপর আছে বাজারের সাহাবাবুর খড়ের গোলা। সাহাবাবুর সরকার কেদারকে

একগণ্ডা পয়সা দিলেই খেপ দিত হুটুকে।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম—তোর কষ্ট হয় না হুটু ?

হুটু বলেছিল—কেন, তোর কষ্ট হয় বুঝি ?

তারপর একটু থেমে বলেছিল—তোর তো কষ্ট হবেই—আমার বৈকুণ্ঠরও কষ্ট হয়—

কথাগুলো বোধ হয় কানে যেত বৈকুণ্ঠর। হঠাৎ গলার ঘুঙুরের ঝুম ঝুম আওয়াজ উঠতো। বোধ হয় সেও বুঝতে পারতো। যেন বলতো—না না, আমার কষ্ট হয় না—

হুটু বলতো—দেখলি তো, ও-ও আমার কথা বোঝে। ও-ও তোর মত বলছে ওর কষ্ট হয় না—বলে হাসতো।

সেদিন ওর মা কথাটা আবার পাড়লো।

বললে—বাবা, একটা কথা শুনবি ?

হুটু বললে—কী ? যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই—

হুটুর মা বললে—তোদের কারো সময় নেই, শুধু আমারই যত সময় আছে দেখছি—

হুটু বললে—ওসব ভণিতে রাখো, কী কথা বলবে বলো। বাবা কোথায় ?

হুটুর মা বললে—সে কার মড়া পোড়াতে গেছে, পরশু আসবে—

হুটু বললে—তাহলে বাবা শুধু মড়াই পোড়াক, আর আমি শালা খেটে খেটে মরি। দরকার নেই আমার সংসারে থেকে, আমিও একদিন সকলকে ছেড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই—

—তুই চলে গেলে চলবে কী করে ? তাহলে আমিও কি মজুর খাটতে বেরোব ?

—তাই বেরোও না, কে তোমায় বারণ করছে ? আমি কেন তোমাদের জন্যে খেটে মরতে যাবো ? আমি আর আমার বৈকুণ্ঠ দুজনে মিলে আমার আয়ে চালিয়ে নেব। তোমাদের বোঝা আমি কেন বইতে যাবো মিছিমিছি ?

—তা আমি তোর কেউ নই ?

হুটু বললে—তুমি আমার কে, বলো না ? কে তুমি আমার ?

—ও মা, তুই বলছিস কী ? আমি কেউ নই তোর ?

হুটু বললে—না, কেউ নও। বৈকুণ্ঠই আমার সব।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—চল্ রে, ওরা কেউ আমার আপনার নয়, কেবল আমার রোজগারে সবাই খাবে—

হুটুর মা এবার আমাকে এক পাশে ডাকলে।

বললে—তুমি একটু শোন তো বাবা এদিকে—

আমি কাছে গেলাম। হুটুর মা বললে—তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো না বাবা যে কলিমুদ্দিন এসেছিল আবার—

—কলিমুদ্দিন ?

—ওই যে বাজারের কশাই। এখন চল্লিশ টাকা দিতে চায়। বলেছে টাকাটা একসঙ্গে দেবে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না বাবা, চল্লিশটা টাকা হাতে পেলে এখুনি ঘরের চালাটা খড় দিয়ে ছাইতে পারি। এই সামনে বর্ষা আসছে, তখন ঘরে থাকতে পারা যায় না। ওরা না হয় বেটাছেলে, বাইরে বাইরে থাকতে পারে। আমি মেয়েমানুষ, ঘর ছেড়ে তো রাতের বেলা বাইরে গিয়ে শুতে পারি নে—

আমি বললাম—আচ্ছা মাসিমা, আমি বলছি ওকে গিয়ে—

হুটুর মা বললে—কথাটা তুমি এখন ব'লো না, বাড়ির বাইরে গিয়ে বলো।

তাই বললাম। রাস্তায় যেতে যেতে এককাঁকে সব বললাম। হুটু একেবারে রেগে খুন। বললে—কে! কলিমুদ্দিন মিয়া ? কলিমুদ্দিন মিয়া বলেছে ? দাঁড়া, দেখাচ্ছি—

বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে লাগলো। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। কলিমুদ্দিনকে মারবে নাকি হুটু। মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। আমার সঙ্গে আর কথা বলছে না। গরু দুটোকে মারতে মারতে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। রাগে গরগর করতে লাগলো হুটু। পেছনে যে বৈকুণ্ঠ আসছে সেদিকেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝুম্ ঝুম্ করে তার গলার ঘুঙুরটা বেজে চলেছে। গাড়ির পেছন পেছন সেও দৌড়ে চলেছে।

চলতে চলতে একেবারে বাজারের মধ্যে এসে হাজির হলো হুটু। একেবারে কলিমুদ্দিনের কশাইখানার সামনে। কয়েকটা পাঁঠা-খাসী তখন ছাল ছাড়ানো অবস্থায় ঝুলছে। কয়েকজন খদ্দের মাংস কিনছে তখন।

হুটু গাড়ি থেকে সোজা নেমে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো—এই শালা—

মাংস ঘেঁচতে ঘেঁচতে কলিমুদ্দিন হঠাৎ 'শালা' ডাক শুনে সামনের দিকে চেয়ে দেখলে। হাতে তার ধারালো চকচকে ছোরা।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম খুব। এখুনি একটা খুনোখুনি কাণ্ড বেধে যায়! যদি মুটুকে খুন করে বসে কলিমুদ্দিন!

রতন হঠাৎ ঘরে ঢুকেছে। বললে—হুজুর, আপনার খাবার দেওয়া হবে?

এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন জ্যোতির্ময় সেন। সে কতদিনকার কথা। কত যুগ আগের সব কাহিনী। এই ময়নাডাঙাতেই তখন কেটেছে তাঁর কত মাস। তখন পলিটিক্স করতেন না জ্যোতির্ময় সেন। সহজ-সরল চোখ দিয়েই সহজ-সরল ঘটনাগুলো দেখেছেন। প্রত্যেক ঘটনার তখন অন্য মানে ছিল তাঁর চোখে। সে-চোখটা এখন হারিয়ে গেছে, এই পলিটিক্স করার পর থেকে। এতদিন পরে যেন এই স্তব্ধ নির্জন পরিবেশের মধ্যে নিঃসঙ্গ অস্তিত্বে একাকার হয়ে আবার সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলেন।

আবার ফিরে এলেন বর্তমানের রূঢ় বাস্তব পরিস্থিতিতে।

বললাম—কটা বাজলো ঘড়িতে রতন?

রতন বললে—বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি আছে—

হঠাৎ জ্যোতির্ময় সেনের মনে হলো মানুষ যে হাতে ঘড়ি পরে এটা সভ্যতার অভিশাপ। সভ্যতা ভাল জিনিস। সভ্যতা আমাদের অনেক কিছু সুবিধে এনে দিয়েছে। এই সভ্যতার দৌলতেই একজন সাধারণ মানুষ কলকাতার বুকে বসে কাশ্মীরের আপেল, কালিফোর্নিয়ার কমলালেবু, ঢাকার ইলিশ, বেলুচিস্থানের আঙুর খেতে পারে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। হয়ত বাদশা আকবর, সম্রাট জুলিয়াস সিজার, দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরোবা হয়েও এ-সুবিধে পায়নি। তারা কল্পনা করতেও পারেনি যে একদিন সভ্যতার সুযোগে সাধারণ মানুষ এমনি করে পৃথিবীর সেরা সেরা জিনিসগুলো ঘরে বসে ভোগ করবে। কিন্তু আসলে সেটাই কি সব। এমন মানুষও তো

আছে যে এই ভোগের যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায়। এমন মানুষও তো আছে যে টাকা-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে! অতিষ্ঠ হয়ে ঘুমের পিল খায়!

সভ্যতা হয়ত ভালো জিনিস কিন্তু ঘুমও তো ভোগের মতই অপরিহার্য। হেনরি ফোর্ডের জীবনী পড়েছিলেন একবার জ্যোতির্ময় সেন। কোটি-কোটি-কোটি টাকার মালিক ছিলেন হেনরি ফোর্ড। মোটরগাড়ি বেচা পয়সা। টাকা উপায় করতেই তিনি চেয়েছিলেন একদিন। এত টাকা উপায় করতে চেয়েছিলেন যে যেন পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ভোগ করতে পারেন অনায়াসে। কিন্তু হেনরি ফোর্ডই যখন তাঁর ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর কম-মাইনে-পাওয়া কর্মচারীরা গপগপ করে গোগ্রাসে তাদের লান্চ্ খাচ্ছে, তখন হিংসে হতো তাদের ওপর। তাঁর নিজের হজম করার শক্তি ছিল না। তাই তিনিই তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন—'আমি আজ একটা ডিম খেয়েছি এবং তা হজম করতে পেরেছি—'

যিনি মোটরগাড়ি বেচে সারা বিশ্বকে একদিন জয় করতে পেরেছিলেন, নিজের কাছে তিনিই পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। সভ্যতা তাঁর কাছে অভিশাপ হয়ে উঠেছিল। তিনি সেই জন্যেই গরীব-অসভ্যদের ঈর্ষা করতেন।

ওই ঘড়ি। কোথায় যেন পড়েছিলেন জ্যোতির্ময় সেন যে ঘড়িই যন্ত্রযুগের প্রথম অবদান। ঘড়ির মধ্যেই যন্ত্রযুগের প্রথম অভিশাপ লুকিয়ে ছিল। নইলে সময়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে গুঁড়িয়ে মহাকালের ভয় ঘড়ি ছাড়া আর কে প্রথম দেখালো! ঘড়িই তো প্রথম জানালো যে—'সাবধান, সময় নষ্ট করো না, সামনে মৃত্যু!' ঘড়িই তো প্রথম মানুষকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নামিয়ে মানুষের পরমায়ু কমিয়ে দিলে। ঘড়িই প্রথম বললে—'মহাকাল অজেয়, মানুষ মহাকালের কাছে পরাজিত নশ্বর এক প্রাণী। প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ো, নইলে অন্য মানুষ তোমাকে হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবে—'

আর তার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল মানুষের ছোটা। মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মানুষে মানুষে সংগ্রাম, মানুষে মানুষে শত্রুতা। কী চমৎকার ছিল তখন ময়নাডাঙার জীবন! কেউ ঘড়ি দেখতো না, প্রতিযোগিতা করতো না, ভবিষ্যৎ ভাবতো না। আকাশ যেমন উদার আর অকৃপণ, ময়নাডাঙার গরীব মানুষগুলো ছিল ঠিক তেমনি। আকাশের মতই তারা অত্যাচার সহ্য

করতো, যেমন করে আকাশ ধোঁয়ার অত্যাচার সহ্য করে, ঝড়ের অত্যাচার সহ্য করে। কিন্তু আকাশ কি কিছু মনে রাখে? শরৎকালের আকাশ সব ভুলে গিয়ে আবার কেমন শান্ত শুভ্র হয়ে ওঠে। মুটুরাও তাই। মুটুরাও কিছু মনে রাখতো না। বিয়ে-বাড়ি শ্রাদ্ধ-বাড়ি থেকে একবার গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেও আবার একদিন সেইখানেই খেতে পাবার জন্যে ভিখিরির মত গিয়ে হাজির হতো।

—জ্যোতিদা—

এবার আর রতন নয়, এবার আবার শঙ্কর নিজেই এসেছে।

শঙ্কর বললে—আপনার খাবার রেডি জ্যোতিদা। গল্‌দা চিংড়ির মালাইকারিটা করতেই একটু দেরি হয়ে গেল—

—গল্‌দা চিংড়ি? ওসব কি আমি খাই? ওসব হাঙ্গাম আবার করতে গেলে কেন?

শঙ্কর বললে—আমি কী করবো, রথীদা কিছুতেই ছাড়লে না। রথীদা বললে ভেড়িতে গল্‌দা উঠেছে, এক-একটা এক সের, ঘিলু-ভরতি। এদিকে জ্যোতিদা এসেছে, এ অপারচুনিটি তো ছাড়া যায় না—

—কোন্ রথী? রথী কে?

শঙ্কর বললে—আজ্ঞে রথীন সিকদার। তাঁর মাছের ভেড়ি আছে যে—

মনে পড়লো জ্যোতির্ময় সেনের। রথীন সিকদার। মুড়াগাছা মণ্ডল-কংগ্রেসের এক্স প্রেসিডেন্ট। বললেন—তার তো জেল হয়েছিল ছ'মাস—

শঙ্কর বললে—হ্যাঁ জ্যোতিদা, ঠিক ধরেছেন আপনি, কিন্তু সে তো দলাদলির জন্যে। আসলে খুব অমায়িক ভদ্রলোক। সেই মুড়াগাছা থেকে আপনার জন্যে নিজে একঝুড়ি মাছ বেছে নিয়ে এসেছেন, বলেছেন জ্যোতিদার জন্যে স্পেশাল সাইজের মাছ জেলেদের দিয়ে ধরিয়েছি—

—জেল থেকে কবে ছাড়া পেলে সে?

শঙ্কর বললে—সে অনেক কাণ্ড! বাইরে আছেন, ডাকবো নাকি?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন?

শঙ্কর বললে—ওকে নাকি নমিনেশান দেওয়া হচ্ছে না—

—কে দিচ্ছে না নমিনেশান?

শঙ্কর বললে—ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস—

—ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস নমিনেশান দিচ্ছে না তো আমি কী করবো ? আর নমিনেশান পেয়েই বা হবে কী ? আরো টাকা আয় করবে ? মাছের আরো বড় ভেড়ি তৈরী করবে ? মিনিস্টার হবে ? এখন নমিনেশান পাবার জন্যে আমায় ধরাধরি করছে, শেষকালে একবার ভোটে জিততে পারলে তখন আবার মিনিস্টার হবার জন্যে আমায় ধরাধরি করবে। আমি তো এসব জানি—

শঙ্কর বললে—না জ্যোতিদা, ইনি সেরকম লোক নন, এঁর টাকার অভাব নেই, ইনি শেষ জীবনটা শুধু দেশের সেবা করতে চান—

—দেশসেবক হতে চান ?

হ্যাঁ জ্যোতিদা, ওঁর তো ছেলে-মেয়ে নেই ; বলেন, দেশের ছেলে মেয়েরাই ওঁর ছেলে-মেয়ে।

জ্যোতির্ময় সেন রেগে গেলেন। বললেন—দেখ শঙ্কর, আমাদের দেশে বড় বেশি দেশসেবক জন্মেছে—

—আপনি ঠাট্টা করছেন জ্যোতিদা—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—না, ঠাট্টা করছি না। আমি পণ্ডিত নেহরুকে একবার বলেছিলুম যে দেশসেবক দেখলেই যদি পুলিসকে গুলি করবার অর্ডার দেন তো বোধ হয় দেশের অবস্থা ভাল হয়, দেশসেবকরাই দেশের সব চেয়ে বড়···

হঠাৎ বাইরে যেন সামান্য গোলমাল শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর বাইরে চলে গেল। বললে—এই, আপনারা চুপ করুন, জ্যোতিদা বিরক্ত হচ্ছেন···

আর কিছু শুনতে পেলেন না জ্যোতির্ময় সেন। এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। এই এত বছর মিনিস্ট্রিতে থেকে এই খোশামোদ, এই চাটুকারিতা, এই সুবিধাবাদ, এসব এখন আমার নিজের প্রাপ্য বলেই মনে হয়েছে। পাঁচ বছর পর-পর ইলেকশান হয়েছে, আর প্রত্যেকবারই ভোটে জিতেছি আমি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধেও তো অনেকে অনেক কিছু বলে। সবগুলো কানে আসে না তাই। কানে এলে এখনও রাগ হয়। মনে হয় তার ওপর প্রতিশোধ নিই, কিন্তু ইলেকশানের কথা ভেবে চুপ করে থাকি। দরকার হলে তাকে আবার খুনী করবার জন্যে লাইসেন্স-পারমিট পাঠিয়ে দিই। দিয়ে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে পুরে ফেলি।

শঙ্কর হঠাৎ আবার ঘরে ঢুকলো। পেছনে আর একজন লোক।

শঙ্কর বললে—এই হচ্ছেন রথীন সিকদার মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা না করে…

রথীন সিকদার কাছে এসেই একেবারে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে আর মাথায় ঠেকালে।

—কী, ব্যাপার কী?

রথীন সিকদার বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—কী কথা? নমিনেশান?

বুঝলাম শঙ্করের সামনে কিছু বলতে চায় না। আমি শঙ্করের দিকে চেয়ে বললাম—শঙ্কর, তুমি একটু বাইরে যাও তো—

শঙ্কর বাইরে চলে গেল। বাইরের পাশের ঘরে তখন অনেকগুলো লোক এসে জমা হয়েছে। শঙ্কর ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—সিকদার মশাই এখন কথা বলছেন জ্যোতিদার সঙ্গে।

একজন বললে—কিন্তু আমি বলে রাখছি শঙ্করবাবু, এই শেষ চান্স, যদি জ্যোতিদা রথীনবাবুকে নমিনেশান না দেয় তো আমরা সবাই দল বেঁধে কংগ্রেস ছেড়ে দেব এই বলে রাখলুম। যত সব চোর-বদমাইসদের নমিনেশান দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের মুড়োগাছার বেলায় অষ্টরম্ভা! কেন? আমরা কি কংগ্রেস মেম্বার নই? আমরা জ্যোতিদার ইলেকশানের সময় সাড়ে আট হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিইনি? তখন কেষ্ট হালদার কোথায় ছিল? কেষ্ট হালদার ক'দিন কংগ্রেসে ঢুকেছে? মদের দোকান থেকে লাখ লাখ টাকা আয় করে বলে সে আজ রথীন সিকদার মশাইয়ের চেয়ে বেশী কংগ্রেসী? আবার কেষ্ট হালদারকে ক্যাবিনেটে নেওয়া হবে বলে ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে শুনেছি, তা যদি হয় তো নির্ঘাত আমরা আঠারোজন এম. এল. এ. একসঙ্গে অপোজিশানের সঙ্গে হাত মেলাবো—

কথা বলতে বলতে বাইরের গোলমালের আওয়াজ আমার কানে এল।

বললাম—তোমার সঙ্গে আর কে কে এসেছে রথীন?

রথীন সিকদার বললে—আমাদের আঠারোজন এম. এল. এ. আমার সঙ্গে এসেছে, আমাকে নমিনেশান না দিলে ঠিক করেছি অপোজিশানে জয়েন করবো—

আমি হাসলাম। বললাম—কেষ্ট হালদারের ওপর তোমাদের অত রাগ কেন বলো তো ? সে মদের কারবার করে বলে ?

রথীন সিকদার বললে—সে এক লাখ টাকা পার্টির ফাণ্ডে চাঁদা দিচ্ছে বলেই তাকে ক্যাবিনেটে নেওয়া হবে শুনছি। কিন্তু জানেন, সে চোলাই-করা মদ বাইরে বিক্রি করে ? তার বদনাম আছে মুড়োগাছাতে। তাকে ইলেকশানে দাঁড় করালে কংগ্রেস গো-হারান হারবে। এই রকম করেই তো দিন-দিন কংগ্রেসের বদনাম হচ্ছে—

—আর তোমাকে নমিনেশান দিলে বুঝি কংগ্রেস জিতবে ? তুমি মাছের ভেড়ি করে টাকা করোনি ? আজকে আমাকে খাওয়াবার জন্যে একঝুড়ি গলদা চিংড়ি আনোনি তুমি ? গভর্মেণ্টের রিলিফ-ফাণ্ডের টাকা সরিয়েছ বলে তোমার জেল হয়নি ? নমিনেশান পেলে তুমি জিততে পারবে ? তাতে কংগ্রেসের বদনাম হবে না ?

তারপর একটু থেমে আবার বললাম—দেখ, রামকৃষ্ণদেব বলতেন যাকে ভূতে পায় সে বুঝতে পারে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে। বলতেন—কেল্লায় যাবার সময় বুঝতে পারা যায় না যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভেতরে গাড়ি পৌঁছুলে তখন বোঝা যায় কত নিচেয় এলাম। তোমার হয়েছে তাই। তুমি কত নিচেয় নামছো এখন বুঝতে পারছো না রথীন। আরো নিচেয় নামলে বুঝতে পারবে—

রথীন সিকদার চুপ করে সবটা শুনছিল। তারপর বললে—কিন্তু একটা কথা আজ আপনাকে বলে রাখছি জ্যোতিদা, আমায় যদি নমিনেশান না দেন তো আমি অপোজিশানে চলে যাবো—

বললাম—শেষকালে তুমিই আবার একদিন বলবে ক্যাবিনেটে তোমাকে না নিলে তুমি দল ছেড়ে দেবে—

রথীন সিকদার বললে—তা কেষ্ট হালদার যদি মিনিস্টার হয় তো আমিই বা মিনিস্টার হতে পারবো না কেন ? কেষ্ট হালদারকে মিনিস্টার বানান করতে বলুন তো ! তাতেই কি কংগ্রেসের ইজ্জৎ বাড়বে ?

—আচ্ছা, তুমি যাও এখন রথীন। আমি এসব আলোচনা করতে এখানে আসিনি, তুমি তো জানো আমি এখানে এসেছি কৃষিজীবী কন্‌ফারেন্সে প্রিসাইড্ করতে—সভাপতিত্ব করতে—

—তার চেয়ে বলুন না কেন ভোট ক্যানভ্যাস করতে।

বলে গটগট করে রথীন সিকদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একবার ভাবলাম রথীন সিকদারকে ডেকে পাঠাই। তার সঙ্গে যে আঠারোজন এম. এল. এ. এসেছে তাদেরও ডাকি। কিন্তু মনে হলো—থাক্। কী হবে ডেকে। সত্যিই তো, যারা পার্টিতে থাকবে না, তাদের খোশামোদ করে রেখে লাভ কী।

তারপর ডাকলাম—রতন—

রতন এল। বললাম—শঙ্করবাবুকে গিয়ে বল্ যেন আর কাউকে আমার ঘরে ঢুকতে না দেয়—

একজন চাষার বেশি বয়েসে একটা ছেলে হয়েছিল। ছেলেটাকে খুব যত্ন করতো। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে এমন সময় খবর এলো বাড়িতে তার ছেলেটা মরো-মরো। তাড়াতাড়ি চাষা বাড়িতে এসে দেখে ছেলেটা তার আগেই মারা গেছে। পরিবার খুবই কাঁদছে। কিন্তু চাষার চোখে জল নেই। বউ পাড়ার সব লোকের কাছে আরো দুঃখ করতে লাগলো। বললে, তোমরা সবাই দেখছো তো এই ছেলে মারা গেল, কিন্তু ও-মানুষটার চোখে একটু জলও নেই, এমন নিষ্ঠুর—

চাষা হাসতে হাসতে বউকে বললে, আমি কেন কাঁদছি না জানো? আমি কাল স্বপ্ন দেখেছিলুম যে আমি রাজা হয়েছি আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপ্নে দেখলুম ছেলেগুলো রূপে গুণে কী সুন্দর। ক্রমে তারা বড় হলো, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে—এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখন ভাবছি তোমার ওই এক ছেলের জন্যে কাঁদবো, না আমার সাত ছেলের জন্যে কাঁদবো—

কেষ্ট হালদারকে মিনিস্ট্রি না দিলে সে দল ছাড়বে, আবার রথীন সিকদারকে মিনিস্টার না করলে সেও দল ছেড়ে চলে যাবে। তাহলে আর কাঁদবো কেন। কার জন্যে কাঁদবো! কাঁদলে এক পার্টির জন্যেই কাঁদতে হয়। কিন্তু পার্টিও তো যায়-যায়। পার্টির মধ্যেই যখন ঘুণ ধরেছে, তখন কেঁদে কী লাভ!

বিকেল চারটেয় কৃষিজীবী সম্মেলন। সেই সম্মেলনের সময়েই খুঁজতে হবে হুটুকে। হুটুও নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে গেছে, আমিও বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কিন্তু মনে পড়িয়ে দিলে তার সব মনে পড়বে নিশ্চয়।

কলিমুদ্দিন মিয়াকে বড় সহিষ্ণু মানুষ বলতে হবে। হাতে সেই রক্তাক্ত

ছোরা। এক কোপ বসিয়ে দিলেই হলো।

—তুমি শালা আমার বৈকুণ্ঠকে জবাই করার মতলব করেছ? তার চেয়ে আমায় কেটে ফেলতে পারো না?

রাগলে ন্টুকে বড় করুণ দেখাতো। যত রাগতো ন্টু তত খোঁড়াতো। আমি ভয় পেয়ে যখন ন্টুকে ধরে ফেললাম, ন্টু ঝট্ করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলে। বললে—ছাড়্ তুই আমাকে, আমি আজকে ওকে দেখে নেব—

আর একজন লোক মাংস কিনতে এসেছিল, সেও বললে—এই ছোঁড়া, গালাগালি দিচ্ছিস কেন?

—বেশ করবো গালাগালি দেব, আমার বৈকুণ্ঠকে কেন ও কাটবে?

—বৈকুণ্ঠ? বৈকুণ্ঠ আবার কে।

ন্টু বৈকুণ্ঠকে দেখিয়ে বললে—ওই তো আমার বৈকুণ্ঠ—

লোকটা ভেড়াটার দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। বললে—ওই ভেড়াটা?

ন্টু বললে—ভেড়া বললে চলবে না, তোমাদের চেয়ে ওর বুদ্ধি বেশি, তা জানো?

কলিমুদ্দিন বললে—এখানে হল্লা করিসনি, ভাগ্ এখান থেকে—ভাগ্, যা—

লোকটাও বললে—কী, হয়েছে কী?

ন্টু বললে—আমার বাবাকে গিয়ে বলে এসেছে বৈকুণ্ঠকে বেচে দিলে চল্লিশটা টাকা দেবে—

এতক্ষণে লোকটা বৈকুণ্ঠর দিকে চেয়ে দেখলে। যেন পরীক্ষা করে দেখলে চল্লিশ টাকা দিলে লাভ হয়, না লোকসান হয়। তারপর অনেকক্ষণ ধরে দেখে যাচাই করে বললে—তা চল্লিশ টাকা তো বেশিই বলেছে—

ন্টু রেগে গেল। হঠাৎ বৈকুণ্ঠর গলাটা ধরে বললে—এর দিকে নজর দিও না বলছি, তোমাদের চোখ কানা করে দেব—

অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছিল কলিমুদ্দীন। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—ভাগ্ এখান থেকে, ভাগ্ বলছি—

—মারবি নাকি তুই শালা? মারবি? মার্ তো দেখি তোর গায়ে কত জোর!

বলে সামনে এগিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। একেবারে কলিমুদ্দিনের ছোরার নাগালের মধ্যে।

আমার ভয় করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি হুটুকে গিয়ে ধরলাম। বললাম—কী করছিস হুটু, চলে আয়—

হুটু খোঁড়া হলে কী হবে, হুটু খেতে না পেলে কী হবে, তেজ তার কম নয়। আমার হাতটা ছাড়িয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আরো এগিয়ে গেল। বললে—দোকান থেকে বেরিয়ে আয় শালা তুই, দেখি তোর কত মুরোদ।

ভদ্রলোক এবারে ভয় পেয়ে গেল। বললে—এ খোঁড়ার তো দেখছি তেজ কম নয়! কোথায় বাড়ি রে তোর? কোন পাড়ায় থাকিস?

বলে আমার দিকে চাইলে। বললে—তুমি এর কে খোকা? তোমার বাড়ি কোথায়? কশাইদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করতে এসেছে, এরা তো ছোরা বসিয়ে দেবে—

আমি বললাম—দেখুন, দোষ এর নয়, ওদেরই দোষ। এর ভেড়াটাকে এ নিজের ছেলের মত ভালবাসে, ওকে ও বেচে দিতে পারে না। লক্ষ টাকা দিলেও বেচবে না। সেই ভেড়াকে কেনবার কথা বললে রাগ হবে না? এ ওর বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে কিন্তু বৈকুণ্ঠকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। দেখছেন না সব সময়ে ওর সঙ্গে রয়েছে। নিজে না খেয়ে ওকে খাওয়ায়।

কলিমুদ্দিন কথার মাঝখানে বলে উঠলো—আমি কেন ওর ভেড়াকে কিনতে চাইবো, ওর বাপই তো আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে—

—আমার বাপ তোকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?

এতক্ষণে যেন হুটুর খেয়াল হলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—চল্, বাড়ি যাই, শালা বাপকে আমি দেখে নিচ্ছি, অমন বাপের গুষ্টির ছেরাদ্দ করে তবে ছাড়বো—

তার সমস্ত রাগটা যেন তখন গিয়ে পড়ল নিজের বাবার ওপর। গজগজ করতে করতে হুটু আবার বাড়ির দিকে ফিরলো। আমিও চললাম পেছন পেছন। আর আমাদের পেছন পেছন বৈকুণ্ঠও ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে চললো।

এ যেন নাগরদোলা। এখন তুমি ওপর দিকে বসে আছো আর আমি বসে আছি নিচেয়। কিন্তু নাগরদোলা যখন ঘুরতে শুরু করবে তখন আমি আবার ওপরে উঠে যাবো, তুমি নেমে যাবে নিচেয়।

এই-ই জীবন। কিন্তু মানুষের সমাজে এমন এক-একটা যুগ এসেছে যখন এই নাগরদোলাকে কেউ ঘোরায়নি। নাগরদোলাকে বছরের পর বছর স্থির নিশ্চল করে রেখেছে রাজারা। রাজারা বলেছে, আমরা ভগবানের প্রতিনিধি, আমাদের আর পতন নেই—

আর সেই পতন যাতে না হয় তার জন্যে তারা গীর্জা, মন্দির, পুরুত-পাদ্‌রি-মোল্লাদের সাহায্য নিয়েছে। তারা রাজার জন্মদিনে গীর্জায় মন্দিরে মসজিদে উৎসব করেছে। রাজার অন্যায় অত্যাচারকে উৎসাহ দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে। দিল্লীশ্বর-জগদীশ্বরোবা বলে আল্লাতালাহ্‌র সমান পর্যায়ে তাকে তুলে ধরেছে।

এই রকমই চলছিল। কেউ অভিযোগ করলেও তা কারো কানে গিয়ে পৌছোত না, অত্যাচারের জ্বালায় অস্থির হলেও কারো আর্তনাদ করবার অধিকার ছিল না।

ঠিক সেই সময়ে টাকা আবিষ্কার হলো। টাকা! পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের পর আর এক অষ্টম আবিষ্কার।

এড্‌ওয়ার্ড থার্ড যেন হানড্রেড ইয়ার্স ওয়ার চালাতে পেরেছিল সে কিসের জোরে? টাকার। সে টাকা যোগান দিয়েছিল ব্যাঙ্কাররা। ব্যাঙ্কাররা বললে—যত টাকা আপনার লাগে আপনি নিন হুঁজুর, অল্প সুদে আপনাকে আমরা টাকা ধার দেব—

এসব কথা হরিসাধনবাবু শিখিয়ে ছিলেন। তখন ইকনমিক্স পড়াতেন তিনি। পড়াতে পড়াতে তিনি যেন আর এক জগতে চলে যেতেন। কেমন করে মধ্যযুগে টাকার আবিষ্কার হলো, ক্যাপিট্যাল কেমন করে ইনডাস্ট্রিকে গ্রাস করলো আর সেই ক্যাপিট্যালই আবার কেমন করে রাজাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল তারই ইতিহাস।

পড়তে পড়তে জ্যোতির্ময় সেনের মনে পড়তো ময়নাডাঙার কথা।

ময়নাভাঙার কথা আর নুটুর কথা। ময়নাভাঙার বাবুদের বাড়িটার সামনে দিয়ে তখন নুটু ছুটতে ছুটতে চলেছে আর পেছনে পেছনে চলেছে বৈকুণ্ঠ।

আমি পাশ থেকে ডাকলুম—নুটু—

নুটু তখনও রাগে গরগর করছে। বললে—কী বল্!

বললাম—তুই যে কলিমুদ্দিনের সঙ্গে ঝগড়া করলি, ও যদি তোকে ছুরি মারতো?

নুটু বললে—মারতো তো মারতো, আমি মরে যেতুম—

আমি বললাম—কিন্তু তোর খুব কষ্ট হতো তো, তোর গা দিয়ে খুব রক্ত বেরোত, খুব যন্ত্রণা হতো—

নুটু বললে—মরে গেলে আর কষ্ট কিসের রে? মরে গেলেই তো সব ফক্কা।

বললাম - কিন্তু তোর বাবার তো খুব কষ্ট হতো?

নুটু বললে—বাবার কলাটা! বাবা আমাকে কাঁধে করে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে পুড়িয়ে আসতো। আর আচ্ছা করে পেট ভরে মদ খেতো—

—কিন্তু তোর মা?

নুটু বললে—দূর, সংসারে কেউ কারো নয় ভাই। সংসারে আমি সবাইকে চিনে নিয়েছি। এই যে তুই বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিস, তোর সঙ্গে তো আমার খুব ভাব, আমি মরে গেলে তুই-ই কি কাঁদবি? তুইও কাঁদবি না। মানুষের জন্যে কোনও শালা মানুষ কাঁদে না। কাঁদে মানুষের পয়সার জন্যে।

বললাম—না ভাই, আমি ঠিক কাঁদবো। সেই জন্যেই তো আমি কলিমুদ্দিনের সঙ্গে ঝগড়া করতে তোকে বারণ করলুম।

নুটু যেন সেই ছোট বয়েসেই দার্শনিক হয়ে গিয়েছিল। বললে—দূর, একমাত্র জানোয়ারই মানুষের জন্যে কাঁদে। ওই বৈকুণ্ঠ—আমি মরে গেলে ওই বৈকুণ্ঠই শুধু আমার জন্যে কাঁদবে। ওই বৈকুণ্ঠ ছাড়া আর কোনও শালা আমার জন্যে কাঁদবে না—

—আর, আমি যদি মরে যাই তুই কাঁদবি না?

নুটু সোজা উত্তর দিলে। বললে—ভাই, মিথ্যে কথা বলে লাভ কী? আমি কাঁদবো না। আর তাছাড়া তুই আমার এমন কে-ই বা যে তোর জন্যে কাঁদতে যাবো? তুই তো বড়লোকের ছেলে, খেয়াল হয়েছে এখানে

পালিয়ে এসেছিস। আবার যেদিন খেয়াল হবে বাড়ি ফিরে যাবি, তখন আমাদের কি আর তুই মনে রাখবি? কিন্তু ওই বৈকুণ্ঠকে তুই ভুলিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যা দিকিনি, দেখি তোর কত গায়ের জোর আছে?

সত্যিই, বৈকুণ্ঠ পাশে না শুলে হুটুর ঘুমই আসতো না। বৈকুণ্ঠর গায়ের গন্ধটা না শুঁকতে পেলে যেন হুটুর অস্বস্তি হতো। অনেকদিন রাত্রে হুটুদের বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখেছি বৈকুণ্ঠকে পাশবালিশ করে হুটু বেশ আরাম করে নাক ডাকাচ্ছে।

আর শুধু কি তাই। বৈকুণ্ঠও যেন হুটুর কথা বুঝতে পারতো।

ভালবাসার বোধ হয় একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা চেপে যায় না। বৈকুণ্ঠ বুঝতো হুটু তাকে ভালবাসে। সামান্য একটা ভেড়ার বাচ্চা। হুটুর যে একটা পা খোঁড়া তা যেন সে জানতো। হুটুর পা'টার দিকে চেয়ে দেখতো। যেন হুটুর খোঁড়া পা'টার জন্যে তার মনে মনে মায়া হতো। দেখেছি যখন কেউ কোথাও নেই তখন বৈকুণ্ঠ চুপি চুপি হুটুর খোঁড়া পা'টা জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছে।

হুটু বলতো—দেখছিস?

বলতাম বৈকুণ্ঠ বোধ হয় আর জন্মে মানুষ ছিল রে—

হুটু বলতো—দূর, আমার ভাই ছিল—

সত্যিই হুটুর ভাই ছিল না। বৈকুণ্ঠই ছিল বলতে গেলে হুটুর সহোদর ভাই। নিজের ভাই থাকলেও তাকে কেউ এমন করে ভালবাসে না—

হুটু বলতো—এতই যদি তোমাদের টাকার অভাব তাহলে চল্লিশ টাকা দিয়ে ওকে না বেচে আমাকে বেচে দাও না—আমাকেই পাঁঠার মাংস বলে চালিয়ে দাও—

রাস্তায় চলতে চলতে সারাক্ষণ কেবল গজগজ করতে লাগলো হুটু। রাগে কেবল গজরাচ্ছে।

আর আমি আর বৈকুণ্ঠ দুজনেই চলেছি পাশে পাশে।

হঠাৎ হুটু থমকে দাঁড়িয়েছে।

চিৎকার করে উঠেছে—সাপ—সাপ—

একটা বিরাট গোখরো সাপ। সাপটা রাস্তা পার হচ্ছিল। সাপটাকে দেখেই হুটু ঝাঁপিয়ে পড়েছে বৈকুণ্ঠর ওপর। বৈকুণ্ঠ কিছুই দেখতে পায়নি।

—ওরে সাপ, সাপ—

নুটুকে সাপে কাটুক তাতে যেন কিছু আসে যায় না, বৈকুণ্ঠকে কাটলেই যেন যত বিপদ! সাপটা বৈকুণ্ঠর দিকে তেড়ে এসে একটা ফণা তুললো। ফণার দু'ধারে খড়ম আঁকা।

আর ফণাটা তোলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে একটা ছোবল মেরেছে।

কিন্তু তার আগেই নুটু বৈকুণ্ঠকে ধরে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। ফণাটা যখন ছোবল মারলো তখন আর সেখানে বৈকুণ্ঠ নেই, ছোবলটা গিয়ে পড়লো মাটির ওপর। তারপর সাপটা বোধ হয় তার ভুল বুঝতে পেরে যখন মুখ তুললো তখন নুটু প্রকাণ্ড একটা কচার ডাল মেরেছে সাপটাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু গোখরো সাপ তো। ছোবল মারতেও যেমন, পালিয়ে যেতেও তেমনি। সাপ যত দৌড়োয় নুটুও পেছন-পেছন তত দৌড়োয়। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই ছুঁড়ে মারে। মাঠ ছাড়িয়ে জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লো নুটু।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ তো দেখছি মহা মুশকিল হলো নুটুকে নিয়ে।

পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম—নুটু, এই নুটু—

নুটুর কোনও উত্তর নেই। বৈকুণ্ঠকে নিয়েই বেশি মুশকিলে পড়লাম। বৈকুণ্ঠও নুটুর পেছন পেছন জঙ্গলে যেতে চায়। আমি বৈকুণ্ঠর গলাটা জাপটে ধরে প্রাণপণে তাকে আটকে রাখলাম আর চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম —নুটু, ও নুটু –

ময়নাডাঙার গ্রামটা এমনি মাঠে ময়দানে ভর্তি। খোলা জায়গাই বেশি। কিন্তু বাংলা দেশের পোড়ো গ্রাম, তাই পুরনো কিছু বাড়ি খালি পড়ে আছে। সেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একবার ঢুকলে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা শক্ত।

বৈকুণ্ঠও বোধ হয় ভয় পেয়েছিল বেশ। সেও ব্যা-ব্যা করে ডাকতে লাগলো নুটুকে। একটা ভেড়ার গায়ে যে অত জোর তা আমি জানবো কী করে! শেষকালে ভেড়াটাও কি সাপের কবলে পড়বে!

সেখান থেকেই শুনতে পেলাম ঝোপঝাড়ের মধ্যে যেন একটা ঝটাপট শব্দ হচ্ছে।

আমি আবার চিৎকার করে ডাকলাম—নুটু—নুটু—

আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠও ডাকতে লাগলো—ব্যা—ব্যা

দূর থেকে নুটুর গলার আওয়াজ পেলাম। নুটু চিৎকার করে ডাকছে—জ্যোতি—ই—ই—

আমি সাড়া দিলাম—এই যে, আমি এখানে রে—

ফুটু সেখান থেকেই জবাব দিলে—বৈকুণ্ঠকে ধরে রাখিস, আমি সাপটাকে মেরেছি রে—

ফুটু সাপটাকে মেরেছে! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। খোঁড়া পা নিয়ে ফুটু সাপটাকে মারলে কী করে।

আমি বৈকুণ্ঠকে নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফুটু এল। হাতে একটা গাছের মস্ত ডাল। সেই ডালের ডগায় মরা গোখরো সাপটা ঝুলছে।

ফুটু কাছে এসে বললে—শালা, মেরেছি রে সাপটাকে। শালা আমার বৈকুণ্ঠকে ছোবল মারতে এসেছিল। এত বড় আস্পর্ধা—

আমি তখনও থরথর করে কাঁপছি।

বললাম—কেন তুই সাপটার পেছনে ছুটলি? যদি তোকে কামড়ে দিত?

ফুটু বললে—তা আমার দোষ, না সাপটার দোষ? আমি তো ওর তাড়া খেয়ে গাছে উঠে পড়েছিলুম। গাছ থেকে ডাল ভেঙে নিয়ে আমি তো ওকে মারতুম না, কিন্তু ও কেন আমার বৈকুণ্ঠকে কামড়াতে এল?

বললাম—কিন্তু সাপের সঙ্গে কি চালাকি চলে? সাপটা যদি তোকে তাড়া করতো! তুই তো ওর সঙ্গে দৌড়ে পারতিস না।

ফুটু বললে—আমাকে তো তাড়া করেছিল বেটা। আমি তাই তো ওকে মারলুম।

ফুটুর কাণ্ড শুনে আমিও অবাক, বৈকুণ্ঠ যে বৈকুণ্ঠ, সেও বোধ হয় অবাক। সে তখন সাপটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ফুটু বললে—চল্, এবার বেটাকে পোড়াতে হবে, পুড়িয়ে বেটাকে ছাই করে দেব একেবারে—

বলে মাথার ওপর সাপটাকে দোলাতে দোলাতে সামনে চলতে লাগলো। তার সঙ্গে আমিও চলতে লাগলাম। আর দুজনের মাঝখানে বৈকুণ্ঠ।

আমি বললাম—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কী লাভ রে? ও তো মরেই গেছে—

ফুটুর রাগও বড় অস্বাভাবিক রাগ।

বললে—সাপের আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই, জানিস না? পুড়িয়ে ছাই না করে ফেললে ও বেটা আবার বেঁচে উঠবে। বেঁচে উঠে বৈকুণ্ঠকে কামড়াবে।

বলে সাপটাকে মাথার ওপরে আরো জোরে জোরে ঘোরাতে লাগলো।

হঠাৎ শঙ্কর ঘরে ঢুকেছে। সঙ্গে ভাতের থালা নিয়ে ঢুকেছে ঠাকুর।

শঙ্কর বললে—এখনই খেয়ে নিন জ্যোতিদা, ঘিটা গরম করে এনেছি, দেখবেন একেবারে খাঁটি ঘি—

সত্যিই শঙ্কর একদিন জীবনে উন্নতি করবে বটে। কেমন করে খোশামোদ করতে হয় তা শঙ্কর বেশ ভাল করে শিখে নিয়েছে।

জ্যোতির্ময় সেন জিজ্ঞেস করলেন—আমি ঘি খেতে ভালবাসি তা তুমি জানলে কী করে শঙ্কর?

শঙ্কর প্রশ্নটা শুনে খুশী হলো। বললে—জ্যোতিদা, কী যে আপনি বলেন, আপনি আজকে এখানে খাবেন আর কী কী খেতে আপনি ভালবাসেন তার খবর আমি রাখবো না?

সত্যিই ছেলেটা উন্নতি করবে।

জ্যোতির্ময় সেন জিজ্ঞেস করলেন—এখানে ঘিয়ের দাম কী রকম শঙ্কর?

—ঘি? ঘি তো ময়নাডাঙায় পাওয়া যায় না। এ ঘি তো আমি কলকাতা থেকে এনেছি!

জ্যোতির্ময় সেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কলকাতা থেকে?

শঙ্কর বললে—হ্যাঁ জ্যোতিদা, সব কলকাতা থেকে এনেছি। এই যে ফুলকপি, এ ফুলকপিও এখানে পাওয়া যায় না। গ্রাম একেবারে উচ্ছন্নে গেছে জ্যোতিদা। সেইজন্যেই তো আমাদের কংগ্রেসের বড় মুশকিল হয়েছে। কলকাতায় রেশনের চালের দাম এক টাকা চল্লিশ আর গাঁয়ে দু টাকা বারো। এতেই এখানকার লোক সবাই কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই আর তাদের ঠেকানো যাচ্ছে না—

—ওরা গেছে?

শঙ্কর বললে—না, এখনও রয়েছে। নমিনেশান চাইছে ইলেকশানের।

—আচ্ছা শঙ্কর...

জ্যোতির্ময় সেন খেতে খেতেই বললেন—বাইরে পুলিস এখনও পাহারা দিচ্ছে, না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, পুলিস সুপারের অর্ডার, পাহারা দেবে না মানে?

—কিন্তু তা সত্ত্বেও এত লোক আমার কাছে আসছে কী করে? এদের

কেন ঢুকতে দিচ্ছে ? দেখ, বিকেল চারটেয় কনফারেন্স আরম্ভ হচ্ছে, আর আমি সকাল-সকাল এখানে এসে হাজির হয়েছি একটু বিশ্রাম করবার জন্যে, কিন্তু আমার বিশ্রামের কোনও ব্যবস্থা তো তোমরা করোনি।

শঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—কই, কাউকে তো ঢুকতে দিইনি আমি, কেউ এসেছিল নাকি ?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আমি এই চিংড়ি মাছ কিছুতেই খাবো না শঙ্কর, এ তুমি নিয়ে যাও।

—কেন জ্যোতিদা, কী হলো ? মাছে কি গন্ধ বেরোচ্ছে নাকি ?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—এ রথীন সিকদারের মাছ। রথীন সিকদার মুড়াগাছা মণ্ডল-কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিল, তার ছ'মাস জেলও হয়েছিল। এই মাছ দেওয়ার পেছনে তার মতলব রয়েছে, এ আমি খেতে পারি না শঙ্কর—খেলে তাকে ইলেকশানে নমিনেশান দিতেই হবে—। তুমি এ মাছ ফিরিয়ে দিও ওকে—

শঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না।

বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে বলেছি জ্যোতিদা, ইনি লোক ভালো—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কিন্তু কার্য উদ্ধারের জন্যে যে-লোক ঘুঁষ দেয় সে কখনও ভালো লোক হতে পারে না শঙ্কর। এরা সুবিধেবাদী। এদের জন্যেই আজ আমাদের পার্টির এত বদনাম।

শঙ্কর বললে—আমি সিকদার মশাইকেও তাই বলেছিলুম জ্যোতিদা, কিন্তু উনি বলছিলেন যদি নমিনেশান না পান তো দিল্লী গিয়ে সেণ্টার থেকে নমিনেশান আদায় করে নিয়ে আসবেন। এখানে শুধু আপনি একলা অনেস্ট লোক, কিন্তু দিল্লীতে তো সবাই অনেস্ট। এক ঝুড়ি গলদা চিংড়ি দিয়ে এখানে কাজ হাঁসিল হলো না, কিন্তু দিল্লীতে গেলে এক লাখ টাকা খরচ করলেই তো নমিনেশান আদায় হয়ে যাবে। ওঁর তো টাকার অভাব নেই—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আচ্ছা, কেষ্ট হালদার মশাইকে একবার ডাকতে পারো তুমি এখানে ?

শঙ্কর বললে—এখনই ডাকতে পারি—এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেকে আনছি—

—তুমি কেষ্ট হালদার মশাইকে চেনো ?

শঙ্কর বললে—খুব চিনি, আমাদের এখানে যখন ফ্লুড-রায়ট হয়েছিল তিনি তখন দু লাখ টাকা চ্যারিটি করেছিলেন—

—দু লাখ।

শঙ্কর বললে—হ্যাঁ, দু লাখ। কেষ্ট হালদার মশাইয়ের মদের পয়সা। ইচ্ছে করলে আরো টাকা দিতেন। কিন্তু···

—কিন্তু কী?

শঙ্কর বললে—কিন্তু ওই যে, মদের কারবার করেন বলে লোকে তাঁকে শুঁড়ি বলে। ওটা বড় গায়ে লাগে তাঁর। তাই এবারে তিনি ইলেকশানে দাঁড়িয়ে একটু প্রেষ্টিজ কিনতে চান। আর তা ছাড়া, তিনি পার্টিকে কত লাখ লাখ টাকা দিয়েছেন তা তো আপনি জানেনই জ্যোতিদা—

জ্যোতির্ময় সেন জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রী হলেই বুঝি প্রেষ্টিজ আসে?

—নিশ্চয়ই, মন্ত্রী হলেই তো ভি. আই. পি. হয়ে গেল।

—কিন্তু যখন মন্ত্রীত্ব চলে যায়?

শঙ্কর বললে—চলে যাবে কেন জ্যোতিদা? টাকা থাকলে যে-কোনও পার্টি থেকেই মন্ত্রী হওয়া যায়। টাকা থাকলে পার্টিকেও কেনা যায়। টাকা ছাড়া তো কোনও পার্টিই চলবে না। এসব কথা তো আপনিই আমার চেয়ে ভাল জানেন জ্যোতিদা।

জ্যোতির্ময় বললেন—তা জানি, কিন্তু এ-সব কথা তোমার মুখ দিয়ে শুনতে আমার ভাল লাগছে। তুমি এ-সব কথা জানলে কী করে?

শঙ্কর বললে—আমি? শুধু আমি বলছেন কেন জ্যোতিদা, এই ময়নাডাঙার প্রত্যেকটা চাষী মজুর এ-সব কথা জানে। জানে, কিন্তু তবু তারা নিরুপায়। ইলেকশানের আগে তারা এত টাকা পায় যে তখন সবাই বোবা হয়ে যায়। এই দেখুন না, এই যে আজ কৃষিজীবী সম্মেলন হচ্ছে, এতে এখানকার অন্তত: জনপঞ্চাশ লোক কুড়ি হাজার টাকা করে পেয়েছে—

—কী করে?

শঙ্কর বললে—একজন টিউবওয়েলের কনট্র্যাক্ট পেয়েছে, একজন বাঁশ সাপ্লাইয়ের অর্ডার পেয়েছে, একজন পেয়েছে টিনের অর্ডার, একজন···

রতন হঠাৎ ঘরে এল। বললে—আর একটা রাজভোগ নিন—

রাজভোগের কথা শুনেই আমার হুটুর কথা মনে পড়লো। রাজভোগ! শট্ ভাত খেতেই পেত না, তবু ময়নাডাঙার বাজারে খাবারের দোকানের

দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতো।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী দেখছিস ?

হুটু বলেছিল—ওই দেখ, ওই বড় বড় রসগোল্লা দেখছিস, ওর নাম রাজভোগ, বাবুরা খায়।

দোকানদার হুটুকে দেখলেই তেড়ে আসতো—পালা পালা, এখান থেকে পালা, নজর দিস নে—

আশ্চর্য! সারা জীবনটা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেও বোধ হয় পৃথিবীটাকে বোঝা যাবে না। অথচ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ নিজের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্যে লড়াই করে আসছে, আবার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষই সেই লড়াই বানচাল করবার চেষ্টা করে চলেছে। যে রাজভোগ একজনের পক্ষে দেখাও পাপ, আর একজনকে সেই রাজভোগ খাবার জন্যে আবার খোশামোদ! তবে কি এরই নাম ক্ষমতা ? এই ক্ষমতাটুকু পাওয়ার জন্যেই কি আমি কুড়ি বছর জেল খেটেছি, এই ক্ষমতাটুকু লাভ করার জন্যেই কি আমি চিফ মিনিস্টার হয়েছি ? আর এই ক্ষমতার জন্যেই কি রথীন সিকদার আর কেষ্ট হালদারের মধ্যে আজ রেষারেষি চলেছে ?

শঙ্করের কথাটা হঠাৎ কানে এল—আমি কেষ্ট হালদার মশাইকে ডেকে আনি গে জ্যোতিদা, রতন রইল…

আমার নিজেরই কেমন অবাক লাগলো। কই, আমি তো এখানে কেষ্ট হালদারকে দেখতে আসিনি! রথীন সিকদারকেও দেখতে আসিনি। যারা রাইটার্স বিলডিঙে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তারাই তো এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তো আমি এই ময়নাডাঙায় চলে এসেছি। আজ এখানে কৃষিজীবী সম্মেলন। একজন কৃষিজীবীও তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এল না। তারা যাতে এখানে না আসতে পারে তার জন্যে বাইরের গেটে পুলিস পাহারা বসিয়ে রেখেছি। তারা আমার কাছে আসবে কী করে ? আমি তো তাদের ডেকে পাঠাচ্ছি না। এখানে এসে যার কথা বেশি ভাবছি সেই হুটুকেও তো কই ডেকে পাঠাচ্ছি না। এতদিন ধরে এই ভণ্ডামিই হয়ত আমি করে চলেছি, কে জানে!

বললাম—আচ্ছা, তুমি যাও—

খাওয়াটা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। রতন বাথরুমে সাবান-তোয়ালে

নিয়ে হাজির ছিল। প্লাস্টিকের মগে করে জল নিয়ে হাতে ঢেলে দিলে। হাত-মুখ ধুয়ে জ্যোতির্ময় সেন আবার এসে নিজের জায়গাটায় বসলেন। বেশ গদিওয়ালা একটা ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করেছে এরা, এই শঙ্কররা। জেলা-কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মণ্ডল-কংগ্রেসের শঙ্কর পর্যন্ত সকলের সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। খাওয়ার ব্যবস্থাটাও করেছিল এরা। ভালো ঘি কিনে এনেছে, ভালো চাল কিনে এনেছে, ভালো ডাল, ভালো গলদা-চিংড়ি, ভালো রাজভোগ। এত ভালো খাওয়া বাইরের লোকের সামনে বসে খাওয়া যেত না। চিফ মিনিস্টার এত ভালো খাওয়া প্রকাশ্যে খেতে পারে না। খেলেই পরের দিন অপোজিশান-পার্টির খবরের কাগজগুলোতে বার করে দেবে। আমি রেশনে ওদের মোটা চাল খেতে দিই, আধপেটা খেতে দিই, অথচ আমি নিজেই এত ভালো খাবার খাই এটা বাইরের লোক জানতে পারলে পার্টির পক্ষেও ক্ষতিকর, আমার নিজের ইলেকশানের প্রচারের পক্ষেও ক্ষতিকর।

আর মুটুর বাড়ির খাওয়া?

আজ ভাবতে ভালো লাগছে একদিন আমি সেই খাওয়াই নিজে গোগ্রাসে খেয়েছি। সেই খাওয়া আর এই খাওয়া!

মুটুর মা বলতো—কই, তুমি তো কিছু খাচ্ছো না বাবা? তোমার শরীর খারাপ নাকি?

আমি বললাম—না—

মুটু বললে—আজ সারাদিন রোদে-তাতে পুড়েছে ও। জানো মা, আমার সঙ্গে ইঁট বয়েছে?

—ও মা, বলিস কি তুই? ওকে দিয়ে ইঁট বওয়ালি?

মুটু বললে—আমি বারণ করেছিলুম, কিন্তু ও যে শুনলে না—কি রে, তোকে আমি বারণ করিনি? গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা হয়েছে তো?

বললাম—না, ব্যথা হয়নি।

মুখে তো বললাম ব্যথা হয়নি, কিন্তু সত্যিই ব্যথা হয়েছিল। ততক্ষণে শুধু গা নয়, মাথাটাও টনটন করছিল। মনে হচ্ছিল যেন বমি আসবে। ময়নাডাঙার মাঠে রোদের হলকা লেগে সারাদিন মাথা পুড়েছে। তার ওপর ইঁট বওয়া। কেন যে ইঁট বইতে গেলাম কে জানে। হয়ত মনে হয়েছিল আমিও সব রকম অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি।

যে-আমি কলকাতা শহরের সেরা লোকের ছেলে, সেই আমিই আবার ময়নাডাঙার দরিদ্রতম ছেলে ফুটুর বন্ধু। এই দুই সত্তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়েও আবার সম্পূর্ণ এক। এর রহস্য মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব কিনা কে জানে! কিন্তু সংসারে যে এমন কতবার ঘটেছে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। ইক্ষ্বাকু রাজবংশের একমাত্র সন্তান হয়ে কারো যে পথের ভিখিরী হবার সাধ হতে পারে এ তথ্য ইতিহাসে না পড়লে হয়ত কেউ বিশ্বাসই করতো না। দেখা গেছে গরীবরা বহু জাতের, বড়লোকদের শুধু একটাই জাত। পৃথিবীতে ছোট থেকে বড় হওয়ার কাহিনী যত আছে তার চেয়ে বড়র ছোট হওয়ার কাহিনী সংখ্যায় বেশি। নামতে কষ্ট নেই, ওঠাই দুরূহ। লোকে নামার কাহিনী শুনতে চায় না, বলে—'ছোট থেকে বড় হওয়ার কাহিনী বলো।' লেখা-ইতিহাসে সেই ঘটনারই প্রাধান্য বেশি, কারণ সবাই বড় হতে চায়। রাজা মনু যে কেন সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন তার ইতিহাস আমরা জানি না, বুঝি না, কারণ জানতে চাই না। লালাবাবুর গৃহত্যাগ বা সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ নিয়ে যে কাব্য-কাহিনী লেখা হয়েছে তার কারণ তাঁরা দুজনেই রাজা বা রাজতুল্য জমিদার-তনয়। কিন্তু কত অসংখ্য মধ্যবিত্ত বংশের তনয় যে নিঃস্ব হওয়ার আনন্দে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে তাদের কথা তো কেউ আলোচনা করে না। বিরাটকে নিয়েই আমাদের কারবার। বিরাটের কল্পনা করে আমরা রোমাঞ্চ পাই বলে বিরাটের কথাই আমরা এত বলি। ত্যাগই হোক আর ভোগই হোক, যতক্ষণ সে বিরাট ততক্ষণ সে আমাদের আলোচ্য বস্তু। এক পয়সা দানের কথার কোথাও হিসেব থাকে না, এক লক্ষ টাকা দানের কথায় সংবাদপত্র বড় মুখর। মোটর-বিহারীরা রাস্তায় যেতে যত পয়সা ভিখিরীকে দান করে, পদব্রজীরা তার চেয়ে দান করে অনেক বেশি। বড়র বড় দান হলো চ্যারিটি আর ছোটর ছোট দান হলো পরোপকার। চ্যারিটি যাঁরা করেন তাঁরা খবরের কাগজে নাম ছাপা হবে বলে তা করেন, পরোপকার হলো নিঃস্বার্থ কৃত্য। পরোপকার কর্তা আর পরোপকার গ্রহীতা, দুজনেই নৈঃশব্দের ভক্ত। বিদ্যাসাগর ছিলেন তেমনি একজন শেষোক্ত শ্রেণীর দলভুক্ত। বিদ্যাসাগর তাই চ্যারিটি করতেন না, করতেন পরোপকার। মনে আছে ছোটবেলায় পড়েছিলাম—'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে—'

এটা সত্যকথন নয়, উপদেশ। যে-হুকুম না মানলে কারো লোকসান

নেই, তারই নাম উপদেশ। যে ছোট তার কাজ উপদেশ পালন করা আর যে বড় তার স্বভাব উপদেশ দেওয়া। বড় হলে কাজ করতে হবে না বলেই বড় হওয়ার লোভ সকলের বেশি। জ্যোতির্ময় সেন বড়ই ছিলেন বরাবর, এখন আরো বড় হয়েছেন, কিন্তু বড় হয়েছেন বলে উপদেশ দেওয়া বেড়েছে বটে কিন্তু ঝামেলা কমেনি।

হঠাৎ হুটু চিৎকার করে উঠেছে—এই, তোর জ্বর হয়েছে রে—

রাত্তির বেলা ঘুমের ঘোরে বোধ হয় আমার গায়ে তার হাত লেগে গিয়েছিল। আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছিল মাথাটা টিপটিপ করছে। অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছিলাম আমি।

বললাম—বড্ড জলতেষ্টা পাচ্ছে ভাই—

হুটু বললে—দাঁড়া, আমি জল এনে দিচ্ছি—

বৈকুণ্ঠও আমাদের সঙ্গে পাশাপাশি শুতো। একই বিছানায় তিনজন পাশাপাশি। হুটুকে উঠতে দেখে বৈকুণ্ঠও উঠলো। জলের কলসিটা থাকতো বাইরের দাওয়ার ওপর। বৈকুণ্ঠ হুটুর সঙ্গে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে—গেলাসটা কই রে বৈকুণ্ঠ ?

যেন গেলাসটা খুঁজে এনে দেবে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ বাসনপত্রের দিকে চেয়ে দেখলে।

—তোকে দিয়ে কোন কাজটা হবার উপায় নেই—বলে হুটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজেই গেলাসটা আনলে।

বললে—নে, খা—

জল খাইয়ে গেলাসটা রেখে দিয়ে বললে—বৈকুণ্ঠটা কোনও কাজের নয়, কোনও কাজ করতে পারবে না, কেবল পেছন পেছন ঘুরবে—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—তোকে বললুম রোদে রোদে তুই ঘুরিস নে, আমার কথা তো শুনলি নে, এখন ঠেলা বোঝ—

বৈকুণ্ঠটা আমার কাছে মুখ এনে কী শুঁকছিল। হুটু তাকে ঠ্যালা দিয়ে বললে - বেরো, মাথা শুঁকছিস কেন ? তুই ডাক্তার নাকি যে জ্বর দেখবি ? তুই তো কোন কম্মের নোস, কেবল খাবার কুমীর—

পরের দিন আর আমার জ্ঞান নেই। যে-আমার অসুখ হলে বাড়িসুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতো, যে-আমার চিকিৎসার জন্যে কলকাতার বড় বড় ডাক্তার ছুটে আসতো বাবার একটা টেলিফোন পেয়ে, সেই আমিই

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম ময়নাভাঙার এক অখ্যাত অজ্ঞাত কুঁড়েঘরে। বাড়িতে এখনও হয়ত হরিসাধনবাবু আসেন। খোঁজ-খবর নেন। জ্যোতি কোথায় গেল। পুলিসের লোক কিছু খবর দিয়েছে কি না।

পুলিসেরই কি কম জ্বালা!

হরিসাধন চ্যাটার্জি নিজেই পুলিসের থানায় গিয়ে হয়ত খবর নিয়েছেন। পুলিসের ও. সি.-ও বিব্রত। গরীব লোকের ছেলে হারালে কোনও মাথাব্যথা নেই তাদের। যত মাথাব্যথা বড়লোকদের ছেলেদের নিয়ে।

তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। ও. সি. হয়ত বলবে চারদিকে মেসেজ পাঠিয়েছি স্যার, এখনও কিছু খবর পাইনি।

বাবা ব্যারিস্টার মানুষ। বাবা রেগে গিয়ে বলেছেন—তাহলে আপনারা আছেন কী করতে? হোয়াট ইউ আর দেয়ার ফর? আমি গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে রিং আপ্ করবো...

গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী পর্যন্ত সবাই পৌছোতে পারে না। যারা পারে তাদের সমস্যার হয়ত সুরাহা হয়। যাদের তাতেও সুরাহা হয় না তারা অন্ততঃ এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে যতদূর সাধ্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শেষ চেষ্টা করেছে গভর্মেণ্টের পুলিস আর সরকারী কর্মচারীরা। কিন্তু যারা গরীব তারা মনে করে আমার জন্যে কেউ এতটুকু চেষ্টাও করলে না।

আর বাড়িতে? রঘুর নিশ্চয়ই মাইনে কাটা গেছে। বৈজুটারও তাই। বৈজু দ্বারভাঙা জেলার লোক, বিশ্বস্ত মানুষ। গেটে পাহারা দেয় দিনরাত। সেও ভয় পেয়ে গেছে।

আর শুকদেব? শুকদেবকে নিয়েই টানাটানি করছে পুলিসরা। জেরার পর জেরা করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।

—তুমি যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলে তখন জ্যোতির্ময় সেনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কেন?

—যখন ক্রাউড তোমার গাড়ি আক্রমণ করলো তখন তুমি পালিয়ে গেলে কেন?

—আর কোনও লোক গাড়িতে ছিল কি না তুমি জানো?

—তোমার ওপর যখন ছোট ছেলের ভার ছিল তখন তাকে ছেড়ে কি তোমার পালিয়ে যাওয়া উচিত হয়েছে ?

ময়নাডাঙায় শুয়ে শুয়ে আমি কল্পনা করতে পারতাম, আমাকে নিয়ে কলকাতায় হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। কিন্তু কেউ তো জানতে পারছে না আমি এদিকে এখানে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছি।

এই অজ্ঞাতবাসের বোধ হয় একটা আনন্দ আছে। পাণ্ডবেরা যে অজ্ঞাতবাস করেছিল তার একটা মানে ছিল বইকি। এই অজ্ঞাতবাসেই বোধ হয় মানুষের আত্মানুসন্ধান সহজ হয়। অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণা যত, আনন্দটা তার চেয়ে অনেক বেশি। যখন আমি রাইটার্স-বিল্ডিঙে থাকি তখন চারিদিকের চাটুকারদের স্তুতিতে আমি অন্ধ হয়ে যাই। কিন্তু কই এখানে এই ময়নাডাঙার মেজবাবুর বাড়িতেও তো তারা ছুটে এসেছে। এই ময়নাডাঙা স্টেশনের বিষ্ণু ঘোষ এসেছে রসগোল্লা খাইয়ে সার্টিফিকেট চাইতে। এসেছে রথীন সিকদার গলদা চিংড়ি নিয়ে নমিনেশান চাইতে, আর এসেছে কেষ্ট হালদার···

—কেমন আছিস রে জ্যোতি ?

কোনও উত্তর এলো না। মুটু নিজের হাতটা আমার কপালে ঠেকালো। হাতটা যেন গরমে পুড়ে গেল। চমকে উঠলো মুটু। বৈকুণ্ঠও মুটুর দেখা-দেখি আমার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এল।

এক ধমক দিয়েছে মুটু। বললে—তোকে নিয়ে তো মহা জ্বালাতন হলো দেখছি, সর্ সর্ এখান থেকে, দেখছিস জ্বর হয়েছে জ্যোতির।

বৈকুণ্ঠ কথা বোঝে। মাথাটা নিচু করে একটু সরে দাঁড়ালো।

—আরে সরে যা, ওদিকে সরে যা। যা বলছি—

বৈকুণ্ঠ আরো সরে দাঁড়ালো।

মুটু বললে—তোর গায়ের গন্ধতে মানুষ পালায়, আর ও জ্বোরো মানুষ, ওর তো বমি হয়ে যাবে। খবরদার বলছি জ্বোরো মানুষের কাছে আসবি নে—

বৈকুণ্ঠ অপরাধীর মত মাথা নীচু করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই সে যেন তার অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। বকুনি খেয়ে তার চোখ দুটো তখন ছলছল করে উঠেছে।

মুটু আবার বকে উঠলো—আবার কান্না হচ্ছে! কী এমন অন্যায় কথা

বলেছি শুনি। তোর গায়ে কি খোশবাই সাবানের গন্ধ যে লোকে তোকে কোলে তুলে নাচবে? কেন আমাদের বাড়ি এলি শুনি? বাবুদের বাড়ি যেতে পারলি নে, তারা তোর গায়ে খোশবাই সাবান মাখিয়ে দিত, তোর গায়ে আতর বুলিয়ে দিত! আমি ওসব কোথায় পাবো বল্ দিকিনি? আমরা যে গরীব লোক তা তুই বুঝতে পারিস না?

বৈকুণ্ঠ তখনও চুপ।

হঠাৎ মা'র কানে গেছে কথাটা। মা রান্নার যোগাড় করছিল।

—কী হলো রে হুটু?

হুটু বললে—দেখ না মা, আমি ভাবনার চোটে পাগল হয়ে যাচ্ছি আর এদিকে বৈকুণ্ঠ রুগীর মাথার কাছে গিয়ে কপাল চেটে দিচ্ছে—আমি ওর কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখছি বলে ও-ও জ্বর দেখবে—জানোয়ার আর কাকে বলে—

মা রাঁধতে রাঁধতেই বললে—ওকে তুই বিদেয় কর্ বাড়ি থেকে—

হুটু বললে—আমিও তাই ভাবছি, ওকে বিদেয় করে দেব, ও আর মানুষ হবে না—

বললে বটে কিন্তু বৈকুণ্ঠর দিকে চেয়েও দেখলে। সে যেন মাথা নিচু করে কান পেতে সব শুনছে। আবার হুটু আস্তে আস্তে বৈকুণ্ঠর কাছে গেল। গিয়ে বৈকুণ্ঠর সিং দুটো ধরলে। বললে—কী রে, বকেছি বলে তোর কষ্ট হয়েছে? রাগ হয়েছে?

তারপর মাকে ডেকে বলে—ও মা, দেখ দেখ, জানোয়ার বলেছি বলে বৈকুণ্ঠর আবার রাগ হয়েছে! তা জানোয়ারকে জানোয়ার বলবো না তো কী বলবো শুনি? ঠাকুর বলবো? আদরের ঠাকুর? ঠাকুর বলে আদর করবো?

বলে বৈকুণ্ঠর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো হুটু। হুটু যত বৈকুণ্ঠকে আদর করতে যায় তত সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিছুতেই আদর করতে দেবে না। তার যেন রাগ নেই। অভিমান নেই। সে যেন বোকা, কিছু বুঝতে পারে না।

হুটু বুঝতে পারলে। বললে—রাগ করছিস কেন বৈকুণ্ঠ? আমি কি তোকে অন্যায় কিছু বলেছি? আমার কি জ্বালা একটা রে? ওদিকে বাড়িতে ভাত নেই, বাবাটা তো মদ খেয়ে কোথায় পড়ে থাকে, তার ওপর

তুই হইছিস একটা অবুঝ। এদিকে বাড়িতে একটা বড়লোকের ছেলেকে এনে তুলেছি, তার আবার জ্বর, আমি কোন্ দিক সামলাই তাই বল্—

বৈকুণ্ঠ একটু যেন হাসলো এবার। যেন তার রাগ ভাঙলো এতক্ষণে।

কী হাসি নুটুর! বললে—মা, এই দেখ, বৈকুণ্ঠর এতক্ষণে রাগ ভাঙলো। ও সব বোঝে, জানো মা! জানোয়ার হলে কী হবে, জ্ঞান এদিকে টনটনে—

বৈকুণ্ঠ তখন আনন্দে জিভ দিয়ে নুটুর গাল চাটতে আরম্ভ করেছে।

নুটুও তখন একমনে আদর খাচ্ছে। হঠাৎ মা'র কথায় খেয়াল হলো। মা বললে হ্যাঁ রে, তোর বৈকুণ্ঠকে আদর করলেই পেট ভরবে? আমায় ভাত চড়াতে হবে না?

নুটু উঠলো। বললে – হ্যাঁ এই যাই—

তারপর যেন খেয়াল হলো। বললে—তাহলে জ্যোতি কী খাবে মা?

মা ঝাঁজিয়ে উঠলো কী খাবে তা আমি কী জানি। আঙুর বেদানা আপেল খাবে।

—কী যে তুমি বলো মা! অসুখে কখনও আঙুর বেদানা আপেল খায়? ওকে একটু সাবু করে দাও না মা। বাবুরা যে জ্বর হলে সাবু খায়। বিন্দাবন সা'র দোকানে দেখেচি লোকে সাবু কেনে জ্বর হলে—

মা বললে—বাবুদের বাড়ি জ্বর হলে সাবু খায়। আমার যখন জ্বর হয়েছিল আমি সাবু খেইচি, না তুই কখনও সাবু খেইছিস?

—কিন্তু মা, জ্যোতি কি আমাদের মতন? ওর যদি জ্বর বাড়ে?

—তাহলে ডাক্তার ডাকো। ডাক্তারকে নিয়ে এসো। সাবু নিয়ে এসো, ওষুধ নিয়ে এসো। তোমার পয়সা আছে, তুমি ডাক্তার-ওষুধ আনবে, আমি তাতে কী বলবো।

খোঁটাটা বুঝতে পারলে নুটু। কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—তুমি অমন করে কথা বলছো কেন? খোঁটা না দিয়ে কি কথা বলা যায় না মানুষের সঙ্গে?

—তা খোঁটা দেব না তো কী। ভাত জোটে না যাদের পেটে তাদের আবার বাড়িতে শখ করে বড়মানুষের ছেলে পোষা কেন?

নুটু এবার গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—তা বলে এখানে ওর কেউ নেই বলে ছেলেটা বেঘোরে মারা যাবে।

মা বলে উঠলো—মারা যাবে কি না তা তুই জানিস, আমি তার কী

জানি। আমার কিসের দায়? আমি ওকে ঘরে এনিচি না ঘরে পুষিচি!

—বার বার ওই এক কথা বলবে তুমি? আমি কি তখন জানি যে এমন করে ওর জ্বর হবে?

—তা জানিস না তো পাপ মরতে ঘরে আনলি কেন?

—মা! মুটু চিৎকার করে উঠলো। তারপর একটু থেমে বললে—খবরদার বলছি, অমন করে কথা বলো না তুমি।

—কেন বলবো না শুনি? তুই তো যাচ্ছিস ক্ষেতমজুরি করতে, বাড়িতে তো আমিই থাকবো। আমাকেই তো সেই সব করতে হবে। তা বলবো না!

—না, বলবে না। অলুক্ষুণে কথা যেন তোমার মুখ থেকে আর না শুনি।

—বেশ করবো বলবো। আলবাৎ বলবো। কী একেবারে রোজগেরে ছেলে আমার! তবু যদি দুবেলা দুমুঠো খেতে দিত মাকে। যে খেতে দিতে পারে না তার আবার অত তম্বি কিসের। আমি পারবো না সাবু করতে। দরকার হয় তুই নিজে সাবু কিনে নিয়ে এসে রান্না করে দে—

মুটু তখন রাগে গরগর করছে। গরগর করতে করতেই বললে—এই শেষবারের মত বলে দিচ্ছি মা, আমাকে রাগিয়ে দিও না, রাগ হয়ে গেলে আমি লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেব—

—কী লঙ্কাকাণ্ড বাধাবি তুই, বাধা না! ঘরে আগুন দিয়ে দে, আমি মরে বাঁচি—

এমন সময় টলতে টলতে দিগম্বর এসে হাজির।

—কী হলো, এত হল্লাবাজি কিসের?

ভিজে কাপড় পরনে, ভিজে গামছা কাঁধে, চোখ দুটো রাঙা।

—আবার কিসের ঝগড়া?

মা বললে—দেখ না, তোমার ছেলে কাকে বাড়িতে এনে পুষেচে, সে জ্বরে ধুঁকছে, এখন তাকে সাবু করে দিতে হবে, তার রোগের সেবা করতে হবে। আমি পারবো না বলতে আবার আমায় শাসাচ্ছে, বলছে কিনা ঘরে আগুন দিয়ে দেবে!

একে দিগম্বর সারারাত জেগে নেশা করে এসেছে, তার ওপর এই অশান্তি। চোখ দুটো গাঁজা খেয়ে রাঙা হয়ে আছে। কথাটা শুনে আর সেখানে দাঁড়াল না। সোজা ছেলের দিকে এগিয়ে গেল। বললে—হারামীর

বাচ্চা, ঘরে আগুন দিবি তুই, এত বড় আস্পর্ধা তোর—

হুটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক পা পিছিয়ে এল।

তারপর বললে,—আর এগিও না বলছি, তাহলে তোমাকেও মেরে লোপাট করে দেব—

—কী বললি হারামজাদা!

দিগম্বরের রাঙা চোখ আরো রাঙা হয়ে উঠলো।

—যা বলেছি ঠিক বলেছি। আর এগিয়ো না, এগোলে মাথা ফাটিয়ে দেব তোমার। আমার মাথায় ঠিক নেই এখন!

দিগম্বর বোধ হয় তখন জ্ঞানশূন্য। বললে—কোথায় গেল সে বেটা? দেখি তার কিসের জ্বর? আমি বেটার জ্বর দেখাচ্ছি—

—বাবা!

হুটু চিৎকার করে উঠলো। বললে—জ্যোতির গায়ে যদি হাত দেবে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন! আমি যাচ্ছি সাবু আনতে ডাক্তার আনতে, আমি যদি এসে দেখি জ্যোতির কিছু হয়েছে তো তোমাদের দুজনকেই আমি দেখে নেব—হ্যাঁ, এই বলে রাখলুম।

বলে বৈকুণ্ঠকে ডাকলে—চলে আয় বৈকুণ্ঠ—

বৈকুণ্ঠর গলার ঝুমঝুমিটা ঠুনঠুন করে বেজে উঠলো। যেন সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচালো। তারপর গরু দুটোকে নিয়ে গাড়িতে জুড়ে দিলে। গাড়িও চলতে লাগলো। পেছন পেছন বৈকুণ্ঠও চললো ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে। ময়নাডাঙার ইস্টিশানের রাস্তা বাঁয়ে রেখে সোজা উত্তর দিক বরাবর বাজারের রাস্তা। বাজারের ভেতরেই সাহা মশাইয়ের আড়ত।

হুটু ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গিয়ে আড়তের গদিতে হাজির হলো।

—পেন্নাম সা'মশাই।

সাহা মশাইয়ের অত সময় নেই যে যার-তার প্রণাম যখন-তখন নেয়। একবার হুটুর দিকে চেয়ে নিয়েই আবার হিসেবের খাতায় মন দিলে। একটু হিসেবের ভুল হলেই কড়ায়-ক্রান্তিতে পাঁচ ডবল ভুল হয়ে যাবে।

হাতের আঙুলে হিসেবের বাড়তি পয়সাটা আটকে রেখে সাহা মশাই বললে—অ ক্যাদার, আবার শয়তানটা কী বলে ছাখো—

কেদার সরকার এগিয়ে কাছে এল।

—কী রে, কী চাস?

হুটু নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত সবিনয়ে বললে—খেপ নেই আজ ?

কেদার গলাটা নিচু করলে এবার, বললে—ক'টা খেপ চাস ?

হুটু বললে—যতগুলো ছান। বড় বেকারে পড়ে এসেচি সরকার মশাই, বড় বিপদ চলছে বাড়িতে। কিছু যদি আগাম দিতে পারেন তো সাবু কিনে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসি। বাড়িতে জ্বরজারি চলছে—

কেদার সরকার আরো গলা নিচু করে বললে—সা'মশাই রেগে আছে তোর ওপর, তা জানিস তো ? তোকে খেপ দিয়ে ক'টা ওয়াগন খালি চলে গেছে সেবার—

হুটু বললে—ও-সব কথা আমি শুনতে চাই নে সরকারবাবু, আপনি যা মামুলী নেবেন ছান, আমাকে একটা টাকা ছান, এই আপনার পায়ে ধরছি আমি—

—আরে, করিস কী, করিস কী, সকাল বেলা ছুঁয়ে দিলি তো ?

—আজ্ঞে, আপনি না হয় চান করে নেবেন'খন, টাকা আমারে একটা দিতেই হবে, আমি আপনার পা ছাড়ছি নে—

ওধার থেকে সাহা মশাইয়ের গলা শোনা গেল—ক্যাদার! ছোঁড়াটা কী বলছে রে, ঘ্যান ঘ্যান করছে কেন ?

কেদার চেঁচিয়ে বললে—আজ্ঞে কর্তা, খেপ চাইছে—

—দিওনি, দিওনি, বেটার একটু হুঁশ হোক—খপরদার দিওনি বলছি—

কেদার এবার চোখ টিপলে। তারপর গলা খাটো করে বললে—নে, ট্যাকাটা লুকিয়ে রাখ্। কর্তা দুপুরবেলা খেতে গেলে আসিস, খেপ দেব। কিন্তু এবার আর চার আনায় হবেনি বাপু, তা বলে রাখছি। সাড়ে চার আনা করে মামুলী দিতে হবে—

—তা তাই দেব সরকারবাবু। আপনার পায় পড়ি, ছান আপনি, আমি গতরে খেটে শোধ করে দেব, গরীবকে দিলে আপনার ভালো হবে—আপনি ছান—

কেদার সরকারের হাত থেকে টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়েই হুটু ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে দৌড়লো। বৈকুণ্ঠও ছুটলো পেছনে। বাজারের বিন্দাবন হাজরার দোকান পর্যন্ত না গেলে যেন আর দৌড়নো থামবে না।

—কি গো, ক্যাদার, ব্যাটা কি বলছিল ?

কেদার সরকার বললে—কী আবার বলবে, খেপ চাইছিল।

—খেপ দাওনি তো তুমি ?

কেদার বললে—আপনি ক্ষেপেছেন ? ওই হারামজাদাকে আর খেপ দিই ! হারামজাদা গদির লোকসান করে দিয়েছে একবার, আর ওমুখো হই। তাড়িয়ে দিলুম, বললাম সা'শাই রেগে গেছে, আর খেপ পাবি নে—

—বেশ করেছ, ভালো করেছ—বলে সাহা মশাই আবার হিসেবের খেরো খাতার মধ্যে ডুবে গেল। টাকা আনা পাই কড়া ক্রান্তি···

—কে ?

বেশ গিলে-করা ফিনফিনে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি। ফরসা দুধে-আলতা গায়ের রং। মোটাসোটা থলথলে মানুষ। এসেই একেবারে পায়ে হাত দিতে গেল আমার।

বললাম —এ কী, করছেন কী, কে আপনি ? শঙ্কর কোথায় গেল ? রতন ?

রতনও দৌড়ে এসেছে, শঙ্করও এসেছে।

বললাম—ইনি কে ? আমি যে কেষ্ট হালদারকে ডাকতে বললাম ?

শঙ্কর বললে—কেষ্ট হালদার মশাই একটু খেতে গেছেন, খেয়েই আসছেন। আর ইনি মন্মথবাবু। এই এখানকার মেজবাবু। আপনাকে বলেছিলুম এঁর কথা। এ বাড়িটা এঁরই। জমিদার তো চলে গেছে। এঁরা এখন কলকাতায় কব্জার ফ্যাক্টরি করেছেন—

বললাম—বসুন—

মন্মথবাবু বড় প্রীত হলেন। একগাল হাসি হেসে বললেন—এখানে আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো জ্যোতিদা ? আপনি আসবেন বলে আমি সমস্ত বাড়িটা হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে দিয়েছি। এখানে তো আর থাকি না এখন—এ ফার্নিচার-টার্নিচার সবই আমি যোগাড় করে দিয়েছি···

আবার সেই খোসামোদ! ভালো করে মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলাম। সেই একই রকম মুখের চেহারা। এই সব চেহারা জ্যোতির্ময় সেনের দেখা আছে। এরা খোসামোদ করতে জানে। খোসামোদ করে ঠিক মিনিস্টারদের কাছ থেকে পারমিট লাইসেন্স আদায় করতেও জানে। সেই কলকাতা থেকে এতদূরে শুধু শুধু আসেনি। এরাই ছিল হুটু আর দিগম্বরদের বাবু। এককালে এদের এই বাড়িতেই ময়ূর ছিল, কাকাতুয়া ছিল, কুকুর ছিল, আজ

এ বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই বাবুরা জমিদারি বেচা টাকা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি করেছে। সে বাড়িতে বাবুরা হয়ত গাড়ি পুষেছে, রেডিও পুষেছে, রেডিওগ্রাম, রেফ্রিজারেটার পুষেছে। আমেরিকা জার্মানী ইংলেণ্ডে যা কিছু তৈরি হয় সবই পুষেছে, শুধু ময়ুর পোষেনি, কাকাতুয়া পোষেনি, কুকুর পোষেনি—

—কষ্ট হলে বলবেন। লজ্জা করবেন না। এ আপনার নিজের বাড়ি মনে করবেন জ্যোতিদা—

মন্মথবাবুর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এককালে এঁরা জমিদার ছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ময় সেনের মনে হলো জমিদারি চলে গিয়েও যেন এঁদের জমিদারি যায়নি। মোটা ক্ষতিপূরণ পেয়ে মোটা প্রফিট পেয়েছে। সেই মোটা প্রফিটের টাকা আরো বড়ো জমিদারিতে ইন্‌ভেস্ট করে এখন আরো মোটা ডিভিডেণ্ড পাচ্ছে। নইলে চেহারা এমন নিটোল থাকতো না।

জ্যোতির্ময় সেন হাসলেন। এরকম ক্ষেত্রে হাসাই উচিত। আপ্যায়নের হাসি। পলিটিক্স করবার শুরু থেকেই এই হাসিটা তিনি হাসতে শিখেছিলেন। মনের মধ্যে আপনার হাজার রাগ থাক, হাজার ঘৃণা থাক, হাজার শত্রুতা থাক, বাইরে মুখে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে রাখতে হবে। তাতে কাজ হয়। জনপ্রিয়তা বজায় থাকে। আর জনপ্রিয়তাই তো রাজনীতিকের একমাত্র ক্যাপিট্যাল।

—দেখছেন তো এই গ্রামের অবস্থা!

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কী করে আর দেখবো, আমি তো সকাল থেকে এখানেই বসে আছি।

—কিন্তু শুনেছেন কিছু নিশ্চয়ই?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—খবর তো রাইটার্স বিল্ডিংএ যায়ই—

—সে তো যাবেই। অথচ আমরা এ-গ্রামে যতদিন ছিলুম ততদিন গ্রামের লোকের এ দুর্দশা ছিল না। আমার বাবা পুজোর সময় সকলকে একখানা করে কাপড় দিতেন।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আপনারা চলে গিয়ে তাহলে গ্রামের লোকের খুব অসুবিধে হয়েছে বলুন ?

মন্মথবাবু কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন—আমি ঠিক সে কথা বলছি না, গ্রামের লোকেদের আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা কী বলে। তারা আগে ভালো ছিল, না এখন ভালো আছে—

—তা আপনারা কি বলতে চান জমিদারি-প্রথা আবার ফিরে আসুক ?

মন্মথবাবু যেন লজ্জিত হলেন।

বললেন—ছি ছি, ঘড়ির কাঁটা কি আর উল্টোদিকে ঘোরে ? আমি আপনার কাছে এসব কথা বলবার জন্যে আসিনি। আমি এলুম এমনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের বাড়িতে আপনার মত লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে, এ কি আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা ! শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না—

আবার সেই খোশামোদ। এ-ধরনের খোশামোদ শোনা অভ্যেস হয়ে গেছে জ্যোতির্ময় সেনের। ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকেই এ-সব অনেক দেখা আছে। ক্ষমতা লোকে এই জন্যেই তো চায়। ক্ষমতার মোহ বড় মোহ। টাকা তুচ্ছ, খ্যাতি তুচ্ছ, স্বাস্থ্যও তুচ্ছ তার কাছে। ক্ষমতার জন্যে তাই মানুষ সন্ন্যাসী হয়, ক্ষমতার জন্যে তাই মানুষ অর্থকে অনর্থ ভাবে। ক্ষমতা তাই সংসারে সব চেয়ে ক্ষতিকর।

হঠাৎ শঙ্কর ঘরে ঢুকেছে।

বললে—জ্যোতিদা, আপনার তো বিশ্রাম হলো না—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—বিশ্রাম হলো আর কই—

—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এত লোক আসছে যে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না—

জ্যোতির্ময় সেন বললে—এসব আমার অভ্যেস হয়ে গেছে শঙ্কর—

আজ জ্যোতির্ময় সেন যেখানে এসে পৌঁছেছেন, শঙ্কররাও সেই এক জায়গায় পৌঁছোনোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। যেদিন আর সেখানে পৌঁছোতে পারবে না সেদিন আমাকে খাতির করাও ছেড়ে দেবে। তখন আবার অন্য জ্যোতির্ময় সেনদের ধরবে। আবার তাঁদের ঠিক এমনি করে খোসামোদ করবে। খাতির করবে। এ-ই তো নিয়ম। এ নিয়ে মন খারাপ করা উচিত নয়। অবশ্য মন খারাপ কোনও কিছুতেই করা উচিত

য়। মন খারাপ করলেই শরীর খারাপ। আর শরীর খারাপ হলেই ধঃপতন!

জীবনের সঙ্গে যখন কারো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখনই হয় য়ের কথা। জীবন মানে জন। জন মানে মানুষ। মানুষের সঙ্গে যোগই লো জীবনের সঙ্গে যোগ। প্রথম জীবনে এই যোগ রাখা সহজ, যেমন শঙ্কর। ঙ্করের এটা প্রথম জীবন। বাড়ি-ঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ খতে পারছে, ভোটে নামলে খাটতে পারবে। ক্যানভাস করতে পারবে। ন্তু যখন বয়েস হবে তখন আমার মতই ওকে বিশ্রাম করতে হবে। এখন র না খেলেও চলে, না ঘুমোলেও চলে। কিন্তু তখন ওকে নির্ভর করতে বে এই সব শঙ্করদেরই ওপর। এদেরই পরিশ্রম আর সততার ওপর নির্ভর রেই তাকে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে হবে।

—কিন্তু আমাদের অবস্থা একবার ভাবুন জ্যোতিদা।

হঠাৎ যেন স্বপ্ন ভেঙে গেল। জিজ্ঞেস করলাম—আপনাদের অবস্থা কি খন খারাপ হয়ে গেছে?

—খারাপ নয়? আগে দুশ্চিন্তা ছিল না এমন। আগে যা আয় হয়েছে া দিয়ে আরামে জীবন কাটিয়েছি আর ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে মাথা ামাতে হয়নি।

—কিন্তু এখন তো আপনাদের আয় অনেক বেড়েছে। আপনি তো ব্জার ফ্যাক্টরি করেছেন কলকাতায়। বিলিতি কব্জার আমদানি বন্ধ ওয়াতে তো আপনার কোম্পানী এখন একচেটিয়া কারবার করছে।

মন্মথবাবু বললেন—কিন্তু তা হলে কী হবে জ্যোতিদা, তখন তো াইকের ভয় ছিল না, তখন তো ধর্মঘট ছিল না, তখন তো জমিদারি লক্-াউট করবার কথা ভাবতাম না। এখন কেউই গ্যারান্টি দিতে পারে না ে আমার ফ্যাক্টরি কাল খুলবে। খুলতেও পারে আবার নাও খুলতে ারে। এও তো একরকম অশান্তি। এ অশান্তি আরো ভয়ানক।

বললাম—টাকা উপায় করবেন আর অশান্তি হবে না?

—আমি তো এমন করে টাকা উপায় করতে চাইনি জ্যোতিদা, আমরা চা চেয়েছিলাম সিকিউরিটি। যদি ভবিষ্যতের নিরাপত্তাটাই থাকলো না তা কী হবে এত টাকা নিয়ে?

জ্যোতির্ময় সেন মনে মনে হাসলেন। যেন আর একটা নতুন বিষয়বস্তু

তাঁকে। এক গ্লাস জল পর্যন্ত তিনি খেতে পাননি। তেষ্টায় তাঁর গলা শুকি গেছে, জলের জন্য চিৎকার করেছেন। সে-সব দিনের কথা কি তাঁর নি এখন মনে আছে! আজ এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘরে যখন ডানলোপিলো গ চেয়ারে বসে সেক্রেটারিয়েটের ফাইল দেখেন, তখন কল্পনা করতেও ভয় মেদিনীপুর হাজতখানার ভেতরকার সেই বড় বড় মশার কামড়।

একদিন তিনি মিছিল করে স্লোগান দিয়েছেন ইংরেজ লাটসাহেবে বাড়ির সামনে। আর আজ তাঁর বাড়ির সামনে এসে ওরা স্লোগান দিচ্ছে।

এমনি করেই হয়ত ইতিহাসের চাকা ঘোরে।

কিন্তু ইতিহাস কী? ইতিহাস কি শুধু তাঁর অতীত স্মৃতি? শুধু অতী স্মৃতি যদি হতো তো তাহলে তিনিও তো ঐতিহাসিক। তিনি রাজনীতি না হয়ে ঐতিহাসিক হতেই পারতেন! তা হননি। এই অতীত স্মৃতি নি যে মানুষ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সমন্বয় করে একটা নিজস্ব স্বাধীন দর্শ আবিষ্কার করতে পারে ঐতিহাসিক বলি তাকেই।

গিবনের কথা মনে পড়লো। ইতিহাস লিখে পৃথিবীতে অত সুখ্যা আর কেউ পেয়েছেন বলে জ্যোতির্ময় শোনেননি। সেই কোন্ অতীতের কথ বর্তমানের তীরে বসে দ্রষ্টার মত অতীতকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখতে পেয়েছিলে যেন তিনি সেখানে সেই যুগে সশরীরে ছিলেন। সেই অতীত যুগে বসে তিনি বর্তমানের বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে······

বাইরের মিছিলটার আওয়াজ আরো স্পষ্ট হচ্ছে—

অথচ এককালে কী নিঃঝুম ছিল এই ময়নাডাঙা! তখন ময়নাডাঙ শুধু এখানে একটা বাড়ি আর ওই এক মাইল দূরে ওই ওখানে আর একটা

মনে আছে অসুখের মধ্যে যখন চুপচাপ শুয়ে থাকতুম মনে হতো যে মরুভূমির মধ্যে আছি। মাঝে মাঝে বাড়ির কথা মনে পড়তো, বাবার কথ মনে পড়তো, মাস্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়তো। রঘুর কথা মনে পড়তো বৈজুটার কথাও মনে পড়তো। আর সেই ড্রাইভার শুকদেব। শুকদে কথাও মনে পড়তো। মনে পড়তো সেখানে থাকলে, এখন ওষুধে ওষু ডাক্তারে নার্সে বাড়ি ভরে যেত। সে তো জানাই ছিল।

কিন্তু এও আর এক রকম।

প্রথম দিন হুটু কালমেঘ-পাতার রস খেতে দিয়েছিল।

হুটু বলতো—এ পেট গরমের জ্বর। আমরা এই রকম হলে কাল

পাতার রস করে খাই।

কত কী খাইয়েছে মুটু। কালমেঘ, চিরতা। যেসব জিনিস পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না সেই সব জিনিস এনে খেতে দিত।

ওদের হয়ত ওইতেই সারে। ডাক্তার কবিরাজ তো ময়নাডাঙায় বিলাসিতা। মন্মথবাবুরা ডাক্তার দেখাবে, কবিরাজ দেখাবে। তাদের জন্যে শিশির লাল রঙের ওষুধের ব্যবস্থা। তাদের জন্যে বরফ, আইসব্যাগ।

মুটু মাঝে মাঝে সময় পেলেই কাছে এসে বসতো।

জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছিস রে?

আমার তখন ভালো করে কথা বলবারও ক্ষমতা ছিল না।

মাথা নাড়াতাম শুধু, আমার চোখ দিয়ে শুধু জল পড়তো।

মুটু চিৎকার করে মাকে জিজ্ঞেস করতো—মা, জ্যোতিকে সাবু দিয়েছ?

মা উত্তর দিতে দেরি করলে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠতো।

বলতো—মা, কথা বলছি তোমার কানে যাচ্ছে না নাকি? বড় বাড় বেড়েছে তোমার—

মা বলতো—দিচ্ছি, সাবু করে দিচ্ছি, আমার কি একটা কাজ?

মুটু চিৎকার করে বলতো—তা তোমার কাজটাই বড় হলো? আর সব কাজ পড়ে থাক, সাবুটা আগে, একটা ছেলে জ্বরে ধুঁকে উপোস করছে, সেদিকে খেয়াল নেই, কেবল তোমার যত বাজে কাজ—

তারপর গজগজ করতে লাগলো নিজের মনেই। বলতে লাগলো—আমি ক্যাদারবাবুকে মামুলী দিয়ে খেপ নিয়ে সেই পয়সায় বিন্দাবন হাজরার দোকান থেকে সাবু কিনে নিয়ে এলাম, আর তুমি সেটা ফেলে রেখে দিলে। যত সব আকাট মানুষ নিয়ে হয়েছে এ বাড়ির কারবার—

তারপর গজগজ করতে করতে আবার রান্নাঘরের দিকে উঠে যেত। শেষে নিজের হাতেই সাবু তৈরি করে নিয়ে এসে খাওয়াতো।

বলতো—খা—খা—হাঁ কর—

আমার অরুচি হয়ে গিয়েছিল। সাবুতে নেবুও নেই, মিছরিও নেই। সাবুর নাম শুনলেই আমার বমি আসতো।

—হাঁ কর্, হাঁ কর্—

একদিন মুটুর গায়েই বমি করে দিয়েছি। সে কী যন্ত্রণা।

মুটু বললে দূর, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! দিলি তো আমার

কাপড় নষ্ট করে? আমার একখানা কাপড়, এখন আমি কী পরি?

কিন্তু সেদিন আর আমার জ্ঞান নেই। আমি অচৈতন্য অজ্ঞান হয়ে গেলাম। শুনেছি আমার নাকি তখন শেষ অবস্থা হয়ে এসেছিল। আমার কিছুই অনুভূতি নেই। শেষে নাকি নাড়িও চলে গিয়েছিল আমার।

আমার অবস্থা দেখে ন্টুটু আর থাকতে পারেনি। সে নাকি তখন উর্ধ্বশ্বাসে ডাক্তারের বাড়ি ছুটেছিল। জ্যোতি আর বাঁচবে না এ যেন আর তার সহ্য হচ্ছিল না।

মা বললে—কোথায় যাচ্ছিস?

ন্টুটু দৌড়ে যাবার সময় বলে গেল—চুলোয়—

তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। আমি তখন অসাড়।

হঠাৎ একটা গোলমালে জ্যোতির্ময় সেন যেন চমকে উঠলেন।

'গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না—'

বিরাট সোরগোল শুরু হয়েছে একতলার সদর দরজার সামনে। একজন লীডার চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছে—গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না—

আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠছে—চলবে না—চলবে না—

ওদের কিছুতেই কিছু চলবে না। গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না। খুব খাঁটি কথা, কিন্তু ওদেরই নেতা যখন আবার মন্ত্রী হবে তখন কোন্ স্লোগান ওরা দেবে? চিরকাল মন্ত্রীও থাকবে, গরীবও থাকবে। ইতিহাসে এমন যুগ কখনও পাওয়া যাবে না যখন মন্ত্রীও ছিল না, গরীবও ছিল না। গরীবের সঙ্গে মন্ত্রীদের সংগ্রামের আর এক নামই হলো ইতিহাস। এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী এগিয়ে যাবে নিজের কক্ষপথে। কিছু মানুষ আরাম করবে আর বেশির ভাগ মানুষ ধ্বংস হবে। ধ্বংসের মধ্যেই জীবনের পলিমাটিতে নতুন ফসল গজাবে, তারপর আবার সেই ফসল নিয়েই কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে মানুষে-মানুষে। তখন ক্রম-বিবর্তনের নিয়মে আবার নতুন কোনও স্লোগান তৈরি হবে। আবার শুরু হবে সংগ্রাম, আবার ধ্বংস।

এই যে আজ সকাল থেকে আমি এখানে বসে আছি, এতে কতটুকু রাজকার্য করেছি জানি না। আরাম করা ছাড়া আর কী-ই বা করেছি আমি! কিন্তু রাইটার্স বিলডিং-এ গিয়ে এরই খরচের বিল আমাকেই পাস করতে হবে। সেবার বন্যার জন্যে গেলাম গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখতে। নিজে তাদের অসহায় অবস্থা দেখে প্রতিকার করা ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার ঘোরার খরচই পড়ে গেল ছত্রিশ হাজার টাকা। ও-টাকাটা বন্যাত্রাণে দিলে তাদের উপকার হতো।

একবার পণ্ডিত নেহরুকে বলেছিলাম—আপনি এত ঘোরেন কেন? ওরও তো একটা খরচ আছে? আপনি অত না ঘুরলে ও-টাকাটা তো বেঁচে যায়?

নেহরু বলেছিলেন—আমি নিজের চোখে ইণ্ডিয়ার সমস্ত জায়গা দেখতে চাই। অদর্শনে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়।

কিন্তু সেই ভুল বোঝাবুঝির প্রতিকারের মাসুল তো দেবে দেশের লোকরাই। টাকাটা তো তাদেরই। তাদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করা টাকা খরচ হবে প্রাইম মিনিস্টারের দর্শনলাভের জন্যে! আমিও আজ সেই অপরাধই করছি। আজ আমার জন্যে কম করেও অন্ততঃ দশ-বারো হাজার টাকা এই ক'ঘণ্টায় খরচ হয়ে যাবে। আমি কি এ ক-ঘণ্টায় এই দশ-বারো হাজার টাকা উপায় করতে পারতুম! আমি যদি ইঞ্জিনীয়ার কি ব্যারিস্টার হতুম, কি ব্যবসাদার কিংবা ডাক্তার হতুম, তো আমার কি সাধ্য ছিল এই ক'ঘণ্টায় এত টাকা উপায় করি?

আসলে আমি একজন ক্রিমিন্যাল।

এ-কথা আমার ক্যাবিনেটের মিটিং-এ আমি বলতে পারবো না। প্রেস-কন্‌ফারেন্সেও বলতে পারবো না মন খুলে। কারণ আমরা কারোর কাছে মন খুলি না। কিন্তু নিজের কাছে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি আমি অনেস্ট না ডিজ্‌অনেস্ট? আমি সৎ না অসাধু?

এক-একসময় আমি নিজেই একটা লিস্ট তৈরি করি মনে মনে। জীবনে আমি কী-কী ভালো কাজ করেছি আর কী-কী খারাপ কাজ করেছি। কিন্তু খারাপ কাজের তালিকাটাই লম্বায় বড় হয়ে ওঠে বার বার।

তবে হুটুর তো আমি ভালোই করেছি। হুটু আমার অসুখের সময় যা করেছে তা কোনও বাপ কোনও ছেলের জন্যেও করে না। কিন্তু আমি

তার জন্যে যা করেছি তাও কি কোনও বন্ধু তার বন্ধুর জন্যে করেছে ?

আসলে বোধ হয় শুভ-ইচ্ছেটাই সব। ইচ্ছেই মানুষকে তার নিজের সিদ্ধি আনিয়ে দেয়। মানুষের মন সেই ইচ্ছের বাহন।

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখনও তিনি মহাপুরুষ বলে স্বীকৃতি পাননি। মহাপুরুষত্বের প্রস্তুতি-ক্ষেত্র চলছে শুধু তখন। গায়ক হতে গেলে যেমন একদিন শিক্ষানবিশীর করতে হয়, সব ক্ষেত্রেই তাই. লেখক হতে গেলে কি শিক্ষানবিশীর দরকার হয় না? একজন সফল মুদিখানার মালিককেও শিক্ষানবিশী করে হাত পাকাতে হয়।

তিনি একদিন দার্জিলিঙে গেছেন।

শহর-সভ্যতা-জনপদ অতিক্রম করে নির্জন নিরিবিলি পাহাড়ী জঙ্গলের কাছে যেতেই একটা তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো নজরে পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন না সে-আলো সেই জনহীন পাহাড়ী অঞ্চলে কোথা থেকে এল।

আলোটা অনুসরণ করে তিনি সেই আলোর উৎস-মুখে দেখলেন একজন ধ্যানমগ্ন সাধু তপস্বী সেখানে বসে আছেন, আর তাঁর কপালের মধ্যে দিয়ে আলোটা বেরোচ্ছে।

দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিজয়কৃষ্ণ।

ডাকলেন সাধুকে। ডাকতেই সাধুর ধ্যানভঙ্গ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও নিভে গেল।

বিজয়কৃষ্ণ তখন আরো অবাক হয়ে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কপাল দিয়ে এ আলোটা বেরোচ্ছিল কেন ?

সাধু বললেন—ধ্যানস্থ হলেই ওই আলো বেরোবে—

বিজয়কৃষ্ণ বললেন—আবার আলো বার করতে পারেন ?

—হ্যাঁ পারি—

বলে তখনি আবার ধ্যানস্থ হলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কপাল দিয়ে আবার সেই রকম আলো বেরোতে লাগলো।

একেই বলে ইচ্ছে। মনকে স্ববশে আনতে পারলে শুধু কপাল নয়, সমস্ত শরীর দিয়ে এক অলৌকিক জ্যোতি বেরোনো সম্ভব। ইচ্ছা-মৃত্যুর মত ইচ্ছা-জীবন, ইচ্ছা-যৌবনও আয়ত্তে আনা সম্ভব। এ-সব তথ্য বইতে পড়েছি। কিন্তু আমার যদি তেমন ক্ষমতা থাকতো তো ইচ্ছে করতাম পৃথিবীর সমস্ত

মানুষের ভালো হোক। পৃথিবী সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হোক। সমস্ত পৃথিবী না হোক, অন্ততঃ বাংলাদেশের সমস্ত লোকের মঙ্গল হোক।

সেই অনেকদিন আগে ছোটবেলায় একদিন কামনা করেছিলুম ফুটুর যেন ভালো হয়। ফুটুর খোঁড়া পা যেন সেরে যায়। ফুটুর বাবা যেন নেশা ছেড়ে দিতে পারে। ফুটুদের বাড়ির চালে যেন ফুটো না থাকে। ফুটুরা যেন দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পায়।

আমার এতদিনের চাওয়া এখন নিশ্চয় পূর্ণ হয়েছে।

কারণ চীফ মিনিস্টার হয়েই আমি রিপোর্ট চেয়েছিলাম ময়নাডাঙার এস-ডি-ও'র কাছ থেকে।

এস-ডি-ও মিস্টার রায় নিজে এসেছিল রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

মিস্টার রায় বুঝতে পারেনি কেন আমি বার বার ময়নাডাঙার কথা জিজ্ঞেস করছি।

মিস্টার রায়কে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওখানকার গাঁয়ের লোকের অবস্থা কেমন?

মিস্টার রায় বলেছিল—গ্রামের লোকের অবস্থা মোটামুটি যেমন হয় তেমনি—

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আগের চেয়ে ভালো না খারাপ?

মিস্টার রায় বলেছিল—আগের চেয়ে ডেফিনিট্‌লি ভালো।

—কোনও খেতে না পাওয়ায় কেস আছে?

—না স্যার, খেতে না পাওয়ার কেস থাকবে কেন? দু'টাকা চল্লিশ করে চালের কিলো, তার চেয়ে সস্তা আর কী-ই বা হতে পারে। তাছাড়া কৃষি-ঋণ দেওয়া হয়েছে সবাইকে বীজ ধান কেনবার জন্যে। এবার ধানও হয়েছে প্রচুর। এখন তো কারো কোনও অভাব অভিযোগ নেই। আমি স্টারভেশন কেস সম্বন্ধে সব থানায় কড়া নজর রাখতে বলেছি।

আমি বলেছিলাম—ময়নাডাঙা সম্বন্ধে আমার পার্শোন্যাল এক্স্‌-পিরিয়ান্স আছে, ওখানকার সম্বন্ধে আমি খুব উদ্বিগ্ন, আপনি একটু স্পেশাল কেয়ার নিয়ে দেখবেন মিস্টার রায়। আমি চাই না ওখানে কেউ না খেতে পেয়ে কষ্ট পায়।

মিস্টার রায় বলেছিল—নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি স্যার স্পেশাল কেয়ার নেব এ ব্যাপারে—

তারপর নানান কাজে আর ময়নাডাঙার কথা ভাববার সময় পাইনি। কাজেরই কি অন্ত আছে আমার! তিনবার আমাকে ইয়োরোপে আর আমেরিকায় যেতে হয়েছে। সেটাও কি একটা কম কাজ! তারপরে নিজের পার্টির মিটিং আছে, দলাদলি আছে, খাওয়া-খাওয়ি আছে। নিজের চেয়ারটা বজায় রাখতে কি কম পরিশ্রম করতে হয় আমাকে! সবাই তো আমার এই চেয়ারটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, যেন আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করে আছি। অথচ এতদিন ধরে দেশের জন্যে যা কিছু স্বার্থত্যাগ করেছি সব যেন আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। যেন আমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। যেন দেশের এই স্বাধীনতা লাভের পেছনে আমার কোন অবদান নেই।

আমার মনে অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা ছিল যে এই ময়নাডাঙার জন্যে আমি যথেষ্ট করেছি। যখন চালের আকাল হয়েছিল তখন সেখানে লঙ্গরখানা খুলে দিয়েছি। গ্রামের লোকের জলকষ্ট দেখে আমি চীফ মিনিস্টারের ফাণ্ড থেকে টিউব ওয়েল করিয়ে দিয়েছি। অথচ কেউ বলতে পারবে না এই ময়নাডাঙা আমার নিজের কন্‌স্টিটিউএনসি। আমি তো এখান থেকে ভোটে দাঁড়াইনি।

চাণক্য পণ্ডিত অবশ্য বলে গেছেন—'বেশ্যা বারাঙ্গনা ইব রাজনীতি', কিন্তু তা হোক আমি রাজনীতিতে ঢুকে বেশ্যাবৃত্তি করেছি তা আমাকে কেউই বলবে না। আমি দেশের লোকের জন্যে অনেক কিছুই করতে পারিনি স্বীকার করি, কিন্তু অনেক কিছু করেছিও তো?

স্টুটুর জন্যেও কি কিছুই করিনি!

মনে আছে সেদিন নাকি আমার চরম অবস্থা। আমার জ্বর তখন একশো পাঁচ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। জ্বরের ঘোরে আমি তখন সত্যিই অচৈতন্য।

স্টুটুর তখন প্রায় পাগলের মত অবস্থা।

সদরের বড় ডাক্তার কলকাতা থেকে পাস করেছে। ময়নাডাঙার হাতুড়ে ডাক্তারের মত নয়।

সেখানেই গিয়ে হাজির হলো স্টুটু।

বড় ডাক্তারের হাতে অত সময় কোথায় যে স্টুটুর মত লোকের সঙ্গে কথা বলবে।

বললেন রোগী কোথায় ? রোগীকে এনেছিস ?

হুটু বললে—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, রোগীকে নাড়াচাড়া করলেই মারা যাবে। আপনি একবার নিজে গিয়ে দেখে আসবেন চলুন—

বড় ডাক্তার অন্য রোগী দেখতে দেখতেই বললেন—ময়নাভাঙা এখান থেকে অনেক দুর, চল্লিশ টাকা লাগবে—

হুটু বললে—আজ্ঞে আমরা গরীব লোক, টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, যদি গরীব বলে দয়া-ঘেন্না করেন—

—দয়া ঘেন্না ?

কথাটা শুনে বড় ডাক্তার চোখ তুলে দেখলেন একবার হুটুর দিকে।

তারপর বললেন—দয়া-ঘেন্না-টেন্না আমাদের নেই, বুঝলি! চল্লিশটা টাকা যোগাড় করে আন্, আমি যাবো।

—আজ্ঞে, চল্লিশ টাকা আমি কোত্থেকে পাবো ? আমাকে কাটলেও চল্লিশ টাকা বেরুবে না—

কিন্তু সদরের বড় ডাক্তারের অত সময় আছে নাকি যে যার-তার সঙ্গে কথা বলবেন। বললেন -যা, এখানে দাঁড়িয়ে বিরক্ত করিস নে, আমার অত সময় নেই—

হুটু তবু নাছোড়বান্দা।

বললে—ভগবান আপনার ভালো করবেন ডাক্তারবাবু, একটিবার আপনি চলুন—

—বিভূতি—

বিভূতি বড় ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। বিভূতি ডাক পেয়েই সামনে এল।

ডাক্তার বললেন—দেখ দিকিনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ কেবল বক্-বক্ করছে, একে বাইরে চলে যেতে বলো তো—

বিভূতিও অনেক কাজের লোক। তারও সময়ের দাম আছে। হুটুর দিকে এগিয়ে এসে বললে—বেরিয়ে যা এখান থেকে, বেরিয়ে যা—

—আজ্ঞে, একটিবার আমার কথাটা শোনেন, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছি—

বিভূতি আর একটু হলেই গলায় ধাক্কা দিত। তার মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে হুটুর তাই-ই মনে হলো—

বললে—কম্পাউণ্ডারবাবু, আমার কথাটা একবার শোনেন আপনি—

—বেরো, তুই আগে বাইরে বেরো, তারপরে কথা বলছি—

বলে সত্যিই গলাধাক্কা দিয়ে বিভূতি হুটুকে ঘরের বাইরে বার করে দিলে।

সেখানে খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল হুটু। টা-টা করতে লাগলো তার শরীরটা। মনে হলো তার মাথায় যেন কেউ লাঠির বাড়ি মেরেছে। জ্যোতি হয়ত তখন জ্বরের ঘোরে কাতরাচ্ছে। এক-ফোঁটা ওষুধ পড়লো না তার পেটে। এতদিন সাবু খেয়েও কিছু হলো না। তা শুধু সাবুতে কখনও বড়লোকদের জ্বর ছাড়ে। জ্যোতিরা তো বড়লোক।

হঠাৎ নজরে পড়লো পাশেই বৈকুণ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে।

নজরে পড়তেই মাথাটা ঘুরে গেল। হাতের কাছেই তো চল্লিশটা টাকা রয়েছে।

আর দাঁড়ালো না হুটু। সেখান থেকেই তীরের মত শাঁ-শাঁ করে ছুটতে লাগলো।

বৈকুণ্ঠও ছুটছে পেছন-পেছন। হুটুর চোখের সামনে তখন সমস্ত পৃথিবীটা বনবন করে ঘুরছে। মনে হচ্ছে একটু দেরি হলে যেন পৃথিবীর সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

দৌড়তে দৌড়তে একেবারে সোজা আবার ময়নাডাঙার গঞ্জে এসে হাজির হয়েছে। সাহা মশাইয়ের দোকানের পাশ কাটিয়ে একেবারে কলিমুদ্দীন মিয়ার দোকানের সামনে এসে হাঁফ ছেড়েছে।

কলিমুদ্দীন মিয়া মাংস কাটছিল একমনে।

—মিয়া সায়েব—

কলিমুদ্দীন মুখ তুলে দেখেই অবাক। সেই ছোঁড়াটা।

—মিয়া সাহেব, তুমি না বলেছিলে আমার বৈকুণ্ঠকে তুমি কিনবে ?

ততক্ষণে বৈকুণ্ঠও ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে এসে হাঁপাচ্ছে।

কিন্তু অত দিনের কথা, সব কি মনে থাকে কলিমুদ্দীনদের।

বললে—কে বৈকুণ্ঠ ?

—এই যে, এ।

এতক্ষণে মনে পড়লো কশাই-সন্তানের।

বললে—হ্যাঁ, তা কী ?

—আমি একে বেচবো। কত দেবে তুমি ? তখন তুমি বলেছিলে পঁয়তাল্লিশ টাকা দেবে।

—তা দেব।

—দাও—এই তো বৈকুণ্ঠ রয়েছে। নগদ দাম দিতে হবে কিন্তু। আমার এক্ষুণি টাকার দরকার। টাকা নিয়ে আমি সদরে যাবো বড় ডাক্তারের কাছে—

—স্যার, ওরা এসেছে।

—কারা ?

জ্যোতির্ময় সেন যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন। শঙ্করকে দেখেই চমকে উঠলেন।

—ওই যে যারা এতক্ষণ স্লোগান দিচ্ছিল।

এতক্ষণে সমস্ত মনে পড়লো।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কোন্ পার্টির লোক ওরা ?

শঙ্কর বললে—কম্যুউনিস্ট পার্টির—

—তা কী চায় ওরা ? এতক্ষণ চেঁচাচ্ছিল কেন ? 'গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না' বলে চেঁচাচ্ছিল কেন ? আমি কি ময়নাডাঙার গরীবদের জন্যে কিছুই করিনি ? আমিই তো এখানে এস. ডি. ও. মিস্টার রায়কে দুর্ভিক্ষের সময় ক্যাশ-ডোল দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম—আমিই তো এখানে টিউবওয়েল বসাবার বন্দোবস্ত করতে বলেছিলাম—

শঙ্কর বললে—সে-সব কথা আমি ওদের বলেছি স্যার, কিন্তু ওরা তা শুনছে না। বলছে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবে। ওদের পাঁচজন লীডার চায় আপনি ওদের সঙ্গে একবার কথা বলেন—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—ঠিক আছে, এখানে ওদের নিয়ে এসো—

ওরা পাঁচজনই এল ঘরের ভেতর। বেশ শান্তশিষ্ট হাসি-হাসি চেহারা। যারা ভেতরে ভেতরে অস্থির তারা সাধারণতঃ বাইরে শান্ত। হাসিমুখে তারা ভেতরের অস্থিরতাকে ছদ্মবেশ পরিয়ে রাখে। যারা হাসে না তাদের বোঝা যায়। কিন্তু যারা সব সময় হাসে না তারা হাসলে তবে বোঝা যায় যে তারা হাসছে। শুনেছি চাইনীজরা হাসে না। অন্ততঃ হাসলেও মুখ দেখে

তা বোঝা যায় না। ইংরিজীতে দু'রকম হাসি আছে। একটা laugh, আর একটা হলো smile। কিন্তু বাঙালীদের হাসি একটাই। বাঙালীরা শুধু হাসে। বড় বেশিই হাসে। যতটা প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি হাসে। তাই বাঙালীদের হাসি দেখলেই আমার ভয় হয়। মনে হয় কোনও মতলব আছে সে-হাসির পেছনে। যে হাসে, যে হাসতে পারে সে নাকি দীর্ঘায়ু হয়। হাসি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সব হাসি ভাল নয়। যে হাসিতে ঘর-বার একাকার হয়ে যায় সেই হাসিই স্বাস্থ্যকর।

সেক্সপীয়র তাঁর 'হ্যামলেটে'র প্রথম অঙ্কে হ্যামলেটের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— one may smile, and smile, and be a villain.

লোকগুলোকে দেখে আমার তাই-ই প্রথমে মনে হলো। সত্যিই এত হাসি ভালো নয়। হাসিটা জমিয়ে রেখে দিতে হয় শেষের জন্যে। যে শেষকালে হাসে তার হাসিই তো সার্থক। তুলসীদাস তাই বলেছেন, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় যেন জগৎ কাঁদে আর তুমি হাসো।

হুটুও হাসতে জানতো। কিন্তু সেদিন আর তার মুখে হাসি এল না। কলিমুদ্দীন মিয়া সত্যি-সত্যিই পঁয়তাল্লিশটা টাকা দিয়ে বৈকুণ্ঠকে কিনে নিলে।

হুটু বললে—আগে টাকা না দিয়ে আমার বৈকুণ্ঠকে টানছো কেন?

বৈকুণ্ঠ তখনও পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন জানেও না যে তাকে বিক্রি করে দিচ্ছে হুটু। মাথাটা একটু একটু নড়ছে, হয়ত মুখে মাছি বসছে তার। মুখে মাছি বসলে কার না অস্বস্তি হয়। কিন্তু এক মিনিট পরে, সেই মুখেরই যখন আর অনুভূতি থাকবে না, তখন মাছি বসলেই বা কী আর না বসলেই বা কী।

কলিমুদ্দীন মিয়া তখনও একদৃষ্টে ভেড়াটার দিকে দেখছে। পঁয়তাল্লিশ টাকায় কিনে কত টাকা সে লাভ করবে তাই-ই হয়ত ভাবছে তখন। কিংবা ওজনে কতখানি মাংস হবে—

—দাও, টাকা দাও—

কিরকম যেন একটা দোটানার মধ্যে তখন পড়েছে হুটু।

—দেখছো কী, মিয়াসাহেব, আমার টাকা দাও। তোমার লোকসান হবে না।

টাকাটা হাতে পেয়ে যেতেই হুটু যেন বাঘের মতন নোটগুলোকে মুঠোর

মধ্যে আমড়ে ধরলে। তারপর কী করবে বুঝতে পারলে না। হুটু টাকাগুলো নিয়ে চলে আসছিল। হঠাৎ কানে এল বৈকুণ্ঠর গলার আওয়াজ। সে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। ওগো, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমাকে এরা ধরে রেখেছে। আমাকে ছাড়ছে না। আমি তোমার সঙ্গে যাব—

ক্রমেই যেন বৈকুণ্ঠর গলার আওয়াজটা আরো জোরে কানে এসে পৌছোতে লাগলো—

আরো আরো জোরে—

শেষকালে হুটুর ইচ্ছে হলো একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখে। তারপর দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। কলিমুদ্দীন তার মস্ত বড় ধারালো কাটারিটা বার করেছে। বার করে বালিতে শান দিচ্ছে। তখনও ভ্যা-ভ্যা করে ডাকছে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ কি বুঝতে পেরেছে। বৈকুণ্ঠ তো সবই বোঝে। সে কি কাটারি শান দেওয়া দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি আর! তাই যেন সে ভয় পেয়ে গেছে। তাই যেন সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে—ওগো, তুমি আমাকে এমন করে কশাইয়ের কাছে বেচে দিলে? কটা টাকার জন্যে আমি আজকে তোমার কাছে পর হয়ে গেলাম?

—হুটু—হুটু—

হুটু তুই হাতে নিজের তুটো কান চাপা দিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে।

—হুটু হুটু—

হাতের ফুটো দিয়ে তখনও যেন বৈকুণ্ঠর আর্তনাদ তার কানে পৌছোতে লাগলো। হুটুও দৌড়তে শুরু করেছে। ওরে, জ্যোতির যে অসুখ। সে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে আছে। এই টাকা কটা না পেলে ডাক্তার যে তাকে দেখবে না—

খোঁড়া পায়ে ভালো করে দৌড়তে পারাও যায় না। তবু প্রাণপণে দৌড়চ্ছে হুটু।

হঠাৎ যেন মনে হলো পেছনে বৈকুণ্ঠর গলার ঘুঙুরের আওয়াজ হচ্ছে। তবে কি বৈকুণ্ঠ পালিয়ে এসেছে। কলিমুদ্দীনের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে!

পেছন ফিরতেই দেখলে—বৈকুণ্ঠ।

—বৈকুণ্ঠ, তুই এসেছিস?

বৈকুণ্ঠ মুখটা তুলে কাছে এল। ন্টুর খোঁড়া পায়ের ওপর মুখ রেখে বললে—আমাকে তুমি বেচে দিয়েছিলে ?

ন্টু আদর করে বলতে লাগলো—তুই কিছু মনে করিসনে রে, জ্যোতির খুব অসুখ যে। ডাক্তার টাকা না পেলে তাকে দেখবে না, আমি কী করি বল্! আমি টাকা কোথায় পাই তুই বল্—

বৈকুণ্ঠ কাঁদতে লাগলো।

ন্টু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বললে—কাঁদিসনি রে, তুই পালিয়ে এসেছিস ভালোই হয়েছে—আয়, আমার সঙ্গে আয়—

—এই, তুই আবার এসেছিস ?

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো। দেখলে বৈকুণ্ঠ নেই। সামনে দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউণ্ডারবাবু। সদরের বড় ডাক্তারবাবুর বাইরের ঘরের বেঞ্চিতে বসে বসে তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল নাকি!

বিভূতি কম্পাউণ্ডার বললে—টাকা এনেছিস ?

ন্টু হাতের মুঠোটা খুলে বার করে নোটগুলো দেখালে।

বললে—এই যে—

বিভূতি টাকাগুলো নিয়ে এক এক করে গুনতে লাগলো, বললে,—এত রক্তমাখা টাকা কোত্থেকে নিয়ে এলি রে ? এ টাকা চলবে তো ?

সত্যিই রক্তমাখা টাকাই বটে!

বিভূতি বললে—তুই যা, ডাক্তারবাবু সাইকেলে চড়ে তোর বাড়ি যাবে—

আমি তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য। কখন ডাক্তার এসেছে, কখন যে ওষুধ এনেছে ন্টু, কখন যে সে আমাকে ওষুধ খাইয়েছে তা আমার খেয়াল নেই।

ন্টু মাঝে মাঝে কাছে আসে। এসে নিচু হয়ে আমার মাথায় হাত বুলোয়।

বলে—কেমন আছিস রে এখন ?

আমি কী বলবো। আমার তখন কথা বলবার ক্ষমতাও নেই। কোনও রকমে চোখ দুটো মেলে ন্টুর দিকে চেয়ে দেখি। সমস্ত কিছু ফাঁকা

লাগে। কোনও কিছু ভাবতে গেলেই মাথা ভারি হয়ে আসে আর আমি চোখ দুটো বুঁজে ফেলি। আস্তে আস্তে আবার চোখ মেলে সমস্ত ঘরটার দিকে চেয়ে দেখি। খড়ের চালের মাথায় ফুটো দিয়ে রোদ এসে পড়ে বিছানায়। রোদটাকে হাত দিয়ে ধরতে যাই। কিন্তু রোদটা লাফিয়ে হাতের বাইরে এসে বসে। আবার ধরতে যাই, হাতের বাইরে থেকে সে তখন আমার গায়ে এসে বসে।

তারপর মনে পড়তে আরম্ভ করে সব। মনে পড়ে আমি একদিন বাড়ি থেকে এখানে এই ময়নাডাঙায় পালিয়ে এসেছিলাম। আমার বাবা বড়লোক, মস্ত বড় ব্যারিস্টার, তাও মনে পড়ে। মনে পড়ে আমি হুটুদের বাড়ি এসে উঠেছি। হুটু আমার বন্ধু হয়ে গেছে। হুটু আমায় ভালবাসে। হুটুর বাবা দিগম্বরকেও মনে পড়তে আরম্ভ করে। হুটুর মা, হুটুর বৈকুণ্ঠকেও মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ হুটু একদিন আবার আমার ঘরে এল।

আবার বললে—কি রে, কেমন আছিস ?

বললাম—একটু ভালো এখন—

সে বললে—শীগ্‌গির শীগগির ভালো হয়ে ওঠ্ রে—আমার আর ভালো লাগছে না একলা একলা—

বললাম—বৈকুণ্ঠ কোথায় রে ? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি নে ?

হুটু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—এ কি, তুই ওষুধ খাসনি যে ?

বললাম—বড় তেতো লাগে ভাই, ওষুধ খেতে আর ভালো লাগে না—

—সে কি, ওষুধ না খেলে চলবে কেন ? ওষুধ না খেলে সেরে উঠবি কি করে ? বলে নিজেই ওষুধের শিশি থেকে এক দাগ গেলাসে ঢেলে আমার কাছে নিয়ে এল।

বললে—খা, খেয়ে নে, আমি জল দিচ্ছি—

ওষুধটা খেতেই সঙ্গে সঙ্গে জল ঢেলে দিলে মুখের ভেতর। তারপর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বললে, তুই এবার ঘুমো, আমি আসছি—

কোথায় যাচ্ছিস তুই ?

হুটু বললে—আরে, আমার কি বসে থাকলে চলে ? আমার কত কাজ—

—কী কাজ করছিস তুই আজকাল ?

হুটু বললে—দিনরাত কাজ করছি, এই তো এলুম ইটখোলা থেকে,

এবার যাবো খড়ের ক্ষেপ মারতে—মাঝখানে এসে আবার তোকে ওষুধ খাইয়ে যাবো। তুই নিজে নিজে একটু ওষুধটাও খেতে পারবি নে?

তার পর আমার গায়ে চাদরটা চাপা দিয়ে বললে—তুই ঘুমো, আমি চললুম—

বলে চলে গেল হুটু। আমি চুপ করে শুয়ে রইলুম। কিন্তু শুয়ে থাকতে তখন আমার আর ভালো লাগে না। শুয়ে শুয়ে তখন আমার গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। সমস্ত পাড়াটাও চুপচাপ। চালের মাথায় একটা কাক ডাকলে শুনতে পাই। দেয়ালে একটা টিকটিকি নড়ে বেড়ালে তার দিকে চেয়ে থাকি। টিকটিকিটা মাঝে মাঝে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। গলার কাছে মাঝে মাঝে ধুক্ ধুক্ করে। তার পর ল্যাজটা একটু নাড়ে। বোধ হয় কোনও মতলব ভাঁজে। কিন্তু পাছে আমি কোনও বাধা দিই তাই ঘুরে ফিরে আমার দিকে চায়। হয়ত অবাকও হয়ে যায়। অবাক হয়ে ভাবে এ মানুষটা দিনরাত শুয়ে থাকে কেন? পৃথিবীতে সবাইকে যখন খেটে খেতে হয় তখন এ মানুষটার দিনরাত শুয়ে থাকার কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না সে। তারপর একসময় লাফিয়ে গিয়ে একটা পোকা ধরে, পোকাটা ধরতেই এক মুহূর্তের মধ্যে সেটা গিলে ফেলে। আর গিলে ফেলে কেমন যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। টিকটিকিটার দিকে দেখতে দেখতে আমার নিজের শরীরের মধ্যেও অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন আমিই পোকাটা গিলে ফেলেছি। তার পর সমস্ত শরীরটা যেন বড় দুর্বল হয়ে ওঠে আর কখন আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

এখন সেই সব কথা ভাবলেই মনে হয় আমরা সবাই-ই বোধ হয় ওই টিকটিকির মতন। সুযোগ পেলেই আমরা সবাইকে গ্রাস করবার জন্যে চেষ্টা করি। কখন কার সর্বনাশ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করি, কেবল তারই চেষ্টা আমাদের।

হুটু জিজ্ঞেস করতো—একলা একলা থাকিতে খুব কষ্ট হয় না তো?

বলতাম—না, কষ্ট কিসের?

হুটু বলতো—আরে কষ্ট তো একটু হবেই। চোখ কান বুঁজে একটু কষ্ট কর্ এ ক'দিন, তার পর আবার তোকে নিয়ে বেরোব—

সেদিন আবার জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ রে, বৈকুণ্ঠ কোথায় রে? বৈকুণ্ঠকে দেখছি নে যে—

ফুটু বললে—আরে বৈকুণ্ঠর কথা ছেড়ে দে, সে পালিয়ে গেছে—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—পালিয়ে গেছে মানে ?

ফুটু বললে—আসলে একটা জানোয়ার তো, জানোয়ারের আর কত বুদ্ধি হবে ? এখানে পেট ভরে খেতে পাচ্ছিল না, পালিয়ে যাবে না তো কী করবে ? পালিয়ে গেছে বেশ করেছে, আমি খুব খুশী হয়েছি—

—কোথায় পালিয়েছে ?

ফুটু বললে—বৈকুণ্ঠর কথা থাক, আমারও আর ভাল লাগছিল না ওকে নিয়ে। দিনরাত কেবল পেছন পেছন ঘুরঘুর করলে মানুষ কাজ করতে পারে ?

বললাম—তোর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ফুটু বললে—তুই ঘুমো, আমি আসছি, আমার অনেক কাজ আছে—

কিন্তু সেদিন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন আমি একটু ভালো হয়ে উঠেছি। সেদিন প্রথম ভাত খাবো। ফুটুর মা গরম জল করে দিয়েছে। স্নান করে মেঝের ওপর ভাত খেতে বসেছি। গরম ভাত। অনেক দিন পরে ভাত খেতে পাবো। আনন্দে চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন এক হাঁড়ি ভাত খেয়ে ফেলতে পারি।

কিন্তু খেতে গিয়ে আর খেতে পারি না।

ফুটুর মা বললে—এ কি বাবা, তুমি খাচ্ছো না যে ?

বললাম—আর খেতে ভাল লাগছে না মাসিমা—

ফুটুর মা বললে—সে কী, ফুটু যে তোমার জন্যে এই সরু চাল যোগাড় করে নিয়ে এল ! তুমি আজ ভাত খাবে বলে কাল থেকে চালের জন্যে ঘুরেছে। পুরোনো চাল চাই।

জিজ্ঞেস করলাম—ফুটু কোথায় ?

ফুটুর মা বললে—সে তো ভোর-রাত্তিরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে।

—আজকাল অত সকালে বেরোয় ফুটু ?

ফুটুর মা বললে—অত সকালে বেরোয় আর রাতদুপুর করে বাড়ি ফেরে।

—কেন, রাতদুপুর পর্যন্ত কী করে ?

ফুটুর মা বললে—যেমন করে হোক গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগার করবার চেষ্টা করে। তোমার অসুখের সময় কম খেটেছে ও ?

জিজ্ঞেস করলাম—আর বৈকুণ্ঠ? বৈকুণ্ঠকে আর দেখতে পাচ্ছি নে কেন মাসিমা?

মুটুর মা বললে—বৈকুণ্ঠকে কী করে দেখতে পাবে বাবা? সে তো আর নেই।

—নেই মানে? পালিয়েছে বুঝি? খেতে না পেয়ে পালিয়েছে?

মুটুর মা বললে—তাকে তো মুটু বিক্রি করে দিয়েছে—

—বিক্রি করে দিয়েছে?

—হ্যাঁ, বাজারের কশাইয়ের কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। তখন কত বলেছি বিক্রি করতে, তা করলে না। তখন আমাদের যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছে। এখন তোমার অসুখ, তাই ডাক্তারের পয়সা যোগাড় করবার জন্যে নিজেই তাকে বিক্রি করে দিলে—

কথাগুলো শুনে আমার সেই অসুস্থ শরীরটার ভেতরে সব যেন একটা ওলট-পালট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনেক বড় বড় স্বার্থত্যাগের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। দেশের জন্যে, দশের জন্যে, নারীর জন্যে, প্রেমের জন্যে ত্যাগের দৃষ্টান্তের অভাব নেই কোথাও। চৈতন্যদেব ছাত্রজীবনে একটা ন্যায়-শাস্ত্রের বই লিখেছিলেন। বহু পরিশ্রমের ফল সে-বই। নদীপথে যেতে যেতে তাঁর এক বন্ধুকে বললেন সেকথা। পাণ্ডুলিপিটা দেখালেন তাঁর বন্ধুকে। কিন্তু তাই দেখে বন্ধুর মুখ শুকিয়ে গেল।

চৈতন্যদেব অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি শুনে কষ্ট হলো?

বন্ধু বললেন—না ভাই, কিন্তু আমিও যে বহু পরিশ্রম করে একটা ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখেছি। তোমার বইটা বেরোলে আমার বই কি আর কেউ পড়বে? তোমার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কি আমার তুলনা?

চৈতন্যদেব খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। আমি আমার বইটা এই নষ্ট করে ফেলছি—

বলে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন সে-পাণ্ডুলিপি। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সেই ফলশ্রুতি চিরকালের মতন নদীস্রোতে তলিয়ে গেল।

হয়ত এ কিংবদন্তী। হয়ত এর পেছনে ঐতিহাসিক কোনও ভিত্তি নেই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই কাহিনী প্রচার করেই তো শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করে। কিন্তু আসলে এ মাহাত্ম্য, না অপরাধ! সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে একজনের কাছে বন্ধুকৃত্য করা—একে কি ত্যাগ বলবো, না প্রবঞ্চনা? তাহলে প্রশ্নটা ওঠে—ব্যক্তি বড়, না ব্যষ্টি বড়!

কিন্তু মুটুর ত্যাগ? সেই খোঁড়া মুটবিহারী তার পোষা বৈকুণ্ঠকে কশাই-য়ের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল কোন্ মহৎ ত্যাগের প্রেরণায়? আমি তার কেউ না। আমার জন্যে সে-ত্যাগের মাহাত্ম্য গৌড়ীয় কোনও সমাজই সগৌরবে কীর্তিত করবে না। তাছাড়া তার ত্যাগের দ্বারা বৃহত্তর মনুষ্য-সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ মহত্ত্বের তুলনা রামায়ণে-মহাভারতে থাকতে পারে, কিন্তু এযুগে কোথায় পাবো এমন দৃষ্টান্ত? দেখেছি তো এতদিন। কংগ্রেসের চার আনার ভলান্টিয়ার হয়েও দেখছি, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েও দেখেছি, আবার এখন একটা স্টেটের চিফ মিনিস্টার হয়েও দেখছি। এই যে রথীন সিকদার আর কেষ্ট হালদারের ঝগড়া। কে নমিনেশান পাবে তাই নিয়েই এত খোশামোদ আর এত ভয় দেখানো। একজনের মাছের ভেড়ির টাকা আর একজনের শুঁড়িখানার। টাকা দিয়ে লীডার হতে চায় ওরা। আর শুধু ওদের কথাই বা বলি কেন। ওই যে রেল-স্টেশনের রসগোল্লার ভেণ্ডার, সেও তো নিজের হাতে তৈরি রসগোল্লা খাইয়ে সার্টিফিকেট নিতে এসেছিল।

একবার একজন সাহিত্যিকও এসেছিল সার্টিফিকেট নিতে। বেশ নাম-করা সাহিত্যিক। শুনেছি বই-টই তাঁর বিক্রি হয়।

জ্যোতির্ময় সেন তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—আপনিও শেষকালে?

শেষকালে সব শুনে বলেছিলেন—দেখুন, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ওঁদের লেখা বইয়ের পর আর কোনও বই আমি পড়িনি, পড়বার সময়ও পাইনি—। আপনি লিখছেন, ভালো কথা। হয়ত আপনিও একজন বড় লেখক। কিন্তু আপনি কেন তদ্বির-তদারক করতে আসবেন? আপনার আসাটা ভালো দেখায় না—

সাহিত্যিক বললেন—আপনাদের কাছে আসবো না তো কার কাছে আসবো? সে-যুগে রাজা-বাদশারা শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের ভরণপোষণ

করতেন, তাঁদের জায়গায় এখন আপনারাই হয়েছেন দেশের কর্ণধার, এখন আমাদের কর্ণ ধারণ করবেন আপনারা—আপনারা আমাদের না দেখলে কে দেখবে ?

রসিকতার সুরে বললেও জ্যোতির্ময় সেন কথাগুলোর গূঢ়ার্থ বুঝেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—আপনি বাড়ি যান, আমি যা করবার তা করবো—

তারপর এডুকেশন সেক্রেটারিকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, সে-বছরের রবীন্দ্র-পুরস্কারটা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে।

এডুকেশন সেক্রেটারি তবু একবার বিনীত সুরে বলেছিলেন—কিন্তু স্যার, কমিটির মেম্বাররা যদি বেঁকে বসেন ?

জ্যোতির্ময় সেন বলেছিলেন—কমিটি-কমিটি থাক, আমি যা বলছি তাই করো—

তা হলোই তাই। তিনিই সে-বছরে সেই পুরস্কার পেলেন। তাতে কেউ কি কিছু বলেছিল ? আর বললেই বা কী ? যতক্ষণ আমি আমার চেয়ারে বসে আছি, ততক্ষণ কে কী বলবে ?

কিন্তু কথাটা তা নয়। যে-যুগে মানুষ নির্লজ্জ হয়ে গেছে, যে-যুগে মানুষ সামান্য গোড়াকার সততাটুকু পর্যন্ত সমূলে বিসর্জন দিয়েছে, সে-যুগে এমনি করেই তো আত্মীয়তোষণ আর আত্মীয়পোষণ করতে হয়। সত্যিই এক-এক সময় তাঁর মনে হতো এই চেয়ারে না বসলে বোধ হয় তিনি মানুষের নীচতা-হীনতাকে এমন করে নির্লজ্জ ভাবে দেখবার সুযোগ পেতেন না। এই যে শুঁড়িখানার মালিক কেষ্ট হালদার আর মাছের ভেড়ির মালিক রহিম সিকদার আজ যেমন-তেমন করে ঘুঁষ দিয়ে ভয় দেখিয়ে ক্যাবিনেটে ঢোকবার নমিনেশান চাইছে, এদের সঙ্গে ওই সাহিত্যিকটারই বা তফাত কোথায় ? আজ না হয় তিক্ষে করেই প্রাইজটা নিলে। কিন্তু প্রাইজ না পেলে কালই তো আবার সে কমিউনিস্ট পার্টিতে গিয়ে কংগ্রেসকে গালাগালি দেবে।

কিন্তু এমনি করে কত লোককে সার্টিফিকেট দেব ? কত লোককে চাকরি দেব ? কত লোককে ক্যাবিনেটে নেব ? কত লোককে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেব ? কত লোককে দাতব্য করলে তবে আমার পার্টি ইনট্যাক্ট থাকবে ? কী করলে আমার চেয়ারে আমি বহাল ভবিষ্যতে থাকবো ?

অথচ এদেরই পাশে গ্রামের একটা নিরক্ষর মানুষের ছেলে হুটু। সেই হুটু তো কখনও কোনও দিন তাঁর কাছে আসেনি। কোনও দিন তো সে একবার

বলেনি—জ্যোতি, তুই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিস, আমার জন্যে একটা কিছু কর্—

কিন্তু যদি সত্যিই সে আসতো? যদি সত্যিই সে এসে তেমন অনুরোধ করতো?

যদি সে এসে বলতো—আমি তোর চিকিৎসার জন্যে আমার বৈকুণ্ঠকে কশাই কলিমুদ্দীনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, আর তুই আমার জন্যে কিছুই করবি নে?

কবেকার সে-সব ঘটনা। সময়টা যেন এরোপ্লেনের চাকায় গড়িয়ে চলে গেছে। ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে গড়িয়ে গেছে সময়। এই জেট-যুগে সময়টা সত্যিই যেন জেট-প্লেনের মত পালিয়ে গেছে। এতদিন ময়নাডাঙার কথা ভাববার সময়ই পাননি তিনি। এই চেম্বারে বসার পর থেকেই এক হাতে পার্টি ঠিক রাখতে হয়েছে, দিল্লির কর্তাদের মেজাজ ঠিক রাখতে হয়েছে, আবার এক হাতে শাসন করতে হয়েছে প্রজাদের। প্রজারাও তো আর আগেকার প্রজাদের মত নিরীহ প্রজা নয়।

আর শুধু কি ওরা? আমি যাদের বেছে বেছে আমার ক্যাবিনেটে নিয়েছি, তারাই আবার একটু পান থেকে চুন খসলেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে!

কিন্তু হুটু তো এদের মত নয়। সে-ই আমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী। তার কানে কি আর যায়নি আমার এই চিফ মিনিস্টার হওয়ার কথা! কেন সে একবার এলো না!

কিংবা হয়ত এসেছিল। চাকরি বা খয়রাতি চাইতে না হোক, অন্ততঃ দেখা করতেই হয়ত এসেছিল। খবরের কাগজে তো আমার ছবি রোজই বেরোয়। আমার নাম, আমার লেকচার, সবই ছাপা হয় রোজ রোজ। আমার নাম জানে না এমন লোক কজন আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে! নিজে সে পড়তে না জানলেও লোকের মুখে তো নিশ্চয় শুনেছে। শুনে হয়ত রাইটার্স বিল্ডিং-এ এসেছিল!

হয়ত এসে জিজ্ঞেস করেছে—চিফ মিনিস্টার কোন্ ঘরে থাকেন?

সিকিউরিটি পুলিস জিজ্ঞেস করেছে—তুমি কে? তাঁর সঙ্গে কেন দেখা করতে চাও?

হুটু বলেছে—তিনি আমার বন্ধু।

—বন্ধু!

ভুটুর চেহারা দেখে চিফ মিনিস্টারের বন্ধু বলে কে ভাবতে পারবে। কে বিশ্বাসই বা করবে।

বলেছে—ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে—

ভুটু তবু কাকুতি-মিনতি করেছে—তাঁকে একবার খবর জানান আপনারা—

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা তো পোশাক-নির্ভর! পোশাকের মূল্যের তারতম্যের ওপরেই তো খাতির আপ্যায়নের বেশি-কম নির্ভরশীল। তার নামই টাকা। টাকার সঙ্গে পোশাকের নিবিড় সম্পর্কের কথা কে না জানে! পোশাকই তো চাপরাস। সেকালের চাপরাস ছিল পৈতে, আর একালের চাপরাস পোশাক। আমার রাইটার্স বিল্‌ডিং-এ কে কত মাইনে পায় তা আমি জানি। আমি যে তাদের ভালো মাইনে দিতে পারি না তাও আমি জানি। কিন্তু যদি মাইনে বাড়িয়েই দিই তো তাতে কি তাদের সংসারযাত্রার সুরাহা হবে? হয়ত তা হবে না। সুরাহা হবে পোশাক-পরিচ্ছদের। একজন কেরানী অন্তত আড়াইশো টাকার পোশাক অঙ্গে ধারণ করে অফিসে আসে। আমার পোশাকের চেয়েও দামী তাদের পোশাক। সেইজন্যেই বোধ হয় আজকের মানুষকে চিন্তাবিদ্‌রা বলে 'Nonbeing'। স্যার পি. সি. রায় যখন গান্ধীজীকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন তখন গেটের টিকেট-কালেক্টার তাঁকে প্ল্যাটফরমে ঢুকতে দেয়নি। ওই পোশাক দেখেই কাশীর পাণ্ডারা বিশ্বনাথের মন্দিরে গান্ধীজীকে অপমান করেছিল।

ভুটু তো আর স্যার পি সি. রায় নয়। মহাত্মা গান্ধীও নয়। নিরক্ষর বাংলা দেশের নিচু জাতের মানুষ। সে প্রতিবাদ করেনি। চিঠি দিয়েও সে-কথা তার জ্যোতিকে জানায়নি।

তা হোক, আজকে জ্যোতির্ময় সেন সেই ভুটুর সঙ্গেই দেখা করবেন। দেখা করে তার অতীতের সব অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেবেন

বলবেন ভুটু, আমি সে-সব কথা ভুলিনি ভাই। তুমি আমার জন্যে কী করেছ তা সব আমার মনে আছে—, শুধু কাজের চাপে আর নিঃশ্বাস ফেলতে পারিনি। বিশ্বাস করো, শুধু কাজের চাপে—

তা ভুটুই বা কী করে বুঝবে চিফ মিনিস্টারের কত দায়িত্ব, কত দুর্ভাবনা! ভুটুর মত লক্ষ লক্ষ ভুটুর কথা যে তাঁকে ভাবতে হয়। বাংলা দেশে ভুটু কি একজন! আর তাছাড়া একজন ভুটুর কথা ভাবলে তো তাঁর

চলবে না। হুটুকে বেছে বেছে চাকরি দিলে পার্লামেন্টে কোশ্চেন উঠবে। অপোজিশান-পার্টি দুয়ো দেবে। সে দিকটাও তো দেখতে হয় তাঁকে।

মনে আছে সেদিন হুটু আসতেই জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ রে হুটু, তুই বৈকুণ্ঠকে কশাইখানায় বিক্রি করে দিয়েছিস?

হুটু যেন সে-কথা শুনতেই পায়নি। জিজ্ঞেস করলে—ভাত খেয়েছিস?

বললাম—তুই আমার জন্যে যা করলি হুটু, তা আমি জীবনে ভুলবো না—

হুটু বললে—তুই ভাত খেয়েছিস কি না তাই বল্ না আগে?

বললাম—সত্যি হুটু, বল্ না, বৈকুণ্ঠকে বেচে দিতে তোর একটুও মায়া হলো না--

হুটু বিরক্ত হয়ে উঠলো—নাঃ, আমি এখনও ভাত খাইনি তা জানিস?

—তা তুই ভাত খেয়ে আয় না; তোকে ভাত খেতে কে বারণ করছে? কিন্তু বৈকুণ্ঠকে তুই কী বলে কশাইখানায় বেচে দিলি?

হুটু হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। বললে—এই অবেলায় আমাকে কাঁদিয়ে তোর কী লাভ হলো বল্ তো? আমি যত ভুলে থাকতে চাইছি···

বলে আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এক নিমেষে সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হলো যেন সে আমার সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো।

জ্যোতির্ময় সেন প্রথমেই মুখ খুললেন। বললেন—বলুন, আপনারা কী বলবেন?

চারজনের মধ্যে একজন যেন বেশি মিষ্টিমুখ। বললে—আজকে এখানে যে কৃষিজীবী কন্‌ফারেন্স হচ্ছে তা কাদের উপকারের জন্যে, তা আমরা জানতে চাই।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—যারা কৃষিজীবী তাদের উপকারের জন্যে।

—কিন্তু কারা কৃষিজীবী? কাদের আপনি কৃষিজীবী বলেন? যারা চাষ করে তারা, না যারা জমির মালিক তারা?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কন্‌ফারেন্সেই তার আলোচনা হবে। আপনারা

কি এই কথা বলবার জন্যেই স্লোগান দিতে দিতে আমার কাছে এসেছেন ? না যাতে কন্‌ফারেন্স পণ্ড হয় তার জন্যে আপনাদের এই মিছিল ?

—আমরা শুধু জানতে চাই এই কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য কী ?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—উদ্দেশ্য হলো আমি জানতে চাই কৃষিজীবীদের কী সমস্যা, কী তাদের অভাব আর অভিযোগ। সরকার যে কৃষিখাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে তাতে সে সমস্যার কতখানি সমাধান হচ্ছে।

একজন মুখপাত্র বললেন—সেটা জানতে গেলে কি লাখ-লাখ টাকা খরচ করে কন্‌ফারেন্স না করলে জানা যেত না ?

—তা দশজনকে সচেতন করে তুলতে হলে কন্‌ফারেন্স তো করতেই হবে। পৃথিবীতে সব দেশে তো তাই-ই হয়।

—পৃথিবীর সব জায়গাতে যা হয় হোক, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে তা তো হয় না। ইণ্ডিয়ার মত গরীব দেশের পক্ষে এই কন্‌ফারেন্স কি বিলাসিতা নয় ?

জ্যোতির্ময় সেন রেগে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাগলে রাজনীতি করা চলে না। বললেন—কৃষিজীবীদের জন্যে যা-কিছু করা যাক, কিছুই বিলাসিতা নয়। এখন কৃষির জন্যে আমরা সবকিছু ব্যয় করতে প্রস্তুত।

—কিন্তু এই যে কন্‌ফারেন্সের জন্যে কয়েক লাখ টাকা খরচ হলো, এর কতটুকু চাষাদের পকেটে গেল, আর কতখানি গেল চোরাকারবারীদের পকেটে তা আপনি জানেন ?

—তা বৃহৎ কাজে কিছু কিছু নষ্ট হবে না ? বিয়েবাড়িতে যে অসংখ্য লোকের নেমন্তন্ন হয়, ভিখিরিরাও তো তার কিছু ভাগ পায়।

আর একজন মুখপাত্র এতক্ষণে মুখ খুললেন।

বললেন—কন্‌ফারেন্সের ভেতরে টিউবওয়েল বসাবার জন্যে দেড় লাখ টাকার কনট্রাক্ট যে দেওয়া হয়েছে সে কি এখানকার কোনও কৃষককে দেওয়া হয়েছে, না এখানকার ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শশী মাইতিকে দেওয়া হয়েছে ?

—সে তো আমি বলতে পারবো না। ফাইল আমার কাছে নেই। ইরিগেশন মিনিস্টারকে জিজ্ঞেস করতে হয়—

—আর বাঁশ ? সত্তর হাজার টাকার বাঁশের কনট্রাক্ট কাকে দেওয়া হয়েছে জানবার জন্যে কোন্ মিনিস্টারকে জিজ্ঞেস করতে হবে ?

পাশের ভদ্রলোক বলে উঠলো—আরো জানতে চাই, এখানকার সদর হাসপাতালের এম-বি ডাক্তারকে যে তিন লক্ষ টাকার টিনের কনট্রাক্ট দেওয়া

হয়েছে, সেও কি দেওয়া হয়েছে তিনি টিনের বিশেষজ্ঞ বলে, না তাঁর হাতে চল্লিশ হাজার রোগীর ভোট আছে বলে ?

হঠাৎ শঙ্কর ঘরে ঢুকলো।

শঙ্কর ঠিক যেন সময় বুঝেই ঘরে ঢোকে। জ্যোতির্ময় সেন তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। অর্থাৎ—কী বলতে চাও ?

শঙ্কর বললে—আরো লোক আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছে—

—কে তাঁরা ?

শঙ্কর বললে—কেষ্ট হালদার মশাই—আর…

—তিনি আবার কী চান ?

মনে পড়ে গেল কেষ্ট হালদারের কথাটা। রথীন সিকদার বলেছিল কেষ্ট হালদার নাকি মদের চোলাই কারবার করে। তাকে ক্যাবিনেটে নিলে নাকি ক্যাবিনেটের বদনাম হবে। কংগ্রেসের বদনাম হবে। সে নাকি মিনিস্টার কথাটা বানান করতেই পারবে না। কিন্তু বানান যদি না-ই করতে পারলো তাতে ক্ষতিটা কী ? ডেমোক্রেসীতে তো শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অধিকার আছে। পাগল না হলেই হলো।

আর টাকা! এক লাখ টাকা সে পার্টি-ফাণ্ডে দেবে। সেটাও কি কম! টাকা না হলে কি পার্টি চলে! মনে আছে যখন জ্যোতির্ময় সেন জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন একজন অর্ডিনারি ভলান্টিয়ার একটা প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা জ্যোতিদা, এই যে গান্ধীজী ক্যাপিট্যালিস্টদের কাছে এত লাখ লাখ টাকা নিচ্ছেন, যখন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেনডেন্ট হবে তখন তো সুদে-আসলে এ-সব তারা আদায় করে নেবে ? তখন ?

জ্যোতির্ময় সেন বলেছিলেন—আরে তোমার যেমন বুদ্ধি! ইণ্ডিয়া স্বাধীন হলে তখন ক্যাপিট্যালিস্টদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই হলো রাজনীতি। এখন সংগ্রাম চলছে তাই টাকা নেওয়া হচ্ছে—দেশ স্বাধীন হলে তখন তো আর চাঁদার দরকার হবে না—

সত্যিই এ হলো রাজনীতি। রাজনীতি যদি একটা নীতি হতো, তাহলে চাণক্য পণ্ডিত এত কূটবুদ্ধি হয়েও কেন বলবেন—'রাজনীতি বেশ্যা বারাঙ্গনা ইব—!' রাজনীতির নীতি কি কোনও একটা নির্দিষ্ট নীতি! সময় আর সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে যে-নীতি বদলায়, তারই নাম তো রাজনীতি। আজ

তোমার টাকা আর ক্ষমতা আছে বলে আমি তোমার শয্যাসঙ্গিনী, কাল আবার *যখন তোমার টাকা ফুরিয়ে যাবে তখন টাকা আর ক্ষমতাওয়ালা অন্য একজন* লোকের শয্যাসঙ্গিনী হবো আমি।

কিন্তু রাজনীতি যা-ই হোক, আমি তো বরাবর রাজনীতির সঙ্গে মনুষ্যত্বের সমন্বয় সাধন করতেই চেয়েছি। আমি চেয়েছি মানুষের ভালোই করবো। একক ভাবে নয়, সমষ্টিগত ভাবে। দুর্গত মানুষের কল্যাণ সর্বত্রই হবে আমার ব্রত। যেমন করে একদিন ব্রিটিশের আমলে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, এখন স্বাধীনতার আমলে ঠিক তেমনি করেই সংগ্রাম করবো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু ক'টা অন্যায় আমি রোধ করতে পেরেছি? অন্যায়ের প্রতিকারে ক'টা অফিসারকে আমি বরখাস্ত করেছি? এই যে এখানে ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান দেড় লাখ টাকার কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছে টিউবওয়েল বসানোর জন্যে, এই যে তিন লাখ টাকার টিনের কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে এই সদর হাসপাতালের এম-বি ডাক্তারকে, বাঁশের জন্যে সত্তর হাজার টাকার ঠিকে দেওয়া হয়েছে ওই রকমই কোনও পার্টিকে, এর প্রতিকার কি আমি করতে পারতাম না? কিন্তু প্রতিকার করতে গেলে যে আমাকেই সরে যেতে হতো, আমার জায়গায় অন্য কোনও লোক এসে এই জিনিসই চালিয়ে যেত বরাবর। আমি চলে গেলেও তো অন্যায়ের প্রতিকার হবার কোনও আশা নেই। আর আমার কথা ছেড়ে দিলেও পণ্ডিত নেহরু যে প্রাইম মিনিস্টার হবার আগে অত হম্বি-তম্বি করেছিলেন, তিনি কি পেরেছিলেন একটা অন্যায়েরও প্রতিকার করতে?

কিন্তু রাজা মনু কেমন করে পেরেছিলেন? তিনি যখন কোনও প্রতিকার করতে পারলেন না, তখন সিংহাসন সংসার মুকুট সব কিছু পরিত্যাগ করে তপস্যা করতে বনে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে মনুর না হয় মুক্তি হয়েছিল, মানুষের কি মুক্তি হয়েছে?

হয়ত হয়েছে। সকলের না হোক, কিছু লোকের মুক্তি হয়েছে হয়ত। মনু-সংহিতার ফলেই তো আমরা পেয়েছি চৈতন্যদেবকে, শঙ্করাচার্যকে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে, রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে, রবীন্দ্রনাথকে— আরো যে কত লোককে পেয়েছি তার কি হিসেব আছে।

তাহলে কি আমি মিনিস্ট্রি ছেড়ে দেব?

এই কন্‌ফারেন্সের খবর কালই বড় বড় করে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়

ছাপা হবে। আমার ছবি থাকবে ওপরে। তারপরে আমার সেক্রেটারির লিখে দেওয়া বক্তৃতা আমার নামেই ছাপা হয়ে বেরোবে। শুধু তাই নয়। এখন তো আমাকে খাতির করবার জন্যে সমস্ত বাংলা দেশের লোক তটস্থ, আমার কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্যে সবাই শশব্যস্ত, কিন্তু তখন ?

আশ্চর্য, এখন মনে হয় সেই দিনগুলোই ভালো ছিল। এই খ্যাতি, এই খাতির, এই খোসামোদের বাইরে সেই স্বাভাবিক সহজ জীবন। সত্যি নুটু, আজ তোমার সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন আমি তোমাকে আমার এখানে এই ঘরে ডেকে নিয়ে আসবো। পুলিস-ভলান্টিয়ার কেউ তোমায় কিছু বলবে না। তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলবো, কেন আমি সত্যিই সুখে নেই এখন। তোমাদের বাড়িতে সেই যে আমার অসুখ হয়েছিল, সেই যে তুমি আমার চিকিৎসার খরচ চালাবার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে, নিজের আদরের বৈকুণ্ঠকে পর্যন্ত বেচে দিয়েছিলে, সে আমি ভুলিনি! ভুলিনি বলেই এতকাল পরে আবার এসেছি। তোমার কাছে শুনবো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস। শুনবো এই কন্‌ফারেন্সের ফলে তোমরা কী পেয়েছ ? তোমাদের কী লাভ হয়েছে ? জানবো ডিস্‌ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যানদের টাকা হলে তোমাদের কী লাভ আর কী-বা ক্ষতি ? তাহলে কি আমি তোমাদের কিছুই উপকার করতে পারিনি ?

—তাহলে আমাদের কী জবাব দেবেন ?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আপনারা একটা লিখিত স্টেট্‌মেণ্ট দিন, আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে এর ব্যবস্থা করবো—

—কিন্তু আজকে যদি কন্‌ফারেন্স-প্যাণ্ডেলে গণ্ডগোল হয় তো আমরা কিন্তু নিরুপায় !

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—গভর্মেণ্ট শান্তি বজায় রাখতে চায়, এবং শান্তি যাতে বজায় থাকে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও গভর্মেণ্টের জানা আছে—

চারজন উঠে নমস্কার করে গেল। বললে—ঠিক আছে, নমস্কার—

জ্যোতির্ময় সেন ডাকলেন—শঙ্কর—

শঙ্কর সামনে এসে বললে—কী স্যার—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—পুলিস-সুপারকে একবার আমার কাছে ডেকে পাঠাও তো, আর এখানকার এস-ডি-ও মিস্টার রায়কেও আমার কাছে এখুনি ডেকে দাও—

—স্যার, কেষ্ট হালদার মশাই তো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।

—কী দরকার তাঁর জিজ্ঞেস করো তো? তিনি তো নমিনেশন পেয়ে গেছেন, আবার কেন এসেছেন?

—তিনি বলছেন তিনি একবার শুধু আপনাকে নমস্কার করেই চলে যাবেন।

জ্যোতির্ময় সেন চিৎকার করে উঠলেন—কেবল নমস্কার, নমস্কার, আর নমস্কার। বলি আমাকে নমস্কার করে কি তাঁর স্বর্গলাভ হবে? এদিকে একজন নমস্কার করবার জন্যে ধরনা দিচ্ছে, আর ওদিকে একদল প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে গেল। যাও, আগে এস-ডি-ও-কে খবর পাঠাও—শীগগির—

শঙ্কর বললে—সেই জন্যেই তো স্যার বলেছিলুম···একটা টেলিফোন লাইন···

কিন্তু ওদিকে তখন বাইরে তুমুল চিৎকার উঠেছে—গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না—

আমি জীবনে কি কারো কোনও ভালো করিনি? কারোর কোনও উপকার করিনি? আমি কি শুধুই স্বার্থপরের মত নিজের ক্ষমতা-বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়ে দেশ-সেবার ভান করেছি? জানি, যারা আমাকে সম্মান দেখায় তারা আমার চেয়ারের খোসামোদ করে। জানি, এই চেয়ার যেদিন থাকবে না সেদিন আমার চারপাশের লোকেরাও একে একে নিঃশব্দে সরে যাবে। জানি, এইটেই নিয়ম। কিন্তু তা বলে আমার সবটুকুই কি ফাঁকি? মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন দেবতা নই, এ তো জানা কথা। কিন্তু এই আমার মনটার মধ্যে কি সোনা কিছুই নেই? সবটুকুই খাদ? আর খাদ যদি থাকেই তো সে কি চোদ্দ ক্যারেট গোল্ড?

ছোটবেলা থেকেই লোকের কাছে শুধু প্রশংসা পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, খাতির খ্যাতি প্রীতি পেতেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এগুলো পাওয়া কি ভালো? আর পেলেও এত পাওয়া কি ঠিক? এই পেয়েই বোধ হয় না-পাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছি।

চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখ পাইনি বলেই হয়ত পাওয়ার মর্যাদা কখনও ঠিকমত দিতে পারিনি। দৈবক্রমে আমি শহরের মানুষ। এবং দৈবক্রমে শহরের বড়লোকের ঘরে আমার জন্ম। কিন্তু বড়লোকের সন্তান হয়ে জন্মেও কেন আমি সব ত্যাগ করার গৌরব অর্জন করতে পারলুম না। মনে মনে আমার গর্ব আছে আমি মহৎ। সবাই আমাকে মহৎ বলেই বর্ণনা করে, নিন্দুকও অবশ্য আছে। তা কারই বা নিন্দুক নেই? যারা আমার প্রসাদপুষ্ট তারা সে-নিন্দেকে আমল দেয় না। বলে—ওটা হিংসে। এখন খবরের কাগজের লোকরাও ঘোষণা করে—ওটা হিংসে। কিন্তু কেন তা করে তা আমি জানি। কারণ তারা আমার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী এবং প্রসাদপুষ্ট। আমি তাদের কাউকে ট্যাক্সির পারমিট দিয়েছি, কাউকে চাকরি, কাউকে বা অন্য কোনও রকম সুবিধে। আর খবরের কাগজ? ওরা তো আমারই হাত-ধরা। আমি সরকারী বিজ্ঞাপন যাকে দেব সে আমাকে নিন্দে করতে বিমুখ হবে। নুন খেলে তাকে আমার গুণ গাইতেই হবে। কিন্তু কত লোককে নুন খাওয়াই? আমার নুনের ভাঁড়ার কি অফুরন্ত?

এ তো গেল অন্য দিকের কথা। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। যেখানে আমি মানুষ সেখানে আমার তকমা নেই, আমার পদ-পদবী, খেতাব, পার্টি, সেক্রেটারি কিছুই নেই। সেখানে আমি জল-জ্যান্ত নিরুপাধি মানুষ। সেই মানুষটাকে কি কেউ দেখে? সেই মানুষটাকে কি কেউ কোনও দিন দেখবার চেষ্টা করেছে!

তা আর কেউ না দেখুক, আর কেউ না-দেখতে চেষ্টা করুক, নুটুও কি দেখেনি?

সে আমার পদ দেখেনি, পদবী দেখেনি, আমার রাইটার্স-বিল্‌ডিঙের সমারোহ জাঁক-জমক কিচ্ছুই দেখেনি, বা দেখতে পায়নি। কিন্তু আমার আমিটাকে সে তো অন্ততঃ দেখেছে।

সত্যিই নুটু বুঝেছিল আমি তার জন্যে কী-ই না করেছি—

মনে আছে আমার সেই অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর আমি যেন নুটুর আরো আপন হয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগলো নুটুর মত আপন-জন আমার আর কেউ নেই। আমার জন্যে যে তার বৈকুণ্ঠকে কশাইদের কাছে বেচে দিতে পারে তার ভালোবাসার ঋণ আমি যেন জীবনে শোধ করবার স্পর্ধা না করি।

ঝুটু বলতো—তুই কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিস ? তোর যদি আবার অসুখ হয় ?

আমি বলতাম—হোক, আমার একলা শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না—

ঝুটু রেগে যেত। বলতো—কিন্তু আবার অসুখ হলে আমি কিন্তু আর তোকে দেখতে পারবো না। আমার অত সময় নেই—

আমি বলতাম—তোকে দেখতে হবে না আর'।

—দেখতে হবে না মানে ? আমি না দেখলে কে তোকে দেখবে ? তোর কে আছে এখানে ? তখন তো সেই সব ঝুঁকি আমার ঘাড়েই পড়বে। তখন যেন কুঁই-কুঁই করে কাঁদিসনি—

আমি ঝুটুর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতাম। তখন আমার বয়েস কম। মানুষ-চরিত্র সম্বন্ধে তখন আমার এত জ্ঞানও ছিল না। কিন্তু বুঝতে পারতাম ঝুটুর কথাগুলোর পেছনে ভালবাসার আবেগ লুকিয়ে আছে। আমি কিছু বলতাম না আর। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ঘুরতাম। আমার মাথায় রোদ লাগলে ঝুটু বকতো—আবার রোদ লাগাচ্ছিস তো ?

বলতাম—ওতে কিছু হবে না—

—বেশ, তুই যত ইচ্ছে রোদ লাগা। আমি এখন কিছু বলবো না তো। তোর যখন আবার অসুখ হবে, তখন দেখিস কী করি।

—কী করবি ?

—তোর জন্যে আর আমি ডাক্তার ডাকবো না, ওষুধ কিনে আনবো না। তখন দেখবি কী হয়।

আমি ঝুটুর কথা শুনতুম, আর মনে মনে হাসতুম। ঝুটুর ওটা মনের কথা নয়। ঝুটু আসলে আমার ভালোই চাইতো। আমার শুভ-কামনাই করতো।

আর শুধু তো রোদ নয়, বৃষ্টিও আছে সঙ্গে সঙ্গে। বৃষ্টিতেও ভিজতুম, রোদেও পুড়তুম। তবু একবারও বাড়ির কথা মনে আসতো না। মনে হতো এই বেশ। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আমার যে অবস্থা ছিল, তার থেকে এ ভালো। এখানে খাওয়ার কষ্ট, থাকার কষ্ট, কিন্তু সেই ছোটবেলায় আমার ও-সব কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে হতো না।

কিন্তু আমার জন্যে ঝুটু আপ্রাণ পরিশ্রম করে চলতো দিনরাত। দিনরাত কীসে দুটো পয়সা আসে, তার চেষ্টা করতো। ঝগড়া করতো বিষ্টুবাবুর ইট-খোলায় গিয়ে। বাজারে গরুর গাড়ির খেপ নিয়ে রাগারাগি করতো

আমি কিছু বলতাম না। একে তো আমি তার ঘাড়ে বসে খাচ্ছি, তার ওপর যদি কোনও কথা বলি তো আরো রেগে যাবে সে। আর তার ওপরে বৈকুণ্ঠ তখন নেই, চিরদিনের সঙ্গী সেই বৈকুণ্ঠ। তার অভাবটা আমার মনে লাগতো। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতাম না। বৈকুণ্ঠর কথা উচ্চারণ করলে নুটু বোধ হয় আমায় সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলতো!

তা, আমার তখন কিছু করবারই ছিল না। নুটু যা বলতো তাই-ই মাথা নিচু করে মেনে নেওয়াই ছিল আমার কাজ।

কিন্তু একদিন এক কাণ্ড ঘটলো।

নুটু সেদিন বাজারে গেছে। আমি সঙ্গে আছি। নুটু তখন দর কষাকষি করছে ব্যাপারীদের সঙ্গে। আমি দোকানের গদি থেকে একটা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছি। খবরের কাগজ সাধারণতঃ ময়নাডাঙায় কেউ পড়তো না। ও-জিনিস চোখেও কেউ দেখতে পেত না। আর তখন ও-জিনিসের এত চলও ছিল না।

আর আজকাল খবরের কাগজের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তো কথা উঠেছে। খবরের কাগজ কি সত্যিই একটা দরকারী জিনিস? সাধু রামানন্দ তীর্থ বলেছিলেন—খবরের কাগজই এ-যুগে যত অশান্তির মূল। আঁদ্রে জিদ্ তাঁর জার্নালের এক জায়গায় লিখেছেন—আমি এ ক'বছর খবরের কাগজ না পড়ে খুব শান্তিতে আছি। আমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।

কিন্তু সেদিন সেই ছোটবেলাতেই মনে হলো খবরের কাগজ না থাকলে তো আমি কিছুই জানতে পারতুম না। খবরের কাগজ পড়বে কারা? যারা রাজনীতির চূড়োয় বসে আছে তারা খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারে তাদের অবস্থা কী, মানুষের মানদণ্ডের ব্যারোমিটারে তাদের পারা নামছে না উঠছে।

সাহা মশাইয়ের আড়তে তখন খদ্দেরের ভিড়। সাহা মশাই যত ব্যস্ত, তার সরকার কেদারও তত ব্যস্ত। কেদার সরকারেরও তখন কাজের কামাই নেই।

—তুই কে রে?

কেদার সরকার কাজের ফাঁকে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে জ্যোতির্ময় সেনকে।

—কী চাস্?

জ্যোতির্ময় সেন বললে—না, কিছু চাই না, এমনি···

—এমনি মানে ?

জ্যোতির্ময় সেন বললে—আমার বন্ধু হুটু এসেছে বাজারে। সে কাজ করতে গেছে, আমি এখানে একটু বসেছি খবরের কাগজ পড়তে—

কী জানি কেন, যেন দয়া হলো কেদার সরকারের। কিম্বা হয়ত দয়াও ঠিক নয়। এইটুকু শুধু জানতে পারলে যে ছোকরাটা লেখাপড়া জানে। হুটুর মত একেবারে গেঁয়ো ভূত নয়। সেই জন্যেই আর কিছু বললে না।

একটা ছোট নিচু তক্তপোশ। তার ওপরে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা। তারই ওপর খবরের কাগজটা পড়ে ছিল। অনেক দিন পৃথিবীর কিছু খবর পাওয়া যায়নি। পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা জায়গায় চোখটা আটকে গেল।

লেখা আছে—নিরুদ্দেশ—নিরুদ্দেশ। আর ঠিক তার নিচেয় জ্যোতির্ময় সেনের একটা ছবি।

বড় হেডিং-এর নিচে যা লেখা আছে তা দেখে আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। কলকাতা থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন বাবা যে তাঁর ছেলে সম্প্রতি বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ছেলের নাম জ্যোতির্ময় সেন। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। তাঁর ছেলের সন্ধান যদি কেউ দিতে পারেন তো তাঁকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে—ইতি—ইত্যাদি ইত্যাদি—

পড়তে পড়তে কেমন অভিভূত হয়ে গেলাম। এই তো আমি। যা এখানে আমাকে কেউ দেখতে পায় ? যদি কেউ আমাকে চিনতে পারে যদি এই ছবির সঙ্গে আমার চেহারার কেউ মিল খুঁজে পায় ?

চেয়ে দেখলাম কেদার সরকারের দিকে। এ-ছবিটা কেদার সরকার দেখেছে নাকি ? কিন্তু সে এত কাজে ব্যস্ত যে খবরের কাগজ পড়বার হয়ত সময় পায়নি সকাল থেকে। সাহা মশাইও তাই। খড় বেচা পয়সা সাহা মশাইএর। খড় বেচার দিকেই তার নজর বেশি। খবরের কাগজ রাখতে হয় তাই রাখা। তারপর কাজকর্ম শেষ হলে যদি সময় হয় তো খবরের কাগজের পাতাগুলোর ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেবে। তার আগে শুধু হিসেব। ময়নাডাঙার বাজারে খড়ের ব্যাপারী সাহা মশাইএর বেশি নজর খেরো খাতার হিসেবের দিকে। হিসেবে যেন কোথাও না ফাঁক থাকে। পৃথিবীর কোথাও ফাঁক থাকে তো থাকুক, আমার নিজের হিসেবের কাজ ঠিক থাকলেই হলো। হিসেবের বাইরে সাহা মশাইএর কোনও দিকে নজর থাকে না।

—অ ক্যাদার, এ ছেলেটা কী চায় গো?

কেদার তখন খড়ের খেপ গুনতে ব্যস্ত। বললে—আমারে কিছু বলছেন গা?

—হ্যাঁ, বলি এ কে? কী চায়?

জ্যোতির্ময় সেন বললে—না, আমি কিছু চাই না।

—চাও না তো বসে আছো কেন? খড় নেবে নাকি?

জ্যোতির্ময় সেন বললে—না। আমার বন্ধু ন্টু। ন্টু আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে বাজারে কাজে গেছে, তাই ···

—বাড়ি কোথায় তোমার?

—আজ্ঞে···

বলতে গিয়ে কেমন হোঁচট খেলাম। যদি পরিচয় দিলে আবার চিনে ফেলে!

বললাম কলকাতায়—

—কলকাতায়, তা এখানে কী করতে এয়েছ?

—আজ্ঞে, ন্টুর কাছে এসেছি।

—ন্টু? ওই দিগম্বরের ছেলে ন্টু? ন্টু তোমার কে হয়?

হঠাৎ বড় ভয় হলো আমার। খবরের কাগজখানা দেখেছে নাকি? হয়ত কয়েকদিন ধরেই ছবিটা বেরোচ্ছে। কয়েকদিন ধরেই নিরুদ্দেশের খবরটা ছাপা হচ্ছে।

আমি বললাম ন্টু আমার বন্ধু····

—বন্ধু?

বারকয়েক আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলে আমাকে সাহা মশাই। যেন সন্দেহ হলো। মনে হলো সাহা মশাই যেন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। দশ হাজার টাকার লোভ। আমাকে ধরিয়ে দিয়ে, আমার সন্ধান দিয়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কারের কথা ভাবছে।

সাহা মশাই বললে—আমার কাছে এসো তো—

জিজ্ঞেস করলুম—কেন?

—আরে, তুমি তে দেখছি বড় বেয়াড়া ছেলে হে! আসতে বলছি তোমাকে, আর বলে কিনা কেন?

এমন সময় ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ন্টু এসে হাজির।

বললে—আয় রে জ্যোতি—চলে আয়—

আমি আর কোনও দিকে না তাকিয়ে হুটুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

পেছন থেকে সাহা মশাই ছাড়ে না। ডাকলে—এই হুটু, হুটু, শুনে যা -

হুটু যাচ্ছিল সাহা মশাইএর দিকে। বললে – কী? বলেন?

- তোর সঙ্গে ও ছেলেটা কে রে?

আমি চুপি চুপি হুটুকে বললাম—হুটু চলে আয়—

হুটু শুনলো না আমার কথা। বললে— কেন? আপনার তা জেনে কী লাভ?

—বলছি ও তোর কে?

হুটু আগে থেকেই খেপ দেওয়া নিয়ে সাহা মশাইএর ওপর রেগে ছিল। বললে—ও আমার স্যাঙাৎ—

—তা স্যাঙাৎ তো বুঝলুম। কিন্তু ও তোর স্যাঙাৎ হলো কী করে? ওর বাড়ি কোথায়?

সাহা মশাইএর এত আগ্রহ তো ভাল নয়।

আমি আবার হুটুর গা টিপতে লাগলাম। বললাম—হুটু চলে আয়—

হুটু তবু আমার ইঙ্গিতটা বুঝলো না। সে সাহা মশাইএর দিকে চেয়ে বললে—এত খোঁজখবর নিচ্ছেন কেন? আপনি ওকে খেপ দেবেন?

—হ্যাঁ, দেব খেপ। ওকে ইদিকে আসতে বল্। আমি দেখি ওকে ভালো করে।

হুটু আমার দিকে চাইলে। বললে—চল্ না, কী বলে বুড়ো, শুনে আসি—

আমি বললুম—না, তুই চলে আয়—

হুটুকে টেনে নিয়ে আমি সেখান থেকে চলে এলুম। আমার যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। যদি আমাকে সাহা মশাই ধরিয়ে দেয়।

তার পরদিন থেকে ময়নাডাঙার বাজারের দিকে আর যাই না। অথচ হুটুকে সেখানে যেতেই হবে। হয় বাজারে নয়ত বিষ্টু সামন্তর ইটের খোলায়। আমি বলতুম—বাজারের দিকে আমি যাবো না ভাই—

হুটু বলতো—কেন রে, ওখানে তোর কী আছে?

আমি বললুম—না, তুই যা, আমি যাবো না—

ও যখন বাজারের রাস্তা দিয়ে কেতুপুরের দিকে যেতো আমি গাড়ি থেকে নেমে ঘুর-পথে খানিকটা হেঁটে গিয়ে আবার ওর গাড়িতে উঠতুম। কেতুপুরে

নতুন কোঠাবাড়ি উঠছিল। সেখানে ইঁট নিয়ে যেতে হতো গরুর গাড়ি করে। বাজার থেকে চুন-সুরকি নিয়ে ঢালতে হতো কেতুপুরে। কেতুপুরে নতুন কয়েকটা বাড়ি উঠছিল, সেদিকে গ্রাম সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছিল।

কিন্তু বাজারে আসতে হতো সকলকেই। দুদিন হাট বসতো ময়নাডাঙায়। একদিন মঙ্গলবার আর একদিন শনিবার। সেদিন যার কাজ থাকতো সেও আসতো, যার কাজ না থাকতো সেও আসতো। কলাটা মুলোটা বেগুনটা নিয়ে এসে বসতো চাষীরা, আর শহর থেকে ভেণ্ডাররা এসে সেই সব মাল পাইকিরি খরিদ করে নিয়ে যেত। দুটুর বাবা দিগম্বরও যেত হাটে। কাজ থাক আর না থাক, তবু যেত। ওই দিন ভিন্‌গ্রামে ইয়ার বক্সিদের সঙ্গে দেখা হতো। বিড়ি-টিড়ি খেতে পেতো মুফতে। সুবিধে হলে হাটের পর গাঁজাতেও দম দিতে পারতো।

সেদিন হাটের পর সাহা মশাই দেখতে পেয়েছে। বললে—কী রে দিগম্বর, কেমন আছিস ?

সাহা মশাই এমন করে কখনও ডেকে কথা বলে না দিগম্বরের সঙ্গে। একেবারে গলে জল হয়ে গেল দিগম্বর।

বললে—আর হুজুর, বেঁচে আছি কোনও ক্রেমে—

সাহা মশাই বিড়ি এগিয়ে দিলে। বললে—খা—

বিড়ি নয় তো যেন অমৃত। সাহা মশাইএর নিজের হাতে দেওয়া আস্ত বিড়িটা নিয়ে দিগম্বর গড় হয়ে একটা লম্বা পেন্নাম করে ফেললে।

বললে—হুজুরের দয়াতেই বেঁচে আছি আজ্ঞে—

—তা তুই তো বেঁচে আছিস, কিন্তু তোর ছেলেটা তো মস্ত লায়েক হয়ে গেছে দেখছি—

দিগম্বরও সাহা মশাইএর কথায় সায় দিলে। বললে—ও শালার কথা আর বলবেন না হুজুর, ও শালা একেবারে গোল্লায় গেছে।

সাহা মশাই বললে—কাউকে আর ভক্তি-ছেদ্দা করে না। সেদিন ডাকলুম তা জবাবই দিলে না কথার !

দিগম্বর বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আরে আপনি তো হলেন গিয়ে হুজুর-মানুষ, আমি হলুম গিয়ে তার জন্মদাতা বাপ, আমার কথাই শোনে না—

—তা অমন ছেলেকে বাড়ি থেকে খেদিয়ে বার করে দিতে পারিস নে ?

দিগম্বর বললে—আমি তো ওকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলুম হুজুর, কিন্তু ওর গর্ভধারিণী যে কথা শুনতে চায় না।

—তা তুই অমন ছেলের গর্ভধারিণীর কথা শুনিস কেন? তুই হলি বাড়ির কর্তা, তুই বড়, না তোর ছেলের গর্ভধারিণী বড়?

দিগম্বর বললে—ওই বলে কে হুজুর! আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি সব বোঝেন, ও শালার মেয়েমানুষদের কি বুদ্ধি আছে? ও শালারা ঝাড়ে বংশে খারাপ। সেইজন্যেই তো হুজুর আমি বাড়িতে থাকি না।

সাহা মশাই অবাক হয়ে গেল।

—তুই বাড়িতে থাকিস নে?

দিগম্বর বললে—না—বাড়ি না নরক কুণ্ডু—

—তাহলে কোথায় থাকিস?

দিগম্বর বললে—যেখানে খুশি। কখনও শ্মশানে, কখনও মশানে, কখনও হাটে-বাজারে, আবার কখনও এর-ওর-তার দাওয়ায়। আমার থাকার কোনও ঠিক-ঠিকেনা নেই হুজুর—

—তা তোর ছেলের সঙ্গে ও কে ঘোরে রে?

দিগম্বর বললে—ওই এক হারামজাদা জুটেছে এসে—

—কে ও?

দিগম্বর বললে—কে জানে হুজুর! কাজ-কম্মো করে না, কেবল ভাত গেলবার কুমীর! ওই শালার জন্যেই তো বাড়ি ত্যাজ্য করেচি আমি—

—ও কোত্থেকে এল?

দিগম্বর বললে—ওই কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যাবেও না, আবার গতরেও খাটবে না।

—তা ওর বাড়ি কোথায় তুই জানিস না? কার ছেলে? কেন এল এখেনে, কিছুই জানিস না?

দিগম্বর বললে—বলে তো কলকাতায় বাড়ি, বড়লোকের ছেলে—

—তা বড়লোকের ছেলে তো তোর এখানে পড়ে আছে কেন?

দিগম্বর বললে—সেই কথাই তো আমি বলি আমার ছেলেকে। আমার ছেলে শালাটা তো আবার একটা হারামজাদা।

—ছেলে কী বলে?

দিগম্বর বললে—ছেলে সে-কথার হুজুর কোনও জবাব দেয় না। আমার

ছেলেটা কি মানুষ ? মানুষ নয় হুজুর, হারামজাদা, একটা আস্ত হারামজাদা।

সাহা মশাই আরো একটা বিড়ি এগিয়ে দিলে। বললে -আর একটা বিড়ি খা দিগম্বর। তোর তো দেখছি কপালটা খুব খারাপ—

দিগম্বর বললে —আজ্ঞে কপালটা আমার ফাটা কপাল হুজুর। সাধে কি বলি আপনাকে একটা কাজ-কম্মো দিন আমাকে, আমি আপনার চরণের দাস হয়ে থাকবো—

—দোব, তোকে একটা চাকরি দেবো আমি। তোর মতন লোক উপোস করে মরবে, তা তো ভাল কথা নয়, তুই আমার এখানে থাক্। আর কাজকর্ম যা হয় করিস—

দিগম্বর হাত বাড়িয়ে সাহা মশাইএর পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালে।

—আহা-হা, করিস কী! থাক্, থাক—

বলে পা দু'টো আরো ভালো করে বাড়িয়ে দিলে সাহা মশাই।

—তোর ছেলেটাকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসতে পারিস ?

দিগম্বর বললে —তা আনবো, যেমন করে পারি আনবো— ।

—আর ওই ছোকরাটাকেও—

হঠাৎ শঙ্কর এসে ঘরে ঢুকলো। আর পেছনে পেছনে মিস্টার রায়। ময়নাডাঙার এস-ডি-ও।

—নমস্কার স্যার!

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—নমস্কার। বসুন।

মিস্টার রায় বসলেন।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—বাইরে গোলমাল হচ্ছে দেখছেন তো ? আজকের কনফারেন্সে যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় তার জন্যে আপনি কী স্টেপ নিয়েছেন ?

প্রথম যখন ক্যাবিনেট তৈরী হলো তখন কাকে কোন্ দফ্তর বিলি করবো সেইটেই আমার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাস্টবিনে এঁটোকাঁটা নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি হয় ভিখিরিদের মধ্যে, বরাবর মন্ত্রীদের দফতর নিয়েও ঠিক তেমনি হতো। কিন্তু কৃষি-দফ্তরটা কখনও কেউ পছন্দ করতো না। কারণ ওতে নাকি ইজ্জত নেই। মন্ত্রীদের মধ্যেও দেখেছি ইজ্জতের

তারতম্য হয় দফ্‌তরের তারতম্য নিয়ে। যার হাতে স্বরাষ্ট্র তার ইজ্জত সব চেয়ে বেশি। আবার যার হাতে কৃষি তার ইজ্জত সব চেয়ে কম। অথচ মাইনে, সম্মান, সুযোগ-সুবিধে সকলেরই সমান। এ যেন অনেকটা সেই ইংরিজীতে এম-এ আর বাংলাতে এম-এর তারতম্যের মত। তুমি এম-এ পাস করেছ স্বীকার করি কিন্তু কোন্ বিষয়ের এম-এ? মন্ত্রীদের বেলাতেও তাই। তুমি মন্ত্রী হয়েছ স্বীকার করি কিন্তু কোন্ দফ্‌তরের মন্ত্রী? যদি শুনি কৃষি-দফ্‌তর তাহলেই 'তাচ্ছিল্যের প্রকাশ ঘটবে আমার মুখে। এ সর্বত্র। কোনও মন্ত্রীর ছেলে-মেয়ে ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজে পড়ে না। তারা পড়তে যায় আমেরিকা কিম্বা ইউ-কে'তে, ভারতবর্ষে লেখা-পড়া করলে ছেলেদের বাবাদের ইজ্জত চলে যায়। লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

তা সে-কথা যাক, আমি কিন্তু গোড়াতেই কৃষি-দফ্‌তরের ভারটা নিয়ে নিয়েছিলুম।

সবাই জিজ্ঞেস করলে—এ কী করলেন জ্যোতিদা? এতে যে আপনার ইজ্জত যাবে!

এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিইনি। কিন্তু কেন যে আমি কৃষি-দফ্‌তরটা নিজের হাতে নিয়েছিলাম তা আর কেউ না জানুক, আমার অন্তর্যামী তো জানতো।

তা মিস্টার রায় পাকা এস-ডি-ও। জ্যোতির্ময় সেন বেছে বেছে মিস্টার রায়কেই এই জেলায় পোস্টিং করেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংএ ডেকে এনে তখন নানারকম উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বড় পুওর ডিসট্রিক্ট ওটা, আমি চাই আপনি ওই জেলাটা ভাল করে শাসন করবেন।

চীফ সেক্রেটারী বলে দিয়েছিলেন—দেখবেন মিস্টার রায়, চীফ মিনিস্টার বেছে বেছে আপনাকেই ওখানে পোস্টিং করছেন। তিনি চান আপনি ওখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশানে যেন একটু স্পেশ্যাল কেয়ার নেন—

উদ্দেশ্য তো সকলেরই সৎ ছিল। কিন্তু যা বাইরে থেকে সৎ বলে মনে হয়, তা কাজে কি সব সময় সৎ হয়ে থাকে? সৎ কাজ করছি বলে আমরা প্রতিদিন কত অসৎ কাজ করে থাকি। আমরা কি অপরাধীকে মুক্তি দিতে পারি? যে আমার ক্ষতি করে তাকে ক্ষমা করতে পারি? হয়ত সত্যযুগে সে-সব সম্ভব ছিল। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন—তুমি বর নাও প্রহ্লাদ—

প্রহ্লাদ বললে—আপনার দর্শন পেয়েছি ঠাকুর, আর কিছুর আমার দরকার নেই—

ঠাকুর তবু ছাড়লেন না।

তখন প্রহ্লাদ বললে—যদি বর দেবেন তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের যেন কখনও কোনও ক্ষতি না হয় -

এই মন এই মানসিকতা নিয়ে আমি কী করে দেশ শাসন করবো? তাহলে তো দেশ চোর-জোচ্চোর গুণ্ডায় ভর্তি হয়ে যাবে! তবু আমি বিশেষ করে ময়নাডাঙার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম মিস্টার রায়কে। বলেছিলাম—দেখবেন যেন কংগ্রেসের বদনাম না হয়—

কারণ আমি দেখেছি ময়নাডাঙায় গরীবের ওপর বড় মানুষের অত্যাচার। একদিকে হুটুদের অর্থাভাব, আর একদিকে সাহামশাইদের শোষণ। ময়নাডাঙার কটা লোক খেতে পেতো পেট ভরে? শুধু কি দিগম্বর? দিগম্বরের মত আরো কত দিগম্বর সেখানে ছিল তাও আমি দেখেছি—

সেদিন সাহা মশাইএর মিষ্টি কথায় যেন দিগম্বর গলে গিয়েছিল।

দিগম্বর বলেছিল—হুটু আমার কথা শুনলে কি আমার ভাবনা?

সাহা মশাই বলেছিল—তা একবার আমার কাছে কোনও রকমে ডেকে আনতে পারিস নে? আমি তাকে একটা কাজ দিতুম। তোকেও কাজ দিতুম, তোর ছেলেকেও কাজ দিতুম—

দিগম্বর বলেছিল—তাহলে আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো হুঁজুর -

--তাহলে নিয়ে আয় তোর ছেলেকে।

তারপর আর সেখানে দাঁড়ায়নি দিগম্বর। একেবারে এক দৌড়ে বাড়ি চলে এসেছে—

—হুটু—হুটু—

চেঁচাতে চেঁচাতেই বাড়ি এসে ঢুকেছে দিগম্বর।

—কই, হুটু কই?

হুটুর মা রান্নাঘরে কাপড় সেদ্ধ করছিল। দিগম্বর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—হুটু কোথায় গো?

হুটুর মা বললে—তা জানি নে।

—কোথায় গেছে তুমি জানো না?

হুটুর মা বললে—আমি কী করে জানবো? সে কোথায় যায় তা কি আমায় বলে যায়? তুমি কখনও বলে গেছ?

দিগম্বর বললে—ইদিকে মহা সব্বোনাশ হয়ে গেছে, সা'মশাই সুটুকে খড়ের আড়তে চাকরি দেবে বলেচে। আজকে থেকেই চাকরি দেবে—

এতক্ষণে যেন সুটুর মা'র হুঁশ হলো।

—কেন গো, হঠাৎ চাকরি দেবে কেন?

দিগম্বর বললে - বড়মানুষ লোক, মনে দয়া হয়েছে, চাকরি দেবে না? আমি আজ সা-মশাইএর পা জড়িয়ে ধরলুম যে। বললাম—ছেলেটা বয়ে যাচ্ছে, একটা কাজ-কম্ম না দিলে আর চলছে না। আমরা বাড়িসুদ্ধ লোক উপোস করে মরছি—

—তা আজ থেকেই কাজ দেবে?

—তবে আর বলছি কী? আজ থেকেই, এখ্খুনি—

যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছে দিগম্বর। বললে আমি ছেলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি, আর তিনি আরাম করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন; ওই হারামজাদা বন্ধুটাই হয়েছে ওর কাল—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। বললে—যাই শালাকে খুঁজে আসি—

—বলে যেমন ঢুকেছিল, তেমনি আবার বেরিয়ে গেল।

সুটু সেদিন আর বাড়ি ফিরবে না মতলব করেছিল। সকাল থেকেই সে ঘুরছে চারিদিকে। আমিও ঘুরছি ওর সঙ্গে। সুটু বললে—চল্ এবার বাড়ি চল্—

বললাম- কিন্তু সাহা মশাই যদি ধরে?

সুটু বুঝতে পারলে না কিছু। বললে—কেন? সা'মশাইকে ভয় কিসের? সা'মশাইকে কি আমি পরোয়া করি ভেবেছিস? আমি কি সা'মশাইএর চাকর? চল্, আমি এখুনি সা'মশাইএর আড়তের সামনের পথ দিয়ে যাবো, দেখি ও কী করতে পারে—

আমি বললাম—তুই যা, আমি যাবো না—

তখন বিষ্টু সামন্তর ইট-খোলায় কাজ করছিল সুটু। মাথার শেষ মোট্টা নামিয়ে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছে। বলল—তুই যাবি নে কেন?

বললাম—সা'মশাই আমাকে দেখলেই ধরবে—

ন্টু বললে - তোকে ধরবে ? কেন ? তুই সা'মশাইএর কী করেছিস ? আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ কোনও শালা তোর কিছ্ছু করতে পারবে না। তুই আমার সঙ্গে চলে আয় –

বলে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে লাগলো।

আমি বললুম আমার হাত ছেড়ে দে তুই, আমি যাবো না—

আমি যত বারণ করি তত ও আমার হাত ধরে টানে।

ন্টু বলতে লাগলো আয় তুই আমার সঙ্গে, দেখি ও বেটা কী করতে পারে--

আমি বললুম - তুই ছাড় আমাকে, ছাড় —

ন্টু শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললে—তাহলে তুই আগে বল্ কী হয়েছে, কেন সা'মশাইএর আড়তের সামনে দিয়ে যাবি নে- বল্

বললুম তুই আমাকে একটা খবরের কাগজ দিতে পারিস ?

—খবরের কাগজ ? খবরের কাগজ কী হবে ? তুই খবরের কাগজ পড়তে পারিস্ ?

বললুম –হ্যাঁ, পড়তে পারি। যেখান থেকে হোক একটা খবরের কাগজ যোগাড় করে দে আমাকে। আজকের কাগজ--

ন্টু তখনও কিছু বুঝতে পারছে না। বললে তাহলে রেলের ইষ্টিশানে চল্, সেখানে মাস্টারমশাইএর কাছে খবরের কাগজ আছে --

তা তাই গেলাম। মাস্টারমশাই তখন রেলের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। একবার একটা টেলিফোন তুলে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা টেলিফোন বেজে ওঠে। কথা বলবার সময় নেই। কোথা থেকে সব গাড়ি আসবার খবরাখবর আসে আর মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—কে ?

খোঁড়া একটা চাষার ছেলেকে দেখে তারই মধ্যে জিজ্ঞেস করলে— কে তুই ? কী চাস ? এখন কোনও গাড়ি নেই কলকাতার ! যা --

ন্টু বললে— আজ্ঞে না, গাড়ির জন্যে নয়—

—গাড়ির জন্যে নয় তো কিসের জন্যে ? ভিক্ষে ? ভিক্ষে-টিক্ষে হবে না এখানে— এ সরকারী আপিস।

—আজ্ঞে তা নয়। আপনার কাছে খবরের কাগজ আছে ?

—খবরের কাগজ ? খবরের কাগজ তুই কী করবি ? খবরের কাগজ

পড়তে পারিস ? বেরো এখান থেকে, বেরো—

তবু বেরোয় না দেখে মাস্টারমশাই চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—লালধনি, ও লালধনি, কোথায় গেলি রে—

মনে আছে সরকারী কর্মচারীরা তখনও যেমন, এখনও তেমনি। অনেক ডাকাডাকিতেও লালধনি এলো না। মনে হলো লালধনি বোধ হয় রেলের পয়েন্টস্‌ম্যান হবে। কিংবা কোনও ক্লাস ফোর স্টাফ। মাস্টারমশাইএর কাজের জন্তেই তাকে রাখা। কিন্তু ডাকলেই যদি পাওয়া যাবে তাহলে আর সে রেলে চাকরি করতে এসেছে কেন ?

কিন্তু ততক্ষণে মাস্টারমশাইএর আবার টেলিফোন এসে গেছে। সেখানে কথা বলতেই ব্যস্ত।

হুটু বাইরে এসে বললে—না রে, চল্‌, খবর-কাগজ দেবে না আমাকে—চল্‌।

বললুম—কিন্তু এত বড় একটা গাঁ, এখানে খবরের কাগজ পাওয়া যাবে না ?

কী আর করা যাবে। উপায় নেই। স্টেশন-প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হুটু বললে—দেখেছিস তো বাবুরা গরীবদের মানুষ বলেই মনে করে না। সবাই অপগেরাজ্যি করে রে আমাদের—

বললাম—তোকে খবরের কাগজ দিলে তো ওর পয়সা খরচ হতো না। তবে দিলে না কেন ?

ভাবলাম, হয়ত তাই। কেনই-বা দেবে ? দিলে যে উপকার হবে মানুষের। বহুকাল পরে একবার রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছিলাম। এক জায়গায় লেখা আছে—অহঙ্কার হলে তার আর কিছু হয় না। অহঙ্কার কেমন জিনিস জানো ? যেমন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে, আর অঙ্কুর হয়। তারপর সেখানে গাছ হয়, আর তারপর হয় ফল।

কিন্তু অহঙ্কার কি আমিই ছাড়তে পেরেছি ? আজ মনে হয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আমিও বোধ হয় সেই স্টেশন-মাস্টারের মত সবাইকেই বার করে দিয়েছি ঘর থেকে। হুটুর ভাষায় 'অপগেরাজ্যি' করেছি গরীবদের। নইলে বাইরে থেকে কেন ওই চিৎকার আসছে—'গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না'। যদি তা না করতাম তাহলে তো ওরা আজ ফুলের মালা নিয়ে এসে আমার গলায় পরিয়ে দিত। নাকি সে-গ্রামও আর নেই, সেই মানুষও

আর নেই, সেই পৃথিবীও আর নেই। হয়ত তাই। কিংবা হয়ত তাই নয়। আমি যে-ময়নাডাঙায় আগে এসেছিলাম, সে-ময়নাডাঙাও হয়ত আর সেরকম নেই। সে ময়নাডাঙার মানুষগুলোও হয়ত আর তেমন নেই এখন। আজ এখন, এই বিকেলবেলা সভায় গিয়ে হয়ত দেখবো এখানকার সব কিছু বদলে গেছে। এখানে এখন রেডিও এসেছে, ট্রানজিস্টার এসেছে। এরা হয়ত এখন ছুঁচলো প্যাণ্ট পরে বোম্বাই-মার্কা হিন্দী ছবির গান গায়। বিড়ি ছেড়ে দিয়ে হয়ত এখন এরা সিগারেট ধরেছে। এরা এখন নিজেদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে শিখেছে। রাজনীতির বাঁধা বুলিগুলো যখন এসে পৌঁছেছে তখন অন্য উপসর্গগুলো আসবে না, তা কি হতে পারে? ট্রট্স্কি বলেছিলেন—'Every state is founded on force.' প্রত্যেক স্টেট্ যদি ক্ষমতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেখানকার মানুষেরও জোর-জবরদস্তি করবার অধিকার আছে। ম্যাক্স ওয়েবার বলেছেন—'The state is considered the sole source of the 'right' to use violence. Hence 'politics' for us means striving to share power or striving to influence the distribution of power, either among states or among groups within a state.' আদিযুগেও যেমন, এখনও ঠিক তেমনি। সেকালে দেশের রাজারা কাউকে জেলে পুরে, আবার কাউকে বা খেতাব দিয়ে নিজের বশে রাখতো। এযুগে আমরাও তাই করি। কাউকে জেলে পুরি, আবার কাউকে বা 'পদ্মশ্রী' পদবী দিই। উদ্দেশ্য সেই একই। সকলকে বশ করে নিজের তাঁবে আনা। যে এতেও বশ না হয় তাকে আমরা বিদ্রোহী বলি। বলি—'কমিউনিস্ট'। ক্ষমতা নিজের হাতে কায়েম করবার জন্যে আমরা যেমন বন্দুক উঁচিয়ে ধরে মুখে অহিংসার বাণী বলি, শান্তির বাণী বলি, তারাও তেমনি বলে—'গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না।' এ তো ক্ষমতার লড়াই। পৃথিবীর ইতিহাস মানেই তো ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস।

আজ এই কৃষিজীবী কন্‌ফারেন্সে সেই ক্ষমতার লড়াইয়ের একটা ফয়সালা হবে। আমরা জিতি, না ওরা জেতে! আমাদের দলে খেতাবধারী, বন্দুকধারী, পদবীধারী, ভলান্টিয়ার, পুলিস, মিলিটারি-কনট্র্যাক্টার আছে, আর ওদের দলে আছে লাঠি, ঢিল, আগুন, স্লোগান, আর অসংখ্য সাধারণ মানুষ। এখন দেখি কারা জেতে। ওরা না আমরা। অথচ ভেবে দেখতে গেলে কাদের জন্য আমরা সিংহাসনে বসে আছি? আমরা

আর ওরা কি আলাদা ?

মিস্টার রায় বললেন—আপনি যদি চান আমি পাঁচ হাজার পুলিস কনস্টেবল্ জড়ো করতে পারি স্যার, এখনই—যেমন সেবারে করেছিলাম—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—সে তো পারি। কিন্তু অত পুলিস আনলে তো গভর্মেণ্টেরই বদনাম হবে। পুলিস কনস্টেবল্ না এনে কী করে শান্তি বজায় রাখা যায়, তাই বলুন—

মিস্টার রায় বললেন—সে করবার সময় তো আর এখন নেই স্যার—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন - কিন্তু সামনে ইলেকশান আসছে সেটাও তো আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। বন্দুক পুলিস দিয়ে তো আর ভোট আদায় করা যাবে না।

মিস্টার রায় বললেন—সে জন্যে তো অন্য মেথড্ আছে স্যার—

—কী মেথড্ ?

—সেবারে ইলেকশানের ছ'মাস আগে থেকে আমরা চালের দাম কমিয়ে দিয়েছিলুম, কনট্রোলে রেশনের কোয়ান্‌টিটি বাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তা ছাড়া দু'শো টিউবওয়েল করে দিয়েছিলুম। এবার না হয় আরো দু'শো টিউব্‌ওয়েল করিয়ে দেওয়া যাবে—

—তাতেই কি এই হাওয়া ঘুরবে ?

মিস্টার রায় বললেন—নিশ্চয়ই ঘুরবে স্যার। নগদ পাওনা পেলেই মানুষ আগেকার সব কষ্ট ভুলে যায়। মানুষের স্মৃতিশক্তি বড় শর্ট্, আপনি তো ভালো করেই তা জানেন স্যার—

একটু ভেবে জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আচ্ছা মিস্টার রায়, আপনি কি মনে করেন এই সব করে ওদের থামানো যাবে ?

—কেন যাবে না ? যেদিন এখানকার মানুষ বুঝবে কংগ্রেস দেশের মানুষের ভালো করতে চায় সেদিনই কংগ্রেসকে ভোট দেবে।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আজকে যদি এখানে গুলি চালাই, বা টিয়ারগ্যাস চালাই তাহলে ওরা কি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে না ?

—কিন্তু ওরা ভায়োলেন্স্ করলে আমাদেরও তো ভায়োলেণ্ট্ হতে হবে !

—সে তো ব্রিটিশ গভর্মেণ্টও তাই বলতো। তাদেরও তো সেই যুক্তিই ছিল। তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায় ? তার চেয়ে আমি বলি কি আপনি সমস্ত রেডি রাখুন। যদি তেমন অবস্থা হয়

তখন দেখা যাবে। আমার মনে হচ্ছে আজকে একটা কিছু বড় রকমের গণ্ডগোল হবেই—

মিস্টার রায় বললেন—আপনি যেমন অর্ডার দেবেন তেমনই হবে—

জ্যোতির্ময় সেন ঘড়ির দিকে তাকাতেই মিস্টার রায় উঠলেন। বললেন—নমস্কার, আমি তা'হলে চলি। আপনার জন্যে আমি প্লেন-ড্রেসে একশো-জন পুলিসের ব্যবস্থা রেখেছি—

জ্যোতির্ময় সেন আপত্তি করলেন—না না, ও সব করতে হবে না—

মিস্টার রায় বললেন—না স্যার, আমি কিন্তু রিস্ক নিতে পারবো না, আপনি এ ব্যাপারে আপত্তি করতে পারবেন না—এখানকার এলিমেণ্ট্‌স বড্ড খারাপ, আজকাল সেই আগেকার ময়নাডাঙা আর নেই—

—কিন্তু এর কারণটা কী মিস্টার রায়? কেন এমন হলো বলতে পারেন?

মিস্টার রায় বললেন—এ সম্বন্ধে তো আমি আপনাকে রিপোর্ট পাঠিয়েছি রাইটার্স বিলডিং-এ। আগে এরা কিছু বুঝতো না। কিন্তু এখন ওদের চোখ খুলে গেছে। ওরা বুঝেছে গভর্মেণ্টের চেয়ে ওদের হাতে আরো বড় অস্ত্র আছে—

জ্যোতির্ময় সেন চুপ করে রইলেন। বুঝেছি। এমন যে হবে এ তো আগেই তাঁর জানা উচিত ছিল! তিনি তো জানতেনই চিরকাল এরা এমন সহ্য করবে না। তখন মহাত্মা গান্ধীর নামেই আমাদের কাজ উদ্ধার হয়েছে। জহরলাল নেহরুর বক্তৃতাতেও সবাই হাততালি দিয়েছে তখন। এখন নেহরুর নাম করলেই মানুষ ক্ষেপে ওঠে। এইরকম যে হবে তা তো জানাই ছিল তাঁর।

—আচ্ছা, তাহলে কি আসছে ইলেকশানে আমাদের পার্টি হেরে যাবে?

মিস্টার রায় ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের আমলের অফিসার। বললেন—এর জবাব আমার কাছে চাইবেন না স্যার—

—এই যে মাছের ভেড়ির মালিক, মদের দোকানের মালিকরা আমাদের পার্টির মেম্বার হয়েছে, এ-সব নিয়ে কী পাবলিকের মধ্যে আলোচনা হয়?

মিস্টার রায় এর উত্তর কী দিতেন কে জানে, তার আগেই শঙ্কর এসে ঘরে ঢুকলো।

বললে—জ্যোতিদা, তিনটে বাজলো, এখন চা আনবো নাকি?

জ্যোতির্ময় সেন কিছু উত্তর দেবার আগেই মিস্টার রায় উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—আমি তাহলে এখন আসি স্যার, ওদিককার প্রিপারেশান সব দেখতে হবে গিয়ে—

বলে তিনি চলে গেলেন। বাইরের প্রোসেশান চলে গেছে। শঙ্কর তখনও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে। জ্যোতির্ময় সেন ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে অনেক কথা ভাবছিলেন। মনে পড়লো সেই তাঁর প্রথম দিককার জীবনের কথাগুলো। সেই স্কুলের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা। সেই পুলিসের লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। এখনও তাঁর মাথায় সেই লাঠির দাগটা বোধ হয় আছে। তারপর জেলখানার ভেতরে সেই আমরণ অনশনের ইতিহাস। আজ বোধ হয় সে-ইতিহাস মিথ্যে হয়ে গেছে। তাঁর অতীতের সব কিছু এখন মিথ্যে। বর্তমানটাই এখন সত্যি। রাইটার্স বিল্ডিংএর এই বর্তমান জীবনটা।

রাস্তার মোড়ে এসেই হুটু বললে—দাঁড়া আমি এখুনি কাগজ নিয়ে আসছি—বলে একটা বাড়িতে ঢুকে গেল।

আমি বললাম—এটা কার বাড়ি রে?

হুটু বললে—এটা ডাকঘর, ডাকঘরের চাপরাসীর সঙ্গে আমার ভাব আছে, দেখি এখানে কাগজ আছে কিনা—

খানিক পরেই খবরের কাগজটা নিয়ে এল হুটু।

বললে—শীগগির পড়ে নে, এখুনি ফেরত দিতে হবে—

পাতা উল্‌টে ঠিক জায়গাটা বার করতেই দেখি আমার সেই ছবিটা। হুটু পড়তে জানে না। কিন্তু আমার ছবিটা দেখে বললে—আরে তোর ছবি যে রে জ্যোতি!

বললাম—হ্যাঁ—

হুটু আবার জিজ্ঞেস করলে—তা তোর ছবি এখেনে কেন রে?

আমি বললাম—আমার বাবা ছবিটা ছাপিয়ে দিয়েছে। লিখেছে যদি কেউ আমাকে খুঁজে বার করে দিতে পারে তাহলে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।

—দশ হাজার টাকা?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হুটু আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

বললাম—তুই এখ্‌খুনি দশ হাজার টাকা পেয়ে যাবি যদি তুই বাবার কাছে আমার খোঁজটা দিস—একেবারে নগদ দশ হাজার টাকা।

দশ হাজার টাকা! বাবার কাছে দশ হাজার টাকার দাম সে-যুগেও বেশি ছিল না। সে-যুগেও বাবার আয় ছিল অসামান্য। বাবার বেশি টাকা ছিল কি কম টাকা ছিল তা সে-বয়েসে জানবার উপায় ছিল না আমার।

আর সত্যি কথা বলতে কি, এখনকার চেয়ে তখনকার দিনে টাকা ছিল অনেক আক্রা। টাকা আক্রা ছিল কিন্তু জিনিস ছিল অপর্যাপ্ত। অপর্যাপ্ত ছিল বলেই টাকার দাম থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখনকার চেয়ে অনেক উদার হাতে পারতো। যখন যা খুশি দোকানে গিয়ে পয়সা ফেলে দিলেও কিনতে পারা যেত। জিনিস ছিল প্রচুর, কিন্তু টাকা ছিল অল্প। কোটি কোটি টাকা চলে যেত বিদেশে। যা বাকি থাকতো তা দেশের কয়েকজন মুষ্টিমেয় মানুষ মাত্র ভাগাভাগি করে পকেটে পুরতো। বাবা ছিল সেই মুষ্টিমেয়দের একজন।

সকাল থেকে দু'টো মানুষের সেবার জন্যে যতগুলো মানুষ মাইনে পেত, যতগুলো মানুষ উদয়াস্ত খাটতো, তারা তেমন পেট ভরে খেতে পেত না। তারা মাইনেই পেত শুধু। কিন্তু নিজের পয়সা খরচ করে তাদের রান্না করতে হতো। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু টাকার। টাকা দিয়ে তাদের সেবা কিনতো বাবা।

কিন্তু নিজের ছেলেকে উদ্ধার করার জন্যে দশ হাজার কেন, কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলেও বাবার কিছু গায়ে লাগতো না। অথচ একজন কর্মচারীর দু'টাকা মাইনে বাড়াতেই বাবার যত টাকার অভাব।

সুখদেও একবার মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিল।

বাবা বলেছিল—কেন? কুড়ি টাকা মাসে পেয়েও তোমার কুলোয়-না?

সুখদেও এমনিতেই লজ্জায় পড়েছিল। কথা শুনে বলেছিল—আজ্ঞে হুজুর, দেশে জমি ছাড়াতে হবে। অনেক দিন আগে সুখদেওর বাবা জমি বাঁধা রেখেছিল মহাজনের কাছে। তার সুদ জমে গিয়েছিল অনেক। প্রায় সাতশো টাকার মতন। আসলের হাজারগুণ সুদ বেড়ে জমি প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু উপায় নেই। কলকাতা শহরে চাকরি করতে এসেছিল কুড়ি টাকার মাস-মাইনেতে। খাওয়াটা সুখদেও অমনিই পেতো। তার জন্যে তাকে রাঁধতে হতো না। কারণ

সমস্ত দিনই তার কাজ, কখন সে রাঁধবে? কুড়িটা টাকা যা সে পেতো তার সবটাই সে দেশে পাঠিয়ে দিত দেনা শোধ করতে। তবু চাকরি ছেড়ে চলেও যেতে পারতো না সে। চাকড়ি ছেড়ে যাবেই বা সে কোথায়? দিন রাতের মধ্যে তার ছুটিই বা কখন? বাবা যেখানে যেখানে যাবে সেখানেই তাকে যেতে হয়। যখন কলকাতা ছেড়ে বাবাকে বাইরে যেতে হতো তখন সুখদেওর আরাম। সে দিন-রাত পড়ে পড়ে ঘুমোত।

আর মনে আছে বাবার কাজ যেন দিন দিন বেড়েই চলতো। সকাল থেকে রাত দু'টো তিনটে পর্যন্ত কখন যে বাবা কোথায় কিসের নেশায় কাজ করে বেড়াতো তা জানা যেত না। কার জন্যেই বা বাবা অত কাজ করতো তারও হিসেবও রাখতো না কেউ। এ কি কাজের নেশা, না টাকার নেশা! টাকার নেশাই যদি হবে তবে সে-টাকা বাবা কার জন্যে উপায় করতো কে বলবে! নাকি কাজের নেশা!

কাজেরও একটা নেশা আছে! এই যে আমি সব ছেড়ে দিয়ে পার্টির কাজ করছি, এ কিসের নেশা! এ কাজে তো টাকা নেই। টাকা নেই জেনেও তো আমি এসেছি এ লাইনে। বোধ হয় ক্ষমতার নেশা! আসলে টাকার নেশা বা কাজের নেশা যাই হোক না কেন, সবই ক্ষমতার নেশা। হিটলারের তো একটা পয়সাও ছিল না ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। একটা সামান্য ছাতা কেনবার দরকার হয়েছিল একবার, তখন সরকার থেকে ছাতার দাম মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়েছিল। একটা সামান্য ছাতা কেনবার পয়সা ছিল না যার, তারই দোর্দণ্ড ক্ষমতায় সারা পৃথিবী কেন যে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল তা সবাই জানে।

আসলে ক্ষমতা দখল করার জন্যেই আমি আজ রাজনীতি করছি। মানুষের ভাল করাটা আমার উপলক্ষ্য, লক্ষ্য নিজের ক্ষমতা অধিকার।

সেদিন হঠাৎ ন্টুর বাবা ধরে ফেলেছে।

বললে—অ্যাই, কোথায় ছিলিস? তোকে যে আমি এদিকে গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি—

ন্টু বললে—কেন, আমাকে খুঁজছো কেন?

—সা'মশাই তোকে চাকরি দেবে বলেছে আর তোর কিনা টিকির দেখা নেই। চল্, আমার সঙ্গে চল্ এখ্খুনি—

ন্টু বললে—আমি যাবো না—

—যাবো না? অমনি যাবো না বললেই হলো? তাহলে ভাত গিলবে না বল্।

হুটুও ক্ষেপে গেল।

বললে—আমি কি তোমার ভাত গিলি? তুমি আমায় ভাত খাওয়াও? আমি গতরে খাটি নে?

দিগম্বর আরো রেগে গেল। বললে—তোর এত তেজ কেন রে হারামজাদা। আমি না থাকলে তুই জন্মাতিস কী করে রে হতভাগা? এত বড় জোয়ান ছেলে ঘরে থাকতে আমি খেটে খেঠে মরি দেখতে পাস না? বুড়ো বাপকে খাওয়ানো-পরানোর দায় নেই তোর?

হুটু বললে—দাও না, আরো গালাগাল দাও, যত ইচ্ছে গালাগাল দাও, আমি তোমার কথায় ভুলছি নে।

—তবে কি বলতে চাস আমি চিরটা কাল খেটে খেটে মরবো?

হুটু বললে—মরো না তুমি, বেঁচে থাকতে কে বলেছে তোমাকে? এখখুনি মরে যাও না, আমি হরিসভায় গিয়ে হরির লুট দেব—

—তবে রে শালার ছেলে—

বলে এক লাফে দৌড়ে এল দিগম্বর। হুটুও তৈরী ছিল। সেও ঘুঁষি বাগিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বললে—শালার বাপ হয়েছে বলে এত খোয়াব! আমি তোমার খোয়াব ভাঙ্‌চি—

তারপর আমার চোখের সামনেই ঝটাপটি বেধে গেল বাপ-ছেলেতে। হুটু খোঁড়া, কিন্তু গায়ের শক্তিতে বেশ দড়। বাপকে লট্‌কে ফেলে দিলে মাটিতে, তারপর হাঁটু দিয়ে বাপের বুকের ওপর চড়ে বসলো।

বললে—শালা, আর বাপ দেখাবি আমাকে?

আমার যেন কেমন অপরাধী মনে হলো নিজেকে। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

তারপর আর থাকতে পারলাম না।

তাড়াতাড়ি গিয়ে হুটুর হাত ধরে টানতে লাগলাম। বললাম—হুটু, এই হুটু, ওঠ্—বাবাকে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—

মানুষের শিক্ষার একটা মূল্য আছে বৈকি। শিক্ষা মানুষকে সংযত করে। জীবজগতে এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের পিষে ফেললেও তারা প্রতিবাদ করে না। যেমন কেঁচো। এটা সাত্ত্বিকতা নয়। একে বলে জড়তা। আবার এক ধরনের প্রাণী আছে তাদের আঘাত করলেই তারা কামড়ে দেয়,

যেমন মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে। কিন্তু মানুষের স্বভাব আলাদা। সে বলে আমি তোমার অধীন হবো না, তোমার আঘাতের বদলে তোমাকে আঘাতও করবো না, আমি তোমার পশুভাব নষ্ট করবো। তুমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে পশুপ্রবৃত্তি আমার ওপর প্রয়োগ করছো, আমি তোমার সেই পশুপ্রবৃত্তিই নষ্ট করবো।

কিন্তু এ-সব শিক্ষা কে দেবে হুটুদের? ময়নাডাঙায় তখন শিক্ষা দেওয়ার সুযোগই বা কোথায়? আর শিক্ষা দেবেই বা কাকে? যে-সময়ে তারা পড়বে, সেই সময়টুকু ভিক্ষে করে বেড়ালেও বেশী আয় হয়।

অনেক কষ্টে আমি হুটুকে ছাড়িয়ে নিলাম। কিন্তু দিগম্বর তখন প্রায় অচৈতন্য। একে বুড়ো মানুষ, নেশাখোর—তার উপরে ঠিক পেট ভরবার মত খেতেই পায় না। আমি এক ঘটি জল এনে দিলাম দিগম্বরের মুখে। দিগম্বর জল খেয়ে বারকয়েক খাবি খেলে। তারপর আস্তে আস্তে উঠলো। উঠে বসলো।

কিন্তু তেজ তখনও তার যায়নি।

গালাগালি দিলে খানিকক্ষণ। বললে—শালা, হারামজাদা, বেইমান কোথাকার—

আমি হুটুকে সামলে নিলাম। দেখলাম সে আবার হামলা করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এলাম।

বললাম—ছি, বুড়ো বাপকে মারতে আছে? তোর না বাপ হয়?

হুটু রাগে ফেটে পড়ছে তখনো।

বললে—আমাদের বাপ-বেটার ঝগড়ার মধ্যে তুই কেন কথা বলছিস? আমি ওই বাপের খাই না পরি যে আমাকে গাল দিতে আসে? তুই না ধরলে আমি ও বেটাকে আজ খুন করে ফেলতাম, তা জানিস?

আমি বললাম—কিন্তু কেন গোলমাল করছিস মিছিমিছি? আমি তো বলছি তোকে আমি দশ হাজার টাকা পাইয়ে দেব, তোর আর জীবনে কোন খাওয়ার ভাবনা থাকবে না।

হুটু বললে—আমি তোর টাকা নেব কেন?

বললাম—আমার টাকা কেন হবে, আমার বাবার টাকা। খবরের কাগজের লেখা দেখলি না?

—তার!

হঠাৎ শঙ্কর ঘরে ঢুকতেই যেন চমক ভাঙলো জ্যোতির্ময় সেনের।

—চা এনেছি, দেখুন, এই চা'টা খেয়ে দেখুন, এটা কুড়ি টাকা পাউণ্ডের চা—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কেন এত দামী চা'য়ের ব্যবস্থা করলে?—বারো চোদ্দ বছর আমাদের জেলখানাতেই কেটে গেছে। তখন হজম করবার ক্ষমতা ছিল অথচ খেতে পেতাম না। এখন আর কি এসব ভালো খাবার জিভে রোচে?

বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। মুখে বিনয় প্রকাশ করলাম বটে, কিন্তু চা'টা খেয়ে ভালো লাগলো। বড় ভালো আস্বাদ।

শুধু চা নয়। তার সঙ্গে আবার কোত্থেকে ভালো ভালো বিস্কুট এনেছে।

বললাম—এ-সব আনতে গেলে কেন বলো তো?

শঙ্কর প্রতিবাদ করলে। বললে—কী যে বলেন আপনি জ্যোতিদা, আপনি ময়নাডাঙায় এসেছেন, এ তো ময়নাডাঙার সৌভাগ্য। একবার যখন এখানে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে, তখন আর আমাদের দুঃখ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা শঙ্কর, তোমাদের এখানে এত এজিটেশান কেন? এখানেও কি ওরা ঢুকেছে, ওই কমিউনিস্টরা?

শঙ্কর বললে—হ্যাঁ জ্যোতিদা, ওরাই তো চাষাভুষোদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। নইলে এখানে তো খবরের কাগজ আসে না, রেডিও ট্রান্‌জিস্‌টরও নেই চাষাদের। ওরা এসেই যত আন্দোলন আরম্ভ করে দিলে। যদ্দিন ওরা লেখা-পড়া জানতো না তদ্দিন বেশ ছিল—

বললাম—এখন তাহলে লেখা-পড়া শিখেছে ওরা?

শঙ্কর বললে—ইস্কুল আছে ওই পর্যন্ত। কিন্তু পড়বে কে?

—কেন? পড়ে না কেন?

—পড়লে খাবে কী? পড়বার সময়টুকুতে জন-মজুর খাটলে দুটো পয়সা আয় হয়। পড়ে ওদের লাভ কী? পড়লে তো ওদের ক্ষতিই।

—কিন্তু ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তো আর কাজ করবে না, তারা তো পড়তে পারে।

—এখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও কাজ করে। সস্তায় পাওয়া যায় বলে কারবারীরা তাদের কাজ দেয়। তারাই আজ বড় হয়েছে, তারা বুঝতে শিখেছে যে তাদের সস্তা মজুরিতে খাটিয়ে মহাজনরা বড়লোক হয়েছে—

—এসব বোঝবার মত বুদ্ধি হয়েছে তাহলে ওদের?

—ওদের বুদ্ধি হয়নি। কিন্তু ওই বামপন্থীরা ওদের ওইসব বুঝিয়েছে। ওদের জন্যেই তো জ্যোতিদা, এই ময়নাডাঙায় এত অশান্তি! আজ যে এখানে এত গণ্ডগোল হচ্ছে সে তো ওই বামপন্থীদের জন্যেই। ওরা আসার পর থেকেই যত কাণ্ড শুরু হলো! নইলে এখানে আগে কংগ্রেস বললে লোকে ভক্তিতে মাথা নোয়াত।

—কিন্তু তোমরা ওদের ভালো করে বোঝাও না কেন? তোমরা বোঝাতে পারো না ওদের যে চায়না কি রাশিয়াতে ভোট বলে কোনও বস্তু নেই। কংগ্রেসই ওদের ভোট দেবার অধিকার দিয়েছে।

জ্যোতির্ময় সেন যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন—তোমাদেরই ভুল শঙ্কর। ওদের কোন দোষ নেই। তোমাদের বোঝান উচিত স্বাধীনতা পাওয়ার পর কংগ্রেস দেশের জন্য কী কী ভাল কাজ করেছে। ওদের জানাও না কেন যে আগে রেলের ইঞ্জিন বাইরে থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কিনতে হতো, এখন প্রায় সব কিছু আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে। আর তাছাড়া শুধু ইঞ্জিন কেন, ইলেক্‌ট্রিক পাখা, সেলাইয়ের কল, বাল্‌ব, হিটার সব আমাদের কারখানায় তৈরী করছি আমরা। এতে দেশের লোকে কত চাকরি পাচ্ছে। আমরা এখন আর পরের দেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। এ-সব তো কংগ্রেসই করেছে। আগে জল-কষ্ট ছিল, এখন কংগ্রেস এত টিওব-ওয়েল করে দিয়েছে। দামোদর-ভ্যালি-বাঁধ্ করে দেশের লোককে বন্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

শঙ্কর বললে—ও বেটারা মুখ্যু তো, মাথায় একেবারে গোবর পোরা।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—না, ওদের মাথায় গোবর পোরা নয়, গোবর পোরা তোমাদের মাথায়। তোমরা কংগ্রেসের মেম্বার, তোমরা ভাল করে ওদের বোঝাতে পার না। ফিল্‌ড-ওয়ার্ক তোমরা ভাল করে করতে পার না। তোমাদের বয়েসে আমরা কত ফিল্‌ড-ওয়ার্ক করেছি জানো? গ্রামে-গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে পান্তা ভাত খেয়েছি। কতদিন উপোস করেছি। তাদের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশেছি। তারা আমাদের নিজের লোক বলে মনে করেছে। তারপর যখন জেলে গেছি তখন অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছি পুলিসের হাতে। আর তোমরা?

জ্যোতির্ময় সেন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন শঙ্করের দিকে। যেন চারদিকের এই বামপন্থীদের উগ্রতার জন্যে একলা শঙ্করই দায়ী।

বললেন—হ্যাঁ, তোমরাই দায়ী। তোমরা কেবল লীডারদের খোসামোদ-খাতির করতেই জানো। কেবল তাদের কুড়ি টাকা পাউণ্ডের চা, বড় বড় গলদা চিংড়ি আর ভাল খাঁটি ঘি খাওয়াতেই ব্যস্ত। কেন? আমাদের সেবা করলে দেশের লোকেদের কী উপকার? তাদের সেবা করবার জন্যে কতটুকু সময় দাও তোমরা? তোমরা কংগ্রেসে ঢুকেছ কেবল মন্ত্রী হবার জন্যে। কেবল টাকা উপায় করবার জন্যে।

শঙ্কর মাথা নীচু করে রইল।

খানিক পরে বললে—আমি কিন্তু জ্যোতিদা, ছোটবেলা থেকে কংগ্রেসে আছি—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আমি তোমার কথা বলছি না, তোমাদের সকলের কথাই বলছি। একটা প্রতিষ্ঠান কি শুধ্ শুধ্ নষ্ট হয়? তার পেছনে অনেক কারণ আছে। আজকে যত মদের দোকানের মালিক আর মাছের ভেড়ির মালিক সার্থসিদ্ধির জন্যে আমাদের পার্টিতে ঢুকেছে, আর আমারও তাদের নমিনেশান দিচ্ছি···

দেয়ালের ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হলো। জ্যোতির্ময় সেন দেখলেন সাড়ে তিনটে বাজলো। সম্মেলন বসতে আর আধ ঘণ্টা বাকি।

আবার বলতে লাগলেন—তুমি কিছু মনে করো না শঙ্কর। অনেক দুঃখেই আজ আমাকে এ-সব কথা বলতে হচ্ছে। আমি ভেবেছিলুম এখানে এসে চুপচাপ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবো। আর···আরও একটা ইচ্ছে ছিল···

—কী ইচ্ছে ছিল জ্যোতিদা?

জ্যোতির্ময় সেন চেপে গেলেন। কথাটা বলতে গিয়েও বললেন না। না থাক, যে কথা মনে মনে আছে, সে কথা মনের ভিতরে থাকাই ভালো। ওরা বুঝবে না। ওরা কেউই বুঝবে না। রাজনীতির মানুষকে সবাই ভুলই বোঝে। আমারও যে মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্য থাকতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। সবাই জানে সাধারণ লোকের পুজো পেয়ে পেয়ে আমি অমানুষ হয়ে গিয়েছি। আমার যেন ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই। আমি বিয়ে করিনি, আমি কোনও সম্পত্তি করিনি, তবু আমি অমানুষ। কারণ আমি ক্ষমতার চূড়োয় উঠেছি। ক্ষমতার চূড়োয় উঠলে একদিকে যেমন অহেতুক ভক্তি, অন্যদিকে তেমনি অকারণ ঈর্ষা। আমি দুইই পেয়েছি। শুধু ভালোবাসাই পাইনি। অথচ ভালবাসা পাওয়ার জন্যে এখন

মনটা ছট্‌ফট করে। আমার চেয়ারটা এত উঁচু হয়ে গেছে যে এখানে আর ভালবাসা পৌঁছতে পারবে না। কারণ খ্যাতি-অর্থ-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি কেবল মানুষকে পরই করে দেয়, শুধু দূরেই ঠেলে দেয়। কাছে টানে না। কাছে টানে একমাত্র প্রীতি প্রেম সৌহার্দ্য। সে আর কবে পাব!

হুটু, আজ তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমাকে আমি সব বলবো। তুমিই আমাকে প্রথম ভালোবেসেছিলে; কোন কিছুর আশা না করেই ভালোবেসেছিলে, তুমিই প্রথম আর তুমিই শেষ। আমি ভুলিনি হুটু যে তুমি আমার জন্যে তোমার বৈকুণ্ঠকে পর্যন্ত কশাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলে। সে-কথা আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ভুলবোও না। বিশ্বাস করো হুটু, আমি প্রাণ থাকতে ভুলবো না—

প্রথমে ভয় লেগেছিল হুটুর। বিরাট চওড়া রাস্তার উল্টোদিকে তিনতলা বাড়িটা দেখে হুটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল—ওইটে তোদের বাড়ি?

আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ,—

হুটু জিজ্ঞেস করেছিল—তোরা এত বড়লোক? ময়নাডাঙার বাবুদের চেয়েও বড়লোক? তুই তো আমাকে কিছু বলিসনি?

গ্রামের ছেলে হুটু। ভালো জামা-কাপড়ও নেই পরনে। সেই সকাল বেলা ট্রেনে চড়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে নেমেছিল দু'জনে। জীবনে হুটু কখনও কলকাতা দেখেনি। এ কত বড় দেশ! তারপর হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছে বাড়ির সামনে।

আমি খবরের কাগজের ছেঁড়া টুকরোটা তার হাতে দিয়ে বলেছিলাম—এইটে নিয়ে গিয়ে আমার বাবাকে দেখা। তুই বলবি আপনার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে এনেছি, আপনি আমায় দশ হাজার টাকা দিন—

—তারপর? তারপর তোর বাবা যদি বলে কোথায়, জ্যোতি কোথায়?

বলেছিলাম—তারপর আমি গিয়ে হাজির হবো—আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে রইলুম—

তবু যেন হুটুর সাহসে কুলোল না। তবু আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু খানিক দূর এগিয়েই আবার ফিরে এল।

বললে—দরজায় পাহারা রয়েছে যে, পাহারাদার কিছু বলবে না?

আমি বললাম—আমি তো আছি, কিছু বললে আমি বলে দেব, তুই যা না—

আমার কথায় সাহস পেয়ে মুটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

মিস্টার সেন সাধারণ ব্যারিস্টার নন। তিনি যে সাধারণ ব্যারিস্টার নন সেটা তাঁর ক্লায়েণ্টদের চেয়ে তিনিই বেশি জানেন। যাঁরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন তাঁদের একটা সহজাত অহঙ্কার থাকে। তাকে অহঙ্কারও বলা যায়, আবার আত্মবিশ্বাসও বলা যায়। অনুরাগীরা সেটার প্রশংসা করে। তারা তাঁর 'আত্মবিশ্বাসেরই অনুরাগী। কিন্তু যাঁরা যে-কোনও বিষয়েই সার্থক, তাঁদের তো আবার শত্রুপক্ষও থাকে। সেই শত্রুপক্ষরা সেটাকে অহঙ্কার বলে দোষারোপ করে। ওটা দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। নিজের নিজের তর্কের সুবিধের জন্যে একটা যুক্তি খাড়া করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার বাবার ব্যাপারেও ঠিক তাই।

আর সেই জন্যেই তাঁর নিজেকে সব সময় সতর্ক রাখতে হতো। ওসব লোকদের সব সময়েই একটা ভয়—এই বুঝি আমার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি সব চলে গেল। এই ভয় বা এই সচেতনতাটাই সব সময় তাদের অন্য সব মানুষ থেকে পৃথক করে রাখে। সেই জন্যেই বাইরের লোকেরা তাঁদের ভুল বোঝে। তারা বলে—আমাকে মোটে গ্রাহ্যই করলেন না।

শুধু বাবার মক্কেলরাই নয়, আমার প্রাইভেট টিউটার হরিসাধনবাবুও যেন সেই কারণেই বাবার সঙ্গে কথা যখন-তখন বলতেন না। বাবাও ব্যস্ত থাকবার ভাণ করতেন। আর ভাণ করতেনই বা বলি কেন? কাজ তো বাবার কম ছিল না।

বাবা ছিলেন সেকালের সাহেব। সাহেব মানে পাক্কা সাহেব। বাবা স্টেটস্‌ম্যান ছাড়া খবরের কাগজ পড়তেন না। বাড়িতে আমরা স্টেটস্‌ম্যান ছাড়া অন্য কাগজ কখনও আসতে দেখিনি।

স্বদেশীপনার ব্যাপার দেখলেই বাবা রেগে যেতেন। কেউ চাঁদা চাইতে এলে যা-নয়-তাই বলে তাড়িয়ে দিতেন।

বলতেন—খদ্দর পরে কী লাভ হয় তোমাদের? দেশ স্বাধীন করবে? স্বাধীন হয়ে কী ভালো হবে তোমাদের?

স্বদেশীরা বলতো—আপনি বলছেন কী? আপনি স্বাধীনতা চান না?

বাবা বলতেন—না। এই তো বেশ আছি।

তারা বলতো—কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগে যে-কাণ্ড হয়েছে তার পরেও আপনি ওই কথা বলছেন?

বাবা বলতেন—তা স্বাধীন দেশে কি পুলিস গুলি ছোঁড়ে না? ল' ব্রেক করলে গুলি ছোঁড়া কি অন্যায়? তোমরা ব্রিটিশদের গুলি মারবে, আর সে চুপ করে সহ্য করবে? কোনও সভ্য দেশ তা সহ্য করতে পারে? কোনও মানুষ তা পারে?

বাবা শেষের দিকে রায়-বাহাদুর হয়েছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সেবা করে বাবা তাদের কাছ থেকে যথোচিত পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু পেলে কী হবে, বাবাকে চরম শাস্তি দিয়েছিল বোধ হয় তাঁর ছেলে—এই আমি। এককালে স্বদেশীদের অপমান করে বাবা যে-পাপ করেছিলেন, আমি ছেলে হয়ে তাঁর সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম। ভালো করেছিলাম কি খারাপ করেছিলাম তা জানি না। বাবা ভুল করেছিলেন না আমি ভুল করেছিলাম তাও জানি না। বাবা যে-যুগের মানুষ, যে-আওতায়, যে-আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছিলেন তার সঙ্গে তাল রেখেই তিনি বড় হয়েছিলেন।

তখন ছোট ছিলাম। বাবাই ছিলেন আমার আশ্রয় আবার বাবাই ছিলেন আমার বাধা। যাকে আশ্রয় ভাবি তিনিই যদি বাধা হয়ে দাঁড়ান, তাহলে মানুষের জীবনে স্বস্তি কোথায়? মানুষের সম্পর্কের এই জটিলতা নিয়ে বহু মনীষী বহু বই লিখে গিয়েছেন। শুধু রক্তের সম্পর্ক নিয়ে নয়। সামাজিক সম্পর্ক নিয়েও তাঁদের গবেষণার শেষ নেই। জন্মগত যে উত্তরাধিকার আর সামাজিক যে কর্তব্য-কাজ, এ দুটোর লড়াই-এর ক্ষেত্রই হচ্ছে মানুষের মন। প্রত্যেকটি মানুষকে এই সংগ্রাম করে যেতে হবে সারাজীবন। এই হয়ত মানুষের বিধিলিপি। এই সংগ্রাম এড়াবার জন্যেই কেউ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায়, কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আবার এই সংগ্রামের যন্ত্রণা লঘু করবার জন্যে নানা লোকে নানা উপায় অবলম্বন করে। যাকে বলা হয় 'libido-displacement'। যেমন কেউ বিজ্ঞান, কেউ বা সাহিত্য, আবার কেউ বা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ডুবে থাকে। এও এক রকমের পলায়ন।

বাবার দিক থেকে সেই পলায়ন-বৃত্তিই ছিল তাঁর নিজের জীবিকা।

ব্যারিস্টারিকে তিনি যে ভালোবাসতেন তা নয়। কিন্তু ব্যারিস্টারি না করলে তিনি করতেনই বা কী? তাঁর তো করবার কিছু ছিলও না।

আর টাকা?

টাকাটা তো ছল! ওর ছলনাতে ভুলেই তো মানুষ অসম্ভবের দিকে দৌড়োয়। অসম্ভবের দিকেও দৌড়োয়, আবার মৃত্যুর দিকেও দৌড়োয় বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবে বুঝি জীবনের দিকে দৌড়চ্ছে। জীবনের ছদ্মবেশে মৃত্যুই মানুষকে দূর থেকে হাতছানি দেয়।

আর ক্ষমতা! ক্ষমতাও তো মৃত্যু! ক্ষমতাও তো মানুষকে বার-বার মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়। তাই ক্ষমতা কেবল মানুষকে বলে—আমার দিকে এসো, আমি তোমাকে শান্তি দেব।

কোথায় শান্তি! শান্তি দেবার মালিককে যদি একবার দেখতে পাওয়া যেত তো একবার জিজ্ঞেস করতাম—তোমার কত নাম, কত নামে তোমায় মানুষ ডাকে, কেউ বলে করুণাসিন্ধু, কেউ বলে পতিতপাবন, কেউ বলে কল্পতরু। কিন্তু বাবার কোন্ ইচ্ছেটা তুমি পূরণ করলে? আমারই বা কোন্ আশাটা তুমি মেটালে?

বাবা বলতেন—এখন যান, এখন আমার দেখা করবার সময় নেই—

সময় ছিল না বাবার, না বাবা সময় করতে চাইতেন না, সেটাই একটা বিচার্য বিষয়। সময় যার নেই, তার পেছনেই যত ভিড়। সেটা বাবা জানতেন বলেই সময়কে সঙ্কুচিত করে তিনি সময়ের দাম বাড়াতেন। গিনি দিয়ে বিচার হতো বাবার সময়ের। সতেরো গিনি থেকে সাতাশ গিনি, সাতাশ গিনি থেকে চুয়ান্ন। দেশের মানুষের হাতে টাকা যত কমে আসতো, তত লেগে যেত মামলা-মকর্দমার ভিড়, আর বাবার গিনির রেট তত বাড়তো। শুধু গিনিই বাড়তো না, সম্মান, পদমর্যাদাও বেড়ে বেড়ে চলতো।

আর যত পদমর্যাদা বাড়তো তত সময় কমে যেত।

তবু হুটুকে যে বাবা খানিকটা সময় দিলেন সে শুধু হুটুর কৌশলের জন্যেই। অত যে দারোয়ান, অত যে ঠাট-ঠমক সব কিছু উৎরে গিয়ে হুটু যে শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে পৌঁছতে পেরেছিল সে আমার শেখানো কৌশলের ফলেই।

আমি বলে দিয়েছিলাম—কিছুতেই তুই ভয় পাবি না, সোজা ঢুকে

বাবি বাবার ঘরের ভেতরে—

হুটু ঠিক তাই-ই করেছিল। একেবারে কারোর কথা না শুনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বাবার পায়ের ওপর।

—কে? কে তুমি? তুই কে?

ভালো করে নজরে পড়তেই মনে হলো আগন্তুককে 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' বলাই ভালো।

—আজ্ঞে, আপনার ছেলে জ্যোতির্ময় সেনের খবর এনিচি আমি। এই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি!

—দেখি! কই সে?

—সে বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

আর কোনও কথা নয়। চিৎকার করে সকলকে ডাকতে লাগলেন মিস্টার সেন। রঘু, কৈলাস,—সবাই এসে হাজির হলো।

মিস্টার সেন সেই ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থাতেই রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, সেও হতভম্ব। সে ভেবেছিল তাকেই বুঝি বকুনি খেতে হবে কাজে অবহেলার জন্যে।

আমি তখন উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি।

বাবা আমার দিকে দৌড়ে এলেন।

বললেন—কোথায় ছিলি? কোথায় ছিলি এতদিন?

হুটুকে দেখিয়ে বললাম—এদের বাড়িতে—

এতক্ষণে তিনি হুটুর দিকে আরো ভালো করে যেন চেয়ে দেখলেন।

বললেন—এ কে?

বললাম—এ হুটু—

—হুটু? একে চিনলি তুই কী করে? এদের বাড়ি কোথায়?

বললাম—ময়নাডাঙায়।

—ময়নাডাঙা? সে কোথায়?

বললাম—বর্ধমানে।

—বর্ধমানে? সেখানে গিয়েছিলি কী করতে?

বললাম—এমনি।

—এমনি মানে—সেখানে কে তোকে যেতে বলেছিল?

—কেউ বলেনি, আমি এমনিই গিয়েছিলুম—

বাবা আর কোনও কথা বললেন না। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলেন। হুটু আর সাহস করে বাড়িতে ঢুকলো না, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম—ও-ও আসবে আমার সঙ্গে।

—ও কে?

—ওই হুটু।

—নো, নেভার, কিছুতেই না, ও একটা স্ট্রীট-আর্চিন। ওর সঙ্গে মিশবে না তুমি।

বলে কৈলাসকে হুকুম দিলেন বাবা—যা তো, ওই ছোকরাটাকে চলে যেতে বল্ তো—

আমি বেঁকে বসলাম। বললাম—না, ও আমার সঙ্গে আসবে।

আমার গোঁ দেখে বাবা যেন প্রথমে চমকে গেলেন। নিজের ছেলেকেও যেন খানিকক্ষণের জন্যে চিনতে পারলেন না। যে-ছেলেকে জন্মাতে দেখেছেন, যে-ছেলের ভালো-মন্দের জন্যে অনেক ভেবেছেন, সেই ছেলের কাছ থেকে বোধহয় এমন ব্যবহার পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যেন নিজের কাছেই নিজে হেরে গেলেন। নিজেকেও যেন খানিকক্ষণের জন্যে চিনতে পারলেন না।

মনে আছে বাবার মনে আমি সেদিন খুব কষ্ট দিয়েছিলুম। একে রায়-বাহাদুর মানুষ। স্টেট্‌সম্যান পড়া লোক, তার ওপর ইংরেজদের সততা আর চরিত্র-মাহাত্ম্যের ওপর অগাধ ভক্তি, তাঁর ছেলে হয়ে কোন্ এক অখ্যাত গ্রামের গরীবের এক ততোধিক অখ্যাত একটা ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা খোঁড়া ছেলের ওপর আকর্ষণ! এটা তো মোটেই সুলক্ষণ নয়। এ তো গোল্লায় যাবার নির্দেশ!

কিন্তু মিস্টার সেনের মত লোকও যখন বুঝলেন যে তাঁর ছেলেরও নিজস্ব মত বলে একটা জিনিস আছে, তখন তো আনন্দ হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু শিশু যে একদিন বড়ও হয় সে কথা তিনি বোধ হয় খানিকক্ষণের জন্যে ভুলেই গিয়েছিলেন। এই ভুলে যাওয়া খুব বিচিত্র নয়। যুধিষ্ঠির নরক দর্শন করেছিলেন এইটেই সবাই মনে রেখেছে। কিন্তু ভুলে গেছে তাঁর সত্য-নিষ্ঠা, ভুলে গেছে তাঁর ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা সব কিছু। মানুষের নিজের স্বার্থে মানুষের ভালো দিকটা মানুষ তো ভুলে যাবেই।

—ঠিক আছে, ও আসুক। কিন্তু ও কী চায়?

বললাম—তুমি যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলেছিলে, সেইটেই ওকে দিতে হবে।

—কেন?

—ও-ই তো আমার খবরটা তোমাকে দিয়েছে!

এবার বোধহয় বাবা নিজের আইনের প্যাঁচে নিজেই ধরা পড়লেন। কিন্তু মানুষের আদালতে আইনের মার-প্যাঁচ, তার বিভিন্ন ক্লজ্‌ আর অ্যামেণ্ড্‌মেণ্ট থাকলেও সংসারেরও তো আর একটা আদালত আছে। সেই আদালত বলে —আমার আইন আইনই মাত্র। তার কোন ক্লজ্‌ নেই, অ্যামেণ্ডমেণ্ট্‌ও নেই। তার ব্যাখ্যা একটাই। সেই ব্যাখ্যাতে যদি তুমি আসামী হও তো তোমার শাস্তি হবেই। হয় পরোক্ষ ভাবে, নয়তো প্রত্যক্ষ ভাবে তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। শুধু সময় হওয়ার যা অপেক্ষা। বাবারও বোধ হয় তখন সময় হয়নি। নইলে অত ফাঁসির আসামীকে আইনের মার-প্যাঁচে বাঁচিয়ে দিয়েও নিজে কেন আইনের মার-প্যাঁচে আটকে পড়লেন!

আসলে বোধ হয় সেই 'আমি'।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'চোর চোর খেলায় বুড়িকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়িকে ছুঁলে বুড়ি খুশী হয় না।' ঈশ্বরের ইচ্ছে যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলুক।

অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে আছে—নারদ রামকে বললেন—রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, তাহলে রাবণবধ হবে কী করে? তুমি যে রাবণ-বধের জন্যেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ!

রাম বললেন—নারদ, সময় হোক, রাবণের কর্ম-ক্ষয় হোক তবে তো তার বধের উদ্যোগ হবে।

বাবার সেই 'আমি'টা বোধ হয় তখনও সজাগ ছিল। পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। সেই জন্যেই তখনও ছোট-বড় উঁচু-নিচু গরীব-বড়লোক ভাবটা যায়নি। ওটা কি সহজে যায় মানুষের! কারো একমাত্র ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেও যায় না। এমন কি একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতেও কারো কারো যায় না। কেউ আবার অল্পতেই 'আমি' ত্যাগ করতে পারে। লালাবাবু তো 'বেলা যায়' শব্দটা শুনেই 'আমি' ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। তখন তিনি বলতে পেরেছিলেন—সাপ হয়ে খাই আর রোজা হয়ে বিষ নামাই। তিনি

বিদ্যা অবিদ্যা দু-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যা মায়ায়ও গুরুরূপে রোজা হয়ে বিষ নামাচ্ছেন।

মনে আছে বহুদিন আগে যখন খাদি-আশ্রমে থাকতুম তখন সময় পেলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত পড়তাম। জেলখানাতেও যখন গেলাম তখন আরো অনেক জিনিসের সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'ও পাঁচ ভলুম চেয়ে বসলুম।

আমার সঙ্গে যারা জেলখানায় ছিল তারা আমার 'কথামৃত' পড়া দেখে অবাক হয়ে যেত।

একদিন আমাদের ত্রৈলোক্যদা বললেন—জ্যোতি, এ বইগুলো তুমি পড়ো কেন ?

আমি বললাম—দাদা আমার পড়তে ভাল লাগে—

ত্রৈলোক্যদা বললেন—কিন্তু তুমি হলে রাজনীতির লোক, এ বই পড়ে তোমার কী হবে ? তার চেয়ে হিস্ট্রি পড়ো না, সোসালিজ্‌ম-এর বই পড়ো না। মিল্-বেন্‌থ্যাম পড়ো, পরে নিজের কেরিয়ারের কাজে লাগবে।

বললাম—তাও তো পড়ি—

ত্রৈলোক্যদা বললেন—এগুলো বেশি পড়ো না হে, শেষকালে সাধু-সন্নিসী হয়ে যাবে, তখন আর ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। তখন মনে হবে সবই মায়া—

বলে হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

কিন্তু আমি পড়া ছাড়লাম না। আমার বরাবর ধারণা ছিল আমার 'আমি'কে জানতে গেলে শুধু হিস্ট্রি পড়লে চলবে না, শুধু ইকনমিক্স্ বা সোশ্যালিজম্ পড়লেও চলবে না। যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ ওঁদের কথাও জানতে হবে। ওঁরাও তো মানুষ ছিলেন। মানুষের সব সমস্যা তো ওঁদেরও ছিল।

আজ এই যে এখানে বসে আছি সকাল থেকে, বসে বসে আমি কী কাজ করছি ? কিছুই না। শঙ্করের সঙ্গে কথা বলছি, রথীন সিকদার, আর কেষ্ট হালদারের সঙ্গে কথা বলছি। এস-ডি-ও মিস্টার রায়ের সঙ্গেও কথা বলছি। যাকে যা হুকুম দেবার তা দিচ্ছি। অন্য সকলের কথাও শুনছি। সবই তো আমার নিজের কথা। একেই তো বলে আত্মচিন্তা। নিজেকে চেনবার জন্যেই আত্মচিন্তা করতে হয়, নিজেকে নানার মধ্যে দিয়ে আস্বাদ করতে হয়।

নিজেকে জানলেই তবে বহুকে জানা যায়। সেই বহুকে নিজের মধ্যে দিয়ে জানবার জন্যেই তো আমি আত্মচিন্তা করছি।

—জ্যোতিদা—

শঙ্করের কথায় আবার সচেতন হয়ে গেলুম।

—আপনি যে বলেছিলেন আপনার আর একটা কী ইচ্ছে ছিল?

বললাম—হ্যাঁ, ইচ্ছে ছিল এখানকার চাষীদের সঙ্গে একটু কথা বলবো—

শঙ্কর বললে—না জ্যোতিদা, ওদের সঙ্গে কথা বলবেন না, আগেকার সেই চাষীরা এখন আর সে-রকম নেই, এখন সব অন্য-রকম হয়ে গেছে। এখন হয়ত কথা বলতে গেলে আপনাকে অপমান করে বসবে।

—অপমান করবে? কেন?

—অপমান করবে, কারণ আপনি যে মিনিস্টার, শুধু মিনিস্টার নয় চিফ্ মিনিস্টার।

—আমি চিফ্ মিনিস্টার, সেটাই কি আমার অপরাধ? আমি যদি চিফ্ মিনিস্টার না-ই হতাম, তাহলে কেউ-না-কেউ তো চিফ্ মিনিস্টার হতোই? কেউ উঁচুতে উঠলেই বুঝি ওদের রাগ?

শঙ্কর বললে—না জ্যোতিদা, আপনি ওদের সঙ্গে দেখা করবেন না। শেষ-কালে কী হতে কী হয়ে যাবে—

তারপর বললে—দাঁড়ান, অমি একবার ওদিকে গিয়ে দেখে আসি হালচালটা—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ন্টুটু তখন চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। যা দেখছে তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। আমরা এত বড়, এটা ন্টুটু ভাবতেই পারেনি যেন। এত চাকর, এত দরোয়ান, এত গাড়ি, রেডিও, এত জাঁক-জমক সব যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

সব নজর দিয়ে দেখতে দেখতে বললে—তুই তো আমাকে বলিসনি জ্যোতি তোরা এত বড়লোক, তোরা যে ময়নাডাঙার বাবুদের চেয়েও বড়লোক রে—

হুটুর চোখে ময়নাডাঙার বাবুরাই ছিল সবচেয়ে বড়লোক। কারণ শহর তো সে দেখেনি। হুটু জানতো না যে পৃথিবীর যত বড়লোক সব শহরেই বাস করে। বাস করে আর গ্রামের লোকদের শোষণ করে। শহরের লোকরাও ট্যাক্স দেয়, গ্রামের লোকরাও ট্যাক্স দেয়। কিন্তু জীবনের সব সুখ-সুবিধেগুলো ভোগ করে শহরের লোক। গ্রামের লোকের ট্যাক্সের টাকায় শহরের লোক পায় পিচের রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, হাসপাতাল, কলের জল, আরো কত কী! আসলে আমার বরাবর মনে হয়েছে ইংরেজ আমাদের যত না শোষণ করেছে আমরা তার চেয়ে ঢের বেশী শোষণ করেছি আমাদের নিজেদের দেশের গ্রামের লোককে।

এ-সব কথা আমি সেদিন বোঝাতে পারিনি হুটুকে। এ-সব কথা তখন জানতুমও না আমি, আর জানলেও হুটুকে বোঝাতে পারতাম না, হুটুও বুঝতো না। তখন হরিসাধনবাবু আমাকে যা বোঝাতেন আমিও তাই-ই বুঝতুম।

কিন্তু হরিসাধনবাবুও তো সে-কালের লোক। তিনি সেকালের বই পড়েই পণ্ডিত। কিন্তু কখন যে যুগ বদলে গেছে তা তিনি জানতে পারেননি। আমরা সে-যুগে বাইবেল পড়েছি, গীতা পড়েছি, মহাভারত, রামায়ণ উপনিষদ্ পড়েছি। কিন্তু এলিয়ট পড়িনি। এলিয়ট বলবার আগে পর্যন্ত আমরা জানতামও না যে আমরা 'hollow men' ছাড়া আর কিছু নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে Kierkegaard কিংবা Nietzscheকে আমরা বাতিলই করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওঁরা পাগল। কিন্তু যখন সার্ত্র লিখলেন 'Nausea' আর 'No Exit' তখন মনে হতে লাগলো, তাই তো! ইরেসমাস কিংবা ভলতেয়ার তাঁদের যুগের মানুষদের সম্বন্ধে যা-কিছু লিখে গেছেন আমাদের এ-যুগের সার্ত্রও তো তাই!

কিন্তু তবু আশ্চর্য লাগে যখন দেখি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঠিক আগেকার মতই খেলা করে, হাসে, গান গায়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে লেকের ধারে বসে সেই আগেকার মতই তো ঘনিষ্ঠ হয়! যখন যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে শহর গুঁড়িয়ে যায়, তখনও তো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে একটা সবুজ ঘাসের ডগা মাথা বাড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে হাসে! তখন

মনে হয় তাহলে হয়ত হতাশ হবার তেমন কিছু নেই। একেই হয়ত বলা হয়েছে—'Theology of Crisis.'

মনে আছে যখন খাদি-আশ্রমে বসে গান্ধীজীর কথায় চরকা কেটেছি, তখন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি এই চরকার মধ্যে দিয়েই মানুষের মুক্তি আসবে! কিন্তু 'মুক্তি' কথাটাই তো ছেঁদো কথা। মুক্তি মানে কি আমরা ঠিক-ঠিক বুঝেছিলাম তখন? কার মুক্তি? সমস্ত বিশ্বের মানুষের? কীসের থেকে মুক্তি? কিন্তু ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে সেই ইংরেজেরই বা কী দশা হলো? কী দশা হলো ১৩৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে? আমাদের প্রভুদের মুক্তিরই বা কী দশা হলো?

পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাবিদ্ আর দার্শনিকরা আজ ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে। তারা বলছে—'মানুষ আজ যন্ত্রযুগের যে-বিন্দুটিতে এসে পৌঁছেছে সেখানে আর তার কোনও রক্ষে নেই। সেখানে তাকে বাঁচাবারও আর কেউই নেই। আমাদের কাছে আছে শুধু পুরনো পৃথিবী আর পুরনো ঐতিহ্যের স্মৃতি, আর আছে ভবিষ্যতের ভয়াবহ উদ্বেগ। যদি আমরা বাঁচতে চাই তো এই বিপদের মধ্যেই আমাদের আনন্দ আহরণ করে নিতে হবে। জরথুস্ট্রের মতই বলতে হবে—'Joy is deeper still than hearts' grief', কিংবা ক্যামুর মত সিসিফাসকেও সুখীই ভাবতে হবে। ভাবতে হবে—'The struggle itself, towards the heights is enough to fill a man's heart.'

শঙ্কর হঠাৎ ঘরে ঢুকলো।

বললে—দেখে এলুম স্যার—সব ঠিক আছে—

জ্যোতির্ময় সেন জিজ্ঞেস করলেন—সব ঠিক আছে মানে?

শঙ্কর বললে—এস-ডি-ও মিস্টার রায় সব রেডি রেখেছেন।

—কী রেডি রেখেছেন? সব খুলে বল।

শঙ্কর বললে—পুলিস-টুলিস সব রেডি। প্রায় পাঁচশো পুলিসকে প্লেন ড্রেসে রাখা হয়েছে। বর্ধমান জেলার সব জায়গা থেকে ডেলিগেট্‌রা এসে গেছে। প্রত্যেক ক্যাম্পে সি-আই-ডির ইন্‌ফরমার রাখা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট দেখেও ডেলিগেট্‌রা খুব খুশী। আপনি এসেছেন, আপনি কন্‌ফারেন্স ওপেন করবেন বলে সবাই তারা খুব উৎসাহ

পেয়েছে। আপনি তো এর আগে কখনও এখানে আসেননি—

—কিন্তু ওরা? ওই অপোজিশান পার্টির লোকরা?

শঙ্কর বললে—তাদের এখনও কোন পাত্তা নেই—দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—কী আর হবে, গণ্ডগোল হবেই—

শঙ্কর বললে—কী বলছেন স্যার, যদি গণ্ডগোল কেউ করতে আসে তো সে আর বেঁচে ফিরবে না।

—সে কী! কী বলছো তুমি!

শঙ্কর বললে—হ্যাঁ স্যার, সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে—যাতে কন্‌ফারেন্স বেশ পিস্‌ফুলি চলে তার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। আপনি কিছু ভাববেন না—

জ্যোতির্ময় সেন হাসলেন। বললেন—তুমি ছেলেমানুষ শঙ্কর, তাই ও-কথা বলছো।

—কেন স্যার? আমি কী অন্যায়টা বললুম? আমাদের হাতে পুলিস রয়েছে, আমরা ভয় করবো কেন?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—ব্রিটিশের হাতেও তো সৈন্য ছিল, পুলিস ছিল, তাহলে এমন সোনার দেশ ছেড়ে তারা কেন চলে গেল?

শঙ্কর হঠাৎ উত্তর দিতে পারলে না প্রশ্নটার।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—সেইজন্যেই তো বলছিলাম তুমি ছেলেমানুষ! বন্দুক রাইফেল দিয়ে যদি মানুষকে শায়েস্তা করা যেত, তাহলে এসিয়া আফ্রিকার মানুষ চিরকালই পরাধীন থাকতো। কিন্তু তা তো হয়নি—

—কিন্তু কেন হয়নি স্যার?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—হয় না। কারণ সমস্ত পৃথিবীর চেহারাটাই বদলে গেছে যে। সেই প্রথম যেদিন উনিশশো চৌদ্দ সালে যুদ্ধ বাধলো সেই দিন থেকেই সব কিছু বদলাতে শুরু করলো। সে যে কী ভাবে বদলেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না শঙ্কর—

কথাটা বলেই আবার বললেন—যাক্‌গে এ সব কথা, এখনও তো ঘণ্টাখানেক সময় আছে, তার আগে আমাকে আর এক কাপ চা দিয়ে যাও তুমি—

—এক্ষুনি দিচ্ছি স্যার—এক্ষুনি—

বলে হুকুম তামিল করতে পারার আনন্দে সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

এই শঙ্কর! এখনও বিশ্বাস করে ভালো করে আমার তোয়াজ করতে পারলেই আমি ওকে রাজা করে দেব। রাজা করতে না পারি উজির অন্ততঃ করে দেবই। কিন্তু বেচারা জানে না যে আমার নিজের চেয়ারই আজ টলমল করছে। আর শুধু আমার নয়, পৃথিবীর যত লোক শিল্প সাহিত্য দর্শন রাজনীতির উঁচু সিংহাসনে বসে আছে, তাদের সকলের সিংহাসনই আজ দ্বিধায়-সন্দেহে টলমল। আজকের এই নতুন পৃথিবীতে সব জিনিসের মূল্য বদলে যাবার খবরটা শঙ্করদের কানে পৌঁছোয়নি বলেই এখনও ও আমাকে খাতির করে চলেছে। তাই কুড়ি টাকা পাউণ্ডের চা খাওয়াচ্ছে, হবু মিনিস্টাররা গলদা চিংড়ি ভেট্ দিচ্ছে, স্টেশনের ভেণ্ডার রসগোল্লার স্যাম্পল দেখিয়ে সার্টিফিকেট আদায় করতে চাইছে।

বহুদিন আগে ডস্টয়েফ্‌স্কির Great Inquisitor-এ পড়েছিলাম—"All that man seeks on earth is someone to worship, someone to keep his conscience and some means of uniting all in one unanimous and harmonious ant-heap. for the craving for universal unity is the third and last anguish of men. Mankind as a whole has always striven to organise a universal state," কথাগুলো ভালো লেগেছিল বলে সেদিন তলায় দাগ দিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু ডস্টয়েফ্‌স্কি তো সেকালের লোক, তাঁর কথা আজকে অচল হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া আজকে যারা সব জিনিসের মাথায় বসে আছে, তারাও কি আর তাদের ধর্ম পালন করছে আগেকার উঁচু-মাথা লোকদের মত? উঁচু-নিচুর মানেও তো বদল হয়ে গেছে একালে। কিন্তু ডিক্‌শনারিতে তবু সেই পুরনো মানেই লেখা রয়েছে এখনও। মূল্য বদলে গেছে, কিন্তু ডিক্‌শনারি বদলায়নি। নতুন যুগের ছেলেরা এখন দেখছে এক রকম, পড়ছে আর।

ছুটুর কাছে আমাদের বাড়িটা ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। কলে কোথা থেকে জল আসে, বাতি দেশলাই না জ্বালিয়েও কেমন করে জ্বলে, এ সব তার কাছে ছিল অবাক বিস্ময়।

একদিন বললে—আমার খুব লজ্জা করছে ভাই।

আমি বললাম—কেন?

হুটু বললে—আমাদের বাড়িতে গিয়ে তুই কত কষ্ট পেয়েছিস।

বললাম—কষ্ট হলে তো আমি নিজেই চলে আসতুম।

আর একদিন জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, তোদের এত লোকজন, এদের তো মাইনে দিতে হয়?

বললাম—তা না দিলে ওরা কাজ করবে কেন, ওরা খাবে কী?

—কত করে মাইনে পায় মাসে?

বললাম—তা জানি না। তবে দশ টাকা, পনেরো টাকা, কুড়ি টাকা নিশ্চয় পায়—

চমকে উঠলো হুটু। বললে—ভারি তো কাজ, এর জন্যে কুড়ি টাকা মাইনে পায়! তা হলে তো সা'মশাইয়ের আড়তের কয়াল কেদারবাবুর চেয়েও বেশি পায় রে—

বললাম—এটা যে কলকাতা শহর রে! গাঁয়ের চেয়ে শহরে তো বেশি মাইনে পাবেই—

হুটু কী যেন ভাবলে। বললে—আমি যদি ভাই শহরের মানুষের বাড়িতে জন্মাতুম তো বেশ হতো, না রে? বেশ বসে বসে তোর মত আয়েস করে ভাত খেতুম! কেউ কিছু বলতো না—

তারপর একটু থেমে বললে—তুই যে টাকা উপায় করিস না তার জন্যে তোকে তোর বাপ কিছু বলে না?

বললাম—না—

—তুই যদি একটা ভেড়া পুষিস তাহলেও তোকে তোর বাবা কিছু বলবে না?

বললুম—না—

—যদি ময়ূর পুষিস?

—না, তাহলেও কেউ কিছু বলবে না আমাকে—

হুটু আমার দিকে অনেকক্ষণ ভালো করে চেয়ে দেখলে। যেন একটু হিংসে করতে লাগল আমাকে। কিংবা যেন বিস্ময়! যেন আনন্দ!

—আমি যে তোদের বাড়ি বসে তোদের ভাত খাচ্ছি, তার জন্যে তোকে কেউ কিছু বকবেও না?

বললাম—না, কেউ বকবে না।

ভুটু বললে—আমাকে আরো কতদিন থাকতে দিবি?

বললাম—যতদিন তুই থাকতে চাস।

ভুটু বললে—কিন্তু আমি তো তোদের অনেক খরচ করিয়ে দিচ্ছি—

বললাম—আমিও তো তোর অনেক খরচ করিয়ে দিয়েছি। তার বেলায়?

ভুটুর মুখটা খুব করুণ হয়ে উঠলো। বললে—দূর, তুই যে কী বলিস! সে কী মোটা-মোটা চালের ভাত! তাও কি তোকে পেট ভরে খেতে দিতে পেরেছি? এই রকম মাছ-ডিম-মাংস খেতে দিতে পেরেছি? ঘি খেতে দিতে পেরেছি তোদের মতন? সন্দেশ, রসগোল্লা, চা কিছু খেতে দিতে পেরেছি?

বলে ভুটু মুখখানা আরো করুণ করে রইল।

আমি বললাম—কিন্তু তুই আমাকে যা দিতে পেরেছিস আমি যে তোকে তাও দিতে পারছি না।

—আমি তোকে কী দিতে পেরেছি?

—কেন, তুই যে সেই অত বড় মাঠ-বাগান-ধানক্ষেত দিতে পেরেছিলি, অত খোলা হাওয়া, মেঠো পথ, বাঁশবাগান, পাখী দিয়েছিলি, সে সব কি আমি দিতে পারছি তোকে? সে যে টাকা দিয়েও কেনা যায় না—

ভুটু আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বোধ হয় কিছু বুঝতে পারলে না।

ভুটু জানতো না যে পয়সা দিয়ে যা কিনতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে পয়সা না-দিয়ে যা পাওয়া যায় তার দাম অনেক বেশি। পয়সা দিয়ে যদি কিনতে পাওয়া যেত তাহলে যারা বেশি পয়সার মালিক তারা মাছ-মাংস-ডিম-সোনা রুপো-হীরের মত পৃথিবীর সব রোদ, সব হাওয়া, সব আলো, সব আকাশ, সব পাখির গান কিনে ব্যাঙ্কের সেফ্-ডিপোজিট্ ভল্টে পুরে রেখে দিত! ভাগ্যিস ওগুলো এখনও পণ্য হয়ে ওঠেনি!

হরিসাধনবাবু খবর পেয়ে আবার পড়াতে এলেন। সব শুনলেন আমার মুখ থেকে। বললেন—ছেলেমানুষ তুমি, তাই বুঝলে না। দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্যাদা বোঝেও না। তোমার দোষ নেই। মাথার ওপর বাবা যে কী জিনিস তা বড় হলে বুঝতে পারবে।

হরিসাধনবাবুর যেটুকু বলবার অধিকার তা বললেন। আমারও যেটুকু শোনবার তা শুনলাম।

তারপরে ন্টুকে দেখে তিনি যেন নাক সিটকোলেন।

বললেন—এটা কে ?

বললাম—এই-ই তো ন্টু, আমার বন্ধু—যার কথা আপনাকে বলতুম—

হরিসাধনবাবু ন্টুর আপাদমস্তক, তার চাল-চলন হাব-ভাব, তার খোঁড়া-পা, সব কিছু দেখলেন।

তারপর ন্টুকে বললেন—তুমি এখন অন্য ঘরে যাও তো, জ্যোতি এখন পড়বে—

ন্টু আমার দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলে। আমার অনুমতি পেয়ে সে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল। ন্টুর খোঁড়া পায়ের হাঁটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন হরিসাধনবাবু। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, ততক্ষণ দেখতে দেখতে তাঁর মুখে যেন একটা ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—ও ছোঁড়াটাকে তুমি বাড়িতে নিয়ে এসেছ কেন ?

কথাটা আমার শুনতে ভালো লাগলো না। আমি বললাম—এমনি—

হরিসাধনবাবু তবু ছাড়লেন না। জিজ্ঞেস করলেন—এমনি মানে ?

বললাম—ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে আমার ভালো লাগলো—

—কিন্তু ও তো একটা লোফার! ইল্লিটারেট, আগ্লি লোফার! জাতে বোধ হয় চাষা—

আমি সংশোধন করে দিলাম। বললাম—না স্যার, চাষা নয়, তার চেয়েও নিচু র‍্যাঙ্কের। মজুর—

—তবে ? আমি তো ওর রূপ দেখেই বুঝতে পেরেছি। ওর সঙ্গে আর মিশো না। ওকে বাড়ি থেকে এখুনি চলে যেতে বলো। শেষকালে হয়ত আরাম পেয়ে গেলে আর চলে যেতেই চাইবে না এখান থেকে। তাড়িয়ে দিলেও যাবে না—

বললাম—না স্যার, তা ঠিক নয়, ও গোড়া থেকেই চলে যেতে চাইছে। এত আরাম ওর ভালো লাগছে না, বলতে গেলে আমিই ওকে আটকে রেখেছি—।

—কেন ? আটকে রেখেছ কেন ? ও আপদ চলে গেলেই তো ভালো। দূর করে দাও, দূর করে দাও। মিস্টার সেন কিছু বলেননি ?

বললাম—হ্যাঁ বলেছেন।

—কী বলেছেন ?

—ওই আপনি যা বললেন বাবাও তাই-ই বলেছেন। বাবাও বলেছেন ইল্‌লিটারেট আগ্‌লি লোফার!

—তা মিস্টার সেন তো ঠিকই বলেছেন। অন্যায় কিছু বলেননি। কোথায় শোয় ও?

বললাম—আমার সঙ্গেই শোয়—

—একই বিছানায়?

—হ্যাঁ।

—খাওয়া? একই সঙ্গে খাও নাকি আবার?

বললাম—আমরা এক টেবিলেই খেতে বসি।

হরিসাধনবাবু বললেন—ভেরি ব্যাড্, ভেরি ব্যাড্! ওকে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি তোমার। একটা ব্যাড এক্‌জাম্পল্ সেট করলে তুমি। এর পরে যদি কখনো ওকে মাটিতে খেতে দাও তখন তো ও আপত্তি করবে, রিভোল্ট করবে। তখন সব জিনিসে সমান-সমান ভাগ বসাতে চাইবে—

বললাম—তা বসাক না—

—কী বলছো তুমি? ও তোমার জিনিসে ভাগ বসাবে? এতদিন তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তোমার এই বুদ্ধি হয়েছে? ও আর তুমি? একজন মজুরের ছেলের সঙ্গে ব্যারিস্টারের ছেলের তুলনা? আর ইউ ম্যাড?

এখন এতদিন পরে কথাগুলো মনে পড়ে হাসি আসছে। আজকের যুগের যে বিষবৃক্ষ আমরা দেখছি তার চারা বোধহয় সেই যুগেই পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। নইলে বাবা যা বলেন বলুন, আমার মাস্টার মশাই তো আমাদের মতন বড়লোক ছিলেন না। তবে তাঁর কেন এত গরীব-বিদ্বেষ! আসলে ভেবে দেখেছি বড়লোকরাও গরীবদের দেখতে পারে না; আবার গরীবরাও গরীবদের দেখতে পারে না। যেমন developed দেশগুলোর সঙ্গে un-developed দেশগুলোর সম্পর্ক। যে সব দেশ undeveloped তাদের চিরকাল লড়াই করে যেতে হবে। তারা যাতে কোনও দিন developed না হয় তার জন্যে Aid-দাতারা চিরকাল তাদের দাবিয়ে রাখবে। তাদের লড়াই করতে হবে তুটো ফ্রন্টে, এক বড়লোক দেশগুলোর সঙ্গে আর তুই undeveloped দেশগুলোর সঙ্গে। মুটুরা চিরকাল undevelopedই থেকে যাবে। বাবারাও তাদের শত্রু, আবার হরিসাধনবাবুরাও তাদের বিরুদ্ধে। সত্যিই মুটুদের এ কি কম জ্বালা!

সেদিন বাবার ঘরে হঠাৎ না বলে-কয়ে আমি ঢুকে পড়লুম।

বাবা আমাকে দেখে অবাক। আমি তো এমন করে কখনও তাঁর চেম্বারে ঢুকি না! আমি কোনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলুম—তুমি মুটুর টাকা কবে দেবে?

—কিসের টাকা? কে মুটু?

বাবার বাইরের খোলসটা বোধ হয় তখনও ভাঙেনি। সব বড়লোকেরই একটা খোলস থাকে। সেই খোলসটা তারা সচরাচর খুলতে চায় না। খুলতে চায় না কারণ খুললেই তারা সাধারণ হয়ে যায়। যারা সাধারণ মানুষ তারা অসাধারণ মানুষ হবার জন্যেই সব সময় খোলস ধারণ করে থাকে। কিন্তু আমি ছেলে হয়ে যদি নিজের বাবাকে না চিনতে পেরে থাকি তো কেন আমি তাঁর ছেলে হলাম?

বললাম—তুমি যে লিখেছিলে, যে আমাকে খুঁজে দিতে পারবে তাকে তুমি দশ হাজার টাকা দেবে?

বাবা যেন বিরক্ত হলেন। নিজের ফাইলটা দেখতে দেখতে ব্যস্ততার ভান করতে লাগলেন।

বললেন—ও তো চাষার ছেলে, দশ হাজার টাকা নিয়ে ও কী করবে? ও কখনও হাজার টাকাই চোখে দেখেছে?

আমি বললাম—কিন্তু হাজার টাকা যে চোখে দেখেনি তাকে তুমি টাকা দেবে না এমন কথা তো তুমি বলোনি!

কথাটা বাবার কাছে আদালতের উকিলের মত যেন শোনালো। বললেন—টাকা আমি যদি না দিই তো ও কী করতে পারে? ধরো টাকা আমি দিলাম না—

—কিন্তু টাকা তোমাকে ওকে দিতেই হবে। তোমাকে আমি তোমার কথার খেলাপ করতে দেব না।

—কেন? আমি যদি ওকে টাকা না দিই তো তোমার কিসের দায়? তুমি ওর কে?

সেই বয়েসেই বোধ হয় আমার 'আমি' বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল। নইলে অতবড় রাশভারি ব্যারিস্টারের মুখের ওপর আমি অমন করে কথা বলতে পারলামই বা কী করে? হয়ত সেইজন্যেই একদিন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতে পেরেছিলাম। কারণ সেই বয়েসেই বুঝতে পেরে-

ছিলাম যে বাবা ছিলেন সেই ব্রিটিশ শক্তিরই প্রতিভূ, তাদের দেওয়া রায়-বাহাদুর খেতাবটির প্রাপক। তাঁর ধারণা ছিল ব্রিটিশ-প্রভু বাবার মেরিট দেখেই তাদের খেতাব বর্ষণ করেছে তাঁর ওপর। আসলে বাবা জানতেন না যে শুধু খেতাব নয়, পার্থিব যা-কিছু কোনটাই যথাস্থানে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ অহং বস্তুটা সব কিছু নিজের প্রাপ্য বলে মনে করে গ্রাস করে।

আমি হঠাৎ বললাম—তুমি যদি ওকে টাকা না দাও তাহলে আমি কিন্তু আবার বাড়ি থেকে চলে যাবো—

বলে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে আসতেই হুটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে এল।

বললে—কী রে? আমার জন্যে কেন তুই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলি? তার চেয়ে আমি ভাই চলে যাই—

বললাম—তোর সঙ্গে আমিও যাবো, আমিও এ-বাড়িতে আর থাকবো না—

হুটু বললে—তুই কেন যাবি? এই বাড়ি, এই গাড়ি, এই আরাম ছেড়ে চলে যাবি, তোর কিসের দুঃখু?

বললাম—যেখানে তোর খাতির নেই সেখানে আমারও জায়গা নেই—

২০

—স্যার?

জ্যোতির্ময় যেন চমকে উঠেছেন। বললেন—কী?

শঙ্কর বললে—চা হতে দেরি হচ্ছে জ্যোতিদা, আপনি কিছু মনে করবেন না।

—কী আশ্চর্য, মনে করবো কেন?

শঙ্কর বললে—না, সব বেটা চোর, কেউ আর ভালো নেই দুনিয়ায়, আপনার জন্যে এক টিন বিস্কুট এনেছিলাম, বিলিতি বিস্কুট, আমি নিজে কিনে এনেছিলুম নিউ মার্কেট থেকে। হ্যাগলভ্ বিস্কুট। দেখি, বেটারা সব খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—

—কিন্তু আমি তো বিস্কুট চাইনি শঙ্কর, শুধু চা চেয়েছিলুম—

শঙ্কর বললে—শুধু চা কি দেওয়া যায় নাকি? কিন্তু কী বদমাইস দেখুন

বেটারা, আপনার জন্যে রাখা বিস্কুট কিনা খেয়ে ফেললে! এত চোর নিয়ে কাজ চলে? আমি আসছি—

বলেই আবার ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেল—

শঙ্কর আমার চায়ের বন্দোবস্ত করতে আবার বাইরে চলে গেল। শঙ্করের ধারণা সে আমার জন্যে যত খাটবে ততই আমি খুশী হবো। ভালোবাসা জিনিসটা ভালো। শ্রদ্ধাও ভালো জিনিস। ওটা দেখানো বা প্রকাশ করা হয়ত আরো ভালো জিনিস। কিন্তু 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই কথাটা মুখে বলার চেয়ে ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ স্বার্থত্যাগ করাটা আরো কার্যকরী। সুটু যে আমাকে ভালবাসতো সে-কথা মুখে সে কখনও বলেনি। তার ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছিল সে স্বার্থত্যাগ করে। বৈকুণ্ঠকে সে যে খুব ভালবাসতো এটা সবাই-ই জানতো। কিন্তু যখন দরকার পড়লো তখন সেই ভালবাসার বস্তুকে ত্যাগ করতেও তার এক মিনিট দেরি হলো না।

কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে সুটুর তুলনাই বা করছি কেন?

আমি আজ চীফ্ মিনিস্টার, তাই শঙ্করের এত ভক্তি। আর আমি যখন কিছুই ছিলাম না তখন সুটু কিসের স্বার্থে আমাকে ভালবেসেছে?

জেলখানার মধ্যে বসে বসে জ্যোতির্ময় সেন অনেক বই পড়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিতার একটা জায়গা বড় ভালো লেগেছিল:

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কৃষ্ণপ্রীতিই হলো আসল প্রীতি। আর সব প্রীতি আত্মপ্রীতি।

কিন্তু এই কৃষ্ণই বা কে?

অর্জুন কৃষ্ণকেই একবার এই প্রশ্ন করেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—তুমি কে?

কৃষ্ণ বলেছিলেন—আমি সর্বভূতে আদি, অন্ত ও মধ্য। আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমি সূর্য, নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র, দেবতার মধ্যে আমি ইন্দ্র, রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি। আমার আদি তত্ত্ব দেবতারাও জানে না কারণ আমি দেবতাদেরও আদি কারণ—

এ-সব তত্ত্ব সেদিন কিছুই বোঝেননি জ্যোতির্ময় সেন। সব জিনিস

কি সবাই বোঝে ? তবু সেদিন নিজের আনন্দের জন্যে নিজের মনেই এ-সব কথার একটা নিজের মত মানে করে নিয়েছিলেন। তিনি মানে করেছিলেন যে ভারতবর্ষের ঋষিরা এই ব্রহ্মাণ্ডেরই আর এক নাম দিয়েছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে পৌরাণিক ব্যক্তি হিসেবে ধরে নিলেও ক্ষতি নেই, আবার প্রতীক হিসেবে ধরে নিলেও ক্ষতি নেই। কোন্ হিসেবে তুমি তাঁকে গ্রহণ করবে তা তোমার অভিরুচি।

কিন্তু আমরা সামাজিক মানুষ। আমরা ও-সব তো বুঝবো না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, বাসনা আছে, হিংসে, রাগ, দুঃখ, যন্ত্রণা সবই আছে। আমাদের কারবার আমাদের সমাজ নিয়ে। যে-সমাজে আমরা সৃষ্টির আদিকাল থেকে সংগ্রাম করে আসছি। ত্যাগে আমাদের স্পৃহা নেই, ভোগে আমাদের পুরো আসক্তি আছে। এবং যতক্ষণ তা আছে এবং যতক্ষণ তা জয় করতে না পারছি ততক্ষণ রাজনীতি সমাজনীতির মধ্যেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার সব রকম চেষ্টা আমরা করে যাবো।

সেদিন হঠাৎ হরিসাধনবাবু পড়াতে পড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন—সেই ছোঁড়াটা গেছে ?

—কে ? কার কথা বলছেন ?

—সেই যে, কী যেন নাম ছোঁড়াটার !

তিনিও মনে করতে পারলেন না হুটুর নাম। কিংবা নাম মনে রাখাটা যেন অপমানকর বলে মনে হলো তাঁর কাছে।

একদিন বললেন—তুমি এখন বুঝছো না জ্যোতি। মাথার ওপর বটগাছ আছে তো, তাই নিশ্চিন্ত আরামে আছো। এই বাড়ি, এই চাকর-দারোয়ান ড্রাইভার-ঠাকুর কজন ছেলের আছে—তবু এতেও তোমার মন ভরে না ?

আমি বললাম—আমার একলার মন ভরলে কি চলবে মাস্টার মশাই ?

হরিসাধনবাবু বললেন—কিন্তু তুমি ক'জনের দুঃখ ঘোচাতে পারবে ?

আমি বললাম—ওদের সংখ্যাই যে বেশী মাস্টার মশাই ! ওরা কতদিন আমাদের এই গাড়ি বাড়ি চাকর দারোয়ান সহ্য করবে ? যেদিন ওদের চোখ খুলবে সেদিন যে আগুন জ্বালিয়ে সব ছাই করে তবে ঠাণ্ডা হবে !

হরিসাধনবাবু বললেন—তুমি একলা চেষ্টা করলেও তো তা পারবে না,

তোমার বাবা চেষ্টা করলেও তা পারবেন না। এর জন্যেই তো গভর্ণমেণ্ট রয়েছে—

—ও তো বিদেশী গভর্ণমেণ্ট! ইংরেজরা তো আমাদের পর!

হরিসাধনবাবু বললেন—সে যখন দেশ স্বাধীন হবে, তখনকার কথা তখন ভেবো। ব্রিটিশরা কি কাঁচা ছেলে? তারা এতদিন ধরে এত টাকা এখানে লাগিয়েছে, সে-সব উসুল করবে না?

তারপর একটু থেমে বললেন—আর তাছাড়া ব্রিটিশরা খারাপটা কী? তারা কি খারাপ লোক? তারা কত ভালো তা জানো? কত বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিত আমাদের দেশ সম্বন্ধে হিস্ট্রির বই লিখে গেছে। আমাদের দেশের কোনও লোক তা লিখতে পেরেছে? ইংরেজদের ওপর অত রাগ কেন লোকের বুঝতে পারি না। এই যে তোমার বাবা……

বলে একটু দম নিলেন হরিসাধনবাবু।

তারপর বললেন—এই যে তোমার বাবা, তোমার বাবা রায় বাহাদুর হয়েছেন। তোমার বাবার গুণ ছিল, তারা সে-গুণের কদর বুঝেছে তাই রায় বাহাদুর টাইটেল দিয়েছে। দিশী লোকেরা থাকলে দিত? তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের দেখবে, না পরের কথা ভাববে?

তা সেদিন হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো।

আমি আর হুটু বিকেলবেলা বাড়ির উঠোনে খেলা করছি, হুটুর নতুন জামা-প্যাণ্ট কিনিয়ে দিয়েছি বাবাকে বলে। ঠিক যেমন আমার জামা, তেমনি জামা হুটুর। হঠাৎ বাড়ির উঠোনে একটা গাড়ি এসে ঢুকলো আর গাড়ির ভেতরে দেখলাম একজন মহিলা বসে আছেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বড় চমৎকার দেখতে তাঁকে। চমৎকার সাজগোজ।

গাড়িটা আসতেই আমাদের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের ড্রাইভার সুখদেও আর আমার চাকর রঘু শশব্যস্ত হয়ে দৌড়ে গেল সেদিকে। কী সব কথা বলতে লাগলো সসম্ভ্রমে। খুব শ্রদ্ধা খুব ভয় তাদের ব্যবহারে।

মহিলাটি আমাদের দিকে আঙুল দিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন।

রঘু আর সুখদেও আমার দিকে ফিরে দেখে কী যেন বললে তাঁকে।

আর তারপর গাড়িটা যেমন এসেছিল তেমনি আবার বাইরে বেরিয়ে গেল।

গাড়িটা চলে যাবার পর আমি রঘুকে জিজ্ঞেস করলাম—ও কে রে রঘু? ও কে এসেছিল?

রঘু উত্তর দিতে একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—ও আমাকে দেখিয়ে কী জিজ্ঞেস করছিল রে?

রঘু বললে—উনি জিজ্ঞেস করছিলেন খোকা কবে ফিরেছে—

—কে উনি? বাবার ক্লায়েণ্ট বুঝি?

রঘু বললে—না—

—তবে কে?

রঘু সে-কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা পাড়লে। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমার সেই কিশোর মনেই কেমন একটা সন্দেহ হলো। ক্লায়েণ্ট হলে আমার খবর নিচ্ছে কেন? আগে কখনও দেখিনি মহিলাটিকে। তবু মনে হলো আমার ওপর তাঁর এত কৌতূহল যেন অস্বাভাবিক।

ফুটু এ-সব ব্যাপারে বেশি কৌতূহল প্রকাশ করতো না। সে যে এ বাড়িতে থেকে আমার সঙ্গে সব কিছু সমান ভোগ করে যাচ্ছে, এতেই যেন সে আড়ষ্ট হয়ে থাকতো। আমার খাটে দামী বিছানায় শুয়ে সে শান্তিতে ঘুমোতে পারতো না। কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়ছিল সে দিন-দিন। জল থেকে মাছকে ডাঙায় তুলে আনলে যা হয়।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম—তোর কি এখানে ভালো লাগছে না রে?

সঞ্জীবচন্দ্র 'পালামৌ' বইতে লিখেছেন—'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' ফুটুরাও বোধ হয়ে শহরে বেমানান। সভ্য-ভব্য সাজে ফরসা জামাকাপড়ে ফুটুরা বোধ হয় বেখাপ্পা। আমি তাকে যত সহজ হতে বলি সে তত আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

একদিন সে বললে—আমি কবে ময়নাডাঙায় ফিরে যাবো ভাই?

আমি বললাম—কেন, এখানে তোর ভালো লাগছে না?

ফুটু বললে—কিন্তু আমি কতদিন আর এখানে থাকবো?

বললাম—চিরকাল। যতদিন আমি থাকবো এ-বাড়িতে—

—কিন্তু ওরা যদি কিছু বলে ?

—কারা কী বলবে ?

—ওই তোদের বাড়ির চাকর-বাকর সবাই যে আমাকে জিজ্ঞেস করে।

—কি জিজ্ঞেস করে ?

—জিজ্ঞেস করে আমি কবে চলে যাবো এ-বাড়ি থেকে।

আমি রেগে গেলাম খুব। বললাম—কে তোকে বলেছে ও-কথা বল্, আমি এখুনি তাকে ডেকে ধমকে দেব। তার চাকরি খাবো। কার এত বড় আস্পর্ধা তোকে ও-কথা বলে ? বল্ কে তোকে এ-কথা বলেছে ? নাম বল্ তার ?

মুটু বড় লজ্জায় পড়লো। একে সে এ-বাড়িতে অবাঞ্ছিত, তাতে আবার চাকরদের ওপর অভিযোগ করছে, এটা তার ভালো লাগলো না। লেখা-পড়া না জানলে কী হবে, আত্মসম্মানবোধটা বোধ হয় অনেকের কাছেই জন্মগত। এই আত্মসম্মানবোধই মানুষকে মানুষ করে তোলে। কিছুতেই মুটু কারোর নাম বললে না। শেষকালে আমি সকলকে ডাকলাম। বাবার যত কর্মচারী ছিল, যত চাকর-ঝি-দারোয়ান-ড্রাইভার-ঠাকুর সকলকে ডেকে নিয়ে এলাম আমার ঘরে।

সকলকে ডেকে বললাম—দেখ, এই মুটু আমার বন্ধু। যে একে অসম্মান করবে তাকে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। বাবাকে বলে তার চাকরি খাবো। এও যা আমিও তাই। একে দেখলে সবাই এখন থেকে সেলাম করবে।

মুটুর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। বললে—না রে জ্যোতি, তোর পায়ে পড়ি, আমি ওদের সেলাম নিতে পারবো না। আমি ভাই গরীব লোকের ছেলে, ওদের সকলের চেয়ে গরীব। আমার ভারি লজ্জা করবে—

আমি বললাম—তুই চুপ কর্—

সেই ছোটবেলা থেকেই আমার যেন কেমন রোখ চেপে গিয়েছিল। আমার কেবল মনে হতো গরীব লোকদের ছোট নজরে দেখলে একদিন তাদের চোখেও আমরা ছোট হয়ে যাবো।

একদিন মাস্টার মশাইকেও সেই কথা বলেছিলাম।

হরিসাধনবাবু বলেছিলেন—আমি গরীবদের ছোট নজরে দেখি কে তোমাকে বললে ? আমি তোমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াইনি—

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' ?

আমি বলেছিলাম—তাহলে আপনি হুটুকে কেন দেখতে পারেন না? ওর দোষ কী? ও গরীব লোকের ছেলে বলে? ও খোঁড়া বলে?

হরিসাধনবাবু কথাটা শুনে প্রথমটায় থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমটা উত্তর দিতে পারেননি। তারপর সামলে নিয়ে বলেছিলেন—আমি তো তোমাকে সে-কথা বলিনি। আমি বলেছিলাম তুমি একটা গরীবকে বাড়িতে এনে গরীবদের কতটুকু সুরাহা করতে পারবে? এর জন্যে গভর্ণমেণ্ট রয়েছে, দরিদ্র-ভাণ্ডার আছে, গভর্ণমেণ্টের তৈরী হাসপাতাল আছে। সেখানে তাকে ভর্তি করে দাও। জানো, এই কলকাতা শহরে চল্লিশ হাজার লোক রাস্তায় ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটায়, পনেরো হাজার লোক ভিক্ষে করে খায়!

—তাদের কী দশা হবে তাহলে?

—তুমি একলা কতজনের দুর্দশা দূর করবে? এ তো তোমার একলার দ্বারা সম্ভবও নয়। সেই জন্যেই তো গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্স নিচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্সের সৃষ্টিই তো ওই জন্যে—

আমি বললাম—গভর্ণমেণ্ট তো গভর্ণমেণ্টের ডিউটি করছে, কিন্তু আমার ডিউটি যদি আমি না করি তো কে করবে?

হরিসাধনবাবু রেগে গেলেন। বললেন—যা জানো না তা নিয়ে তর্ক করো না। তুমি ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাকবে। এখন লেখাপড়া নিয়ে থাকো—

হরিসাধনবাবু শেষের দিকে খুব রেগে যেতেন, কারণে-অকারণে আমার ওপর কড়া কথা বলতেন। বলতেন—দৈত্যকুলে যে এমন প্রহ্লাদ জন্মায় তা জানতাম না—

অথচ খারাপ ছেলের সঙ্গে যাতে না মিশতে পারি তার জন্যে বাবা কি কম চেষ্টা করেছেন? স্কুলে পর্যন্ত পাঠাতেন না আমাকে পাছে স্কুলের ছেলেদের কুসংসর্গ আমাকে বিপথে নিয়ে যায়। কিন্তু কোথা থেকে যে এমন উপসর্গ জুটলো তা বাবারও যেমন অজ্ঞাত ছিল, মাস্টার মশাইয়েরও ছিল তেমনি অজ্ঞাত।

সেদিন হরিসাধনবাবু বাবার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন—একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে—

—কী ?

—আমি জ্যোতির কথা বলতে এসেছি। জানেন, জ্যোতি আজকাল খুব ইমপার্টিন্যান্ট হয়ে উঠেছে—

বাবা কাজ করতে করতে বললেন—সেই জন্যেই তো আপনাকে রাখা হয়েছে—

হরিসাধনবাবু বললেন—কিন্তু আপনাকে বলে রাখা ভালো, কোথাকার একটা চাষার ছেলেকে এনে এখানে তুলেছে, সে ওকে খারাপ করে দিচ্ছে, আমার কথা ও শুনছে না—

—আপনার কথা যাতে শোনে সেই জন্যেই তো আপনাকে রাখা!

—কিন্তু কথাটা আপনার কানে তোলা ভালো তাই তুলছি, আগে কিন্তু এমন ছিল না, তখন যা বলেছি তা শুনেছে। আপনি ওই ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিন, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

মিস্টার সেন একটু শুধু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—আপনি নিজে তাড়াতে পারেন না ?

—আপনি যদি পারমিশন দেন তো নিশ্চয়ই পারি।

—তা বেশ, তাড়িয়ে দিন, আমার আপত্তি নেই।

হরিসাধনবাবু এবার সাহস পেলেন। বললেন—ঠিক আছে, আপনি অনুমতি দিয়েছেন, আমার আর কোনও ভয় নেই—

তখন বুঝতাম না, কিন্তু এখন বুঝি। সে-যুগ হয়ত এসব বোঝবার যুগও ছিল না। মানুষের কল্যাণের জন্যে এই মানুষ যত ভেবেছে আর কোনও জিনিসের জন্যে সে তত ভাবেনি। একটা কথা হরিসাধনবাবুরা সে-যুগে বুঝতে পারেননি যে তোমার পাশের বাড়িতে যদি অশান্তি থাকে তো তোমার শান্তি একদিন-না-একদিন বিঘ্নিত হবেই। যাকে বলে ক্ষিধে, যাকে বলে দারিদ্র্য, যাকে বলে অশিক্ষা, যাকে বলে শোষণ, যাকে বলে বেকারত্ব, তা যতদিন থাকবে ততদিন পৃথিবীর শান্তি কোথায় ? সেই জন্যেই Danilo Dolci বলেছিলেন—under-privilege is a source of conflict.

মানুষের ইতিহাসে এই অশান্তির উৎস খুঁজতে গিয়েই মানুষ আস্তে আস্তে তার নিজের সমাজ-ব্যবস্থা বদলাবার চেষ্টা করে চলেছে, এমন কি নিঃশব্দে ডিক্‌শনারিও বদলে দিচ্ছে। ইংরিজি ডিক্‌শনারির কত শব্দের মানে বদলে গেল দেখতে দেখতে। আগে যাকে বলা হতো 'Command' এখন তাকে বলা

হয় Co-ordination, আগে কথাটা ছিল 'Power' এখন তাকে বলা হয় Responsibility। এই রকম Obey কথাটা হয়ে গেছে Consent, Merit হয় গেছে Capability, Punishment কথাটা হয়ে গেছে Treatment, Rights হয়ে গেছে Effective capacity, Exploitation হয়ে গেছে Fulfilment, আগে যাদের বলা হতো Under-developed, এখন তাদের বলা হয় Developing, বাঙালীদের অনেক বাড়িতে এখন ঝিকে আর 'ঝি' বলা উঠে গেছে, তাদের বলা হয় 'মেয়ে'। 'চাকর' শব্দের বদলে 'লোক'।

এ কেন হলো ?

অনেক ঠেকে, অনেক রক্তক্ষয় করে, ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে সমাজের সমন্বয় সাধন হয়। তবু কোথায় বুঝি ভুল থেকে যায়। আর সেই ভুলটা শোধরাতে গিয়েই একদিন আবার যিশু খ্রীষ্টদের খুন হতে হয়, সক্রেটিসদের বিষ খেতে হয়।

আর সমস্যা তো দিন-রাত গজিয়েই চলেছে একটার পর একটা। আমার আগে লর্ড কারমাইকেল যখন বাংলার লাটসাহেব ছিল, তখন তো এ-সব সমস্যা ছিল না। আগে থেকে যদি জানাই যেত কোন্ সমস্যাটা কবে উদয় হবে তাহলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাটাও তো করে রাখা যেত আগে থেকে।

ন্টু আমাকে সেদিন একলা পেয়ে ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে—কি রে, তোর মাস্টার মশাই কী বলছিল তোকে ?

আমি সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম—কিছু না—

—আমাকে নিয়ে বুঝি ?

আমি বললাম—হ্যাঁ, কিন্তু তোর সে-সব শুনে দরকার নেই। আমি যতক্ষণ তোর সঙ্গে আছি তোর কিসের ভয়। তুই কিছু ভাবিস নে—

রাত্রে সেদিন আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমি চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে আছি। আমার নিজের বাবার ওপরেও রাগ হচ্ছিল। আমার নিজের বাড়িতেই আমার নিজের অধিকার নেই! এ কী করে সহ্য করবো?

আমাদের সেই বিদ্রোহের কথা আজো মনে পড়ে। শুধু কি আমি? ন্টুও তো ময়নাডাঙায় তার বাবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো দিনরাত।

তখনকার দিনে হয়ত এমনি অবস্থা সব ছেলেদেরই। আমরা যেমন বাবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজছিলুম, ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীও হুকুম দিলেন ইস্কুল-কলেজ-কোর্ট-কাছারি ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে। আর ঘর থেকে বেরিয়ে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দেওয়া মানেই তো ইংরেজের জেলে গিয়ে ঢোকা!

তা জেলও তখন যেন ছিল আমাদের কাছে স্বর্গ। সেদিন ক'জন দেশ স্বাধীন করবার জন্যে ইস্কুল-কলেজ ছেড়েছিলুম জানি না, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন মুক্তি পেয়েছিলুম বাবা-মার অত্যাচারের হাত থেকে। বাড়ি তখন ছিল আমাদের কাছে নরক। বাড়িতে থাকলে অনেক কড়াকড়ি, অনেক দায়-দায়িত্ব, অনেক এগজামিন পাস করার ল্যাঠা। তার চেয়ে জেলখানা অনেক ভালো। সেখানে কোনও পরীক্ষায় পাস করার দায়িত্ব নেই, কালকে কী খাবো তার দুর্ভাবনাও নেই।

আর ঘেন্না হবেই বা না কেন বাবার ওপর? আমার ক্ষেত্রে এটা যেন ছিল একটা আবিষ্কার।

রঘুকে সেদিন ডাকলুম। বললুম—হ্যাঁ রে রঘু, সেদিন গাড়ি করে ও কে এসেছিল রে?

রঘু বুঝতে পারলে। কিন্তু আবার না-বোঝার ভান করলে সে।

আমি বললাম—বল্, তোকে বলতেই হবে, বল্—

রঘু চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—তোমার মা—

—আমার মা! আমার মা তো মরে গেছে।

রঘু এবার আর চাপতে পারলে না। হেসে ফেললে। বললে—তোমার নতুন মা—

আমি তখনও ভালো করে বুঝতে পারলুম না। বললুম—বাবা আবার কবে বিয়ে করলো?

রঘু বললে—বিয়ে করেনি—এমনি—

আমি এর বেশি আর রঘুকে ঘাঁটালাম না। রঘু যেন পালিয়ে বাঁচলো। বাড়ির ওপর তখনও আমার যেটুকু আকর্ষণ ছিল তাও যেন উবে গেল।

সেদিন থেকেই যেন আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেল। আমি সংসার চিনতে শিখলাম, জগৎ চিনতে শিখলাম। নিজেকে চিনতে শিখলাম।

সেদিন থেকেই ঠিক করলাম আমি একটা মহৎ কোনও কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবো।

শুয়ে শুয়ে সেদিন সেই কথাই ভাবছিলাম আমি। এ-সংসার যেমন আমার নয়, তেমনি এ-সংসার বাবারও নয়। বাবার একটা অন্য সংসার আছে। আমারও তেমনি বাইরের একটা জগৎ আছে। কী আশ্চর্য, শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যেমন শ্রীভগবানকে বলেছিলেন—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥

অর্থাৎ—তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করলে তাতে আমার এই মোহ দূর হলো।

সেদিন বিকেলে উঠানে সেই গাড়িতে বসা মহিলাটিকে না দেখলে আমারই কি মোহ ভঙ্গ হতো? আমিই কি একদিন মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে যেতে পারতুম? আমি সেদিন দেশের জন্যে জেল খেটেছিলুম বলে আমার তো গুন-কীর্তনের শেষ নেই। আমি নাকি অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছি। আমি আমার বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান হয়ে কংগ্রেসের জন্যে নাকি জীবন উৎসর্গ করেছি। এর পুরস্কার নাকি দেশ আমাকে দিয়েছে। কিন্তু আসলে আমি কী? আমি স্বার্থত্যাগ করেছি, না স্বার্থসিদ্ধি! কোন্‌টা?

হঠাৎ মনে হলো পাশ থেকে যেন হুটু চুপি চুপি উঠলো। তারপর আমার দিকে নজর দিয়ে ভালো করে দেখলে। দেখলে আমি অকাতরে ঘুমোচ্ছি। আর তার পর বিছানা থেকে নিঃশব্দে নামলো। নেমে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে খিল খুললে।

আমি তার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এ কি, কোথায় যাচ্ছে সে? বাইরে যাচ্ছে কেন চোরের মতন?

তারপর একসময় হুটু বাইরের বারান্দা ধরে নিচেয় নামলো সিঁড়ি দিয়ে। নেমে চলতে লাগলো সদরের দিকে।

আমি টিপি-টিপি পায়ে পেছন-পেছন চলেছি।

সে আগে আগে, আমি পেছন পেছন।

তারপর একেবারে সদর-গেটে।

দেখি সদর-গেটে দারোয়ান হুটুকে দেখে নিঃশব্দে গেট খুলে দিলে।

আমি আরও অবাক।

আর তারপরই হুটু রাস্তায় বেরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি দৌড়ে রাস্তায় পড়ে চিৎকার করে ডাকলুম—হুটু—হুটু—

হুটু আমার গলা পেয়েই দৌড়তে শুরু করেছে। কিন্তু খোঁড়া পায়ে আর কতদূর দৌড়বে। আর আমার সঙ্গে সে পারবেই বা কেন?

আমি কাছে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরতেই সে অপরাধীর মত কেঁদে ফেলেছে।

—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

হুটু কোনও উত্তর দেয় না।

বললাম—বল্, চলে যাচ্ছিস কেন?

হুটু বললে—আমাকে ছেড়ে দে ভাই জ্যোতি, আমি চলে যাই—

—কেন, তোর কী হয়েছে? এখানে তোর কিসের কষ্ট? আমাকে না বলে চলে যাচ্ছিস কেন?

হুটু কাঁদতে লাগলো। হুটুকে আমি আগে কখনও কাঁদতে দেখিনি।

কাঁদতে কাঁদতে বললে—মাস্টার মশাই আমাকে ভয় দেখিয়েছে—

—ভয় দেখিয়েছে মানে?

—বলেছে আমি যদি এখান থেকে না চলে যাই তো আমাকে মেরে ফেলবে! আমাকে পুলিসে দেবে!

তা মাস্টার মশাইয়ের কথায় তুই চলে যাচ্ছিস কেন? মাস্টার মশাই এ-বাড়ির কে?

হুটুর মুখটা সেই মাঝরাত্রের অন্ধকারের মধ্যেও বড় ফ্যাকাশে দেখালো।

সে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলে। বার করে আমাকে দেখালে।

—এ টাকাটা কিসের? কার টাকা? কে দিয়েছে তোকে?

হুটু বললে—তোর মাস্টার মশাই—

আমি হুটুকে আবার ধরে নিয়ে এলাম বাড়ির ভেতরে। খোঁড়া পায়ে দাঁড়িয়ে সে তখন থরথর করে কাঁপছে। যেন আমাকেও তার ভয় করছে। আমি যে আমি, যে-আমি তাকে আমার নিজের করে নিয়েছি সেই আমাকেও যেন তার আর বিশ্বাস নেই।

এই রকমই হয়!

আমি ভেবে দেখেছি, হুটুর সেদিন কোনও দোষ ছিল না। আমরা কি নিজেকেই সব সময় বিশ্বাস করি! বিশ্বাসেরও তো একটা স্তর আছে। পূর্ণ-বিশ্বাস, আধা-বিশ্বাস সিকি-বিশ্বাস। নিজেকে যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পারতুম তো আমাদের তো মুক্তি হয়ে যেত। পূর্ণ বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও, সিকির সিকি বিশ্বাসও কি করতে পারি সব সময়? বলতে কি পারি যে আমার আমির ওপর আমার সিকিমাত্র আস্থা আছে? যে তা বলে সে আসলে অহঙ্কার করে। ওই অহঙ্কারে আর বিশ্বাসে আকাশ-পাতাল ফারাক। অহঙ্কার কখনও কখনও বিশ্বাসের ছদ্মবেশ ধরে আমাদের ঠকায়। তাই বড় সাবধানে থাকতে হয় যেন মিথ্যে বিশ্বাস আমাদের বিপথে না নিয়ে যায়।

হুটুরও ঠিক সেই দশা হয়েছিল।

হুটু বললে—আমাকে ছেড়ে দে ভাই, আমি তোদের বাড়িতে আর থাকবো না—

আমি বললাম—কেন? আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোর ভয় কী? তুই কি আমাকেও বিশ্বাস করিস না, আমাকেও কি তুই পর ভাবিস? এতদিন মিশেও কি তুই আমাকে চিনলি না?

হুটু বললে—ভাই, তুই আর আমি এক নই! তুই আলাদা—

—কেন, আলাদা কিসে?

হুটু বললে—আমি যে গরীব, আমি যে খোঁড়া—

তার চোখ দিয়ে তখন ঝরঝর করে জল ঝরছে। আমার মনে হলো যেন আমারই আর একটা সত্তা হুটুর রূপ ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এক আমির মধ্যেই তো বহু আমি থাকে। বহুর সমন্বয়েই তো এক হয়। সেই এক মানেই তো আমি। মানে অহং।

দুর্বাসা মুনি কণ্বমুনির আশ্রমে এসে বলেছিলেন—অয়ং অহম্‌ভো—এক আমি প্রশ্ন করে, আর এক আমি সে-প্রশ্নের উত্তর দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সুমতি আর কুমতির মত এক আমি দুই হয়। কখনও আবার একই আমি বহু হয়। বহুর ঐক্য মিলিয়ে এক হয়ে আমি হয়, যে-আমি তোমাকে আমাকে সকলকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে প্রসারিত করে মহাকালের দিকে সঞ্চারিত করে দেয়।

আমি আর দেরি করলাম না সেদিন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুটুকে নিয়ে সোজা বাবার চেম্বারে গিয়ে হাজির হলাম। বাবার অভ্যেস ছিল ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার। আমি আর সুটু, সুটু আর আমি। বাবা আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু আসলে তিনি জানতেন না যে সুটু আমার আমিই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই তোমার?

বললাম—আমাকে টাকা দিচ্ছো না কেন?

বাবা বললেন—একে নিয়ে এসেছ কেন?

বললাম—এ সুটু—

বাবা বললেন—তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু নেই? এত লেখাপড়া শিখে কি এই বুদ্ধি হলো তোমার? তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে এই রেজাল্ট হলো আজ?

আমি বললাম—আমি লেখা-পড়া শিখে এই বুঝেছি যে কখনও মিথ্যে কথা বলতে নেই—

—হোয়াট্? আমি মিথ্যে কথা বলেছি বলতে চাও তুমি? অ্যাম আই এ লায়ার?

বললাম—তুমি তোমার কথা রাখোনি। তুমি কথা না রাখলে আমারই কথা না-রাখা হয়। এটা তুমি জানো না?

বাবার সকাল-বেলাটাই বেশি কাজ থাকতো। সারাদিন কোর্টের কাজের পর বাড়িতে আসতেন। তখন থেকে শুরু হতো মক্কেলদের আনাগোনা। রাত দশটার সময় তারা সবাই যে যার বাড়িতে চলে যেত। তারপর বাবা সেই ব্রিফ-কেসগুলোর মধ্যে ডুবে যেতেন। কে ফাঁকি দিয়ে কার সম্পত্তি হাত করতে চায়, কে কার নামে প্রপার্টি কিনে নিজে দখল করতে চায়, কারা ভাই-বোন মিলে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে

মামলা-মোকর্দমা করছে, তারই সব নিখুঁত কূট-কৌশল-চালাকির সিদ্ধকাম মন্ত্রদাতা ছিলেন বাবা।

বাবা বলতেন—অনেস্টি ডিজ্-অনেস্টি বলে কোনও কথা নেই, আমি বুঝি ল'। Law is no respector of persons. আইনের কাছে বড় নেই ছোট নেই, গরীব নেই, বড়লোক নেই। কিছু নেই—

বাবা আরো বলতেন—ব্রিটিশরা ইণ্ডিয়াকে তিনটে জিনিস দিয়েছে—তার জন্যে ইণ্ডিয়ানদের গ্রেটফুল থাকা উচিত।

হরিসাধনবাবু জিজ্ঞেস করতেন—কী কী?

—একটা হলো ইংলিশ লিটারেচার। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট্ লিটারেচার। দু'নম্বর হলো ক্রিকেট, ছ্যাট্ লর্ডস গেম। কিন্তু সব চেয়ে দামী কী জিনিস দিয়েছে বলুন তো?

হরিসাধনবাবু ইংরিজি লিটারেচারের ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। তিনিও হাত্ড়ে-হাতড়ে উত্তরটা খুঁজে পেতেন না।

বলতেন—ধরতে পারছি না।

বাবা বলতেন—ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্—

পৃথিবীতে বাবা সব চেয়ে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করতেন, তো সে নিজের বাবা নয়, নিজের পরলোকগত মা নয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কালী, শিব, যিশুখ্রীষ্ট, তথাগত বুদ্ধদেব, কেউ নয়। যাকে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করতেন সে হলো হাইকোর্টের চিফ্ জাস্টিস। চিফ্ জাস্টিসদের সব ফটো টাঙানো থাকতো বাবার লাইব্রেরিতে। বাবা মনে করতেন এই পৃথিবী-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রও হয়ত একদিন সূর্য-প্রদক্ষিণ করতে ভুল করতে পারে, সূর্যও হয়ত একদিন পূর্বদিকের আকাশে উঠতে দেরি করতে পারে, ভূমিকম্প হয়ে একটি পলের ভুলে পৃথিবীও হয়ত একদিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু হাইকোর্টের জজ্ কখনও ভুল করতে পারে না। সম্রাট সিজারের স্ত্রীর মত হাইকোর্টের জজ্ সমস্ত ভুল-ত্রুটি-পদস্খলন-সন্দেহের উর্ধ্বে।

এমন হাইকোর্ট-ভক্তি হয়ত আমার আইন-মন্ত্রীরও নেই। দিল্লির ল'-মিনিস্টারও হয়ত এখন এত ভক্তি করে না সুপ্রীম কোর্টকে। এই জজ্-ভক্তির জন্যেই হয়ত বাবা রায় বাহাদুর হয়েছিলেন। আর মজা এই যে, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্ই সেই বাবার ছেলেকে দু'বছরের জেল দিয়ে দিলে।

মনে আছে আমি যেদিন জেলে গেলুম, সেদিন হাজার-হাজার লোক

আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে চিৎকার করে উঠেছিল—বন্দে মাতরম বলে।

আবার দু'বছর পরে যেদিন ছাড়া পেয়েছিলুম, সেদিনও হাজার-হাজার লোক আমাকে দেখে চিৎকার করে স্লোগান দিয়েছিল—বন্দে মাতরম্—

সেই 'বন্দে মাতরম্'ই আবার একদিন হয়ে উঠল,—'জয় হিন্দ্'—

'জয় হিন্দে'র সে কী উদ্দামতা! 'জয় হিন্দ' বলতে লোকে পাগল। 'জয় হিন্দ' বললেই আমরা তাকে মাথায় তুলে নিতুম। পার্কে-পার্কে মীটিং শেষ হতো 'জয় হিন্দ' স্লোগান দিয়ে। লেকচারের শেষ হতো 'জয় হিন্দ' দিয়ে।

কিন্তু মানুষ বোধ হয় চিরকালই বুড়োদের বিপক্ষে। পুরনোকে সে দেখতে পারে না। বাড়িতে পুরনো ফার্নিচার রাখলে গৃহস্বামীর ইজ্জত যায়। বড়লোকরা গাড়ি বদলায় বছরে বছরে। নেহাৎ স্ত্রীকে বদলাবার আইন নেই বলেই এতদিন তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু 'হিন্দু কোড্ বিল' পাস হবার পর সে-পথও খুলে গেছে। আমরা কোর্টে গিয়ে স্ত্রী বদলাবার দরখাস্ত করি। শুধু স্ত্রী নয়, স্বামীও বদলাই।

তাই পুরনো 'জয় হিন্দ' বদলে এখন আমরা এনেছি 'লাল সেলাম'।

বাবা 'বন্দে মাতরম' পর্যন্ত দেখে গিয়েছিলেন। তিনি দেখে গিয়েছিলেন 'বন্দে মাতরমে'র প্রতিপত্তি। আমি 'বন্দে মাতরম' দেখেছি, 'জয় হিন্দও' দেখেছি। আবার এখন 'লাল সেলাম'ও দেখলাম। যদি আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকি তো, 'লাল সেলাম'কেও চলে যেতে দেখবো। তখন আবার নতুন কী স্লোগান আসবে তা কে জানে! কী আসবে তার উত্তর কেবল ইতিহাসই দিতে পারে। আর কারো দেবার সাধ্য নেই।

বাবার একজন বাবু ছিল। ব্যারিস্টারের বাবু। তাঁর নাম ছিল হাজারি চৌধুরী। হাজারিবাবু মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসতেন। খুব অল্প মাইনেই পেতেন বোধ হয়। কারণ তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বাবাকে খুব ভয়-ভক্তি করতেন। এক-একজন লোক থাকে সংসারে, যারা সব সময়ে নিজের অস্তিত্ব নিয়েই বিপন্ন। জুতোর সামান্য ফিতেটির জন্যেও তাদের মমতার অন্ত নেই, গায়ের সামান্য একটা ফুসকুড়িকেও যারা ক্যানসার ভেবে নিয়ে আতঙ্কিত, হাজারিবাবু তাদেরই মত একজন।

সেদিন হাজারিবাবু একলা আমাদের বাড়িতে এসেছেন। বাবা তখন নেই।

আমাকে দেখে চারিদিকে কেউ আছে কিনা যাচাই করে নিয়ে ডাকলেন।

বললেন—শোন, কী হয়েছে বল দিকিনি?

জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

হাজারিবাবু বললেন—সাহেব আজকে চেম্বারে খুব বকাবকি করছিলেন, বাড়িতে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি তোমাদের?

আমি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। হাজারিবাবু শুনে থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন যেন।

বললেন—তাই বল! আমরা তো চেম্বারে সবাই খুব তটস্থ হয়ে গিয়েছিলুম। তা তুমি আর ও নিয়ে ভাবছো কেন? তুমি এক কাজ করো না—

—কী কাজ?

হাজারিবাবু বললেন—তুমি ছেলেমানুষ, নিজের বাবার সঙ্গে কি রাগারাগি করতে আছে? সাহেব কত বিদ্বান, কত বুদ্ধিমান, তুমি তাঁর সঙ্গে কেন ঝগড়া করতে গেলে? বইতে পড়োনি পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ...

শুনেছি হাজারিবাবু ষাট টাকা মাইনে পেতেন বাবার কাছ থেকে। এবং ষাট টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কখনও বিড়ি-সিগারেট-পান খেতেন না। নিয়ম করে অফিসে আসতেন, আর মন দিয়ে কাজ করতেন।

মন দিয়ে যারা কাজ করে তারা হয় নিজের উন্নতির চেষ্টায় মন দেয়, আর নয় তো মন দিয়ে কাজ করা তাদের স্বভাব। যেমন অনেকের সত্যি কথা বলা স্বভাব। সত্যি কথা বললে বা সত্য আচরণ করলে পরলোকে স্বর্গে যেতে পারা যাবে, এ উদ্দেশ্য সকলের নাও থাকতে পারে। স্বভাবের জন্যে যেমন অনেকে চুরি করে, তেমনি স্বভাবের জন্যে অনেকে সন্ন্যাসীও হয়। একটা হলো খারাপ স্বভাব, আর একটা ভালো। এই খারাপ ভালোর ফারাকটা অনেকে ধরতে পারে না বলেই এত গণ্ডগোল হয় জীবনে। যেমন বই পড়ার নেশা, আবার মদ খাবার নেশা। বই পড়ার নেশাকে আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু মদ খাবার নেশাকে আমরা করি ঘৃণা। কিন্তু দুটোই নেশা। অথচ আমরা সকলকে উপদেশ দিই কখনও নেশা করিও না। অথচ দুটো কি আলাদা?

ওই হাজারিবাবুর ছিল মন দিয়ে কাজ করার নেশা। কখনও এক

মিনিট দেরি করে অফিসে আসা নয়। একদিনের জন্যেও গরহাজির হওয়া নয়।

হাজারিবাবু আরো বললেন—কেন তোমার ওপর সাহেব রাগ্ করেছেন? তুমি কী করেছিলে?

আমি বললাম—বাবা কথায় খেলাপ করেছেন—

হাজারিবাবু সমস্ত শুনলেন।

বললেন—দশ টাকা?

আমি বললাম—বাবা আমার মাস্টার মশাইকে দিয়ে দশ হাজার টাকার বদলে দশ টাকা গছিয়ে সুটুকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এতে বাবা অন্যায় করেছেন। আমি এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে চেয়েছি—

হাজারিবাবু খানিকক্ষণ মনে মনে যেন কী ভাবলেন। হয়ত মনে মনে ভাবতে লাগলেন আইনের কোন্ সেকশানে এ কেস্ পড়ে।

বললেন—চিটিং কেস্ বলছো তুমি এটাকে? এটা পেনাল-কোডের কোন্ সেক্শানে পড়বে তা তো বলতে পারছি না। আমি তোমাকে বই দেখে নিয়ে তবে বলতে পারি—

আমি বললাম—আইনে কী আছে তা নিয়ে বাবা মাথা ঘামান্ গে যান, আমি আইন মানি না। আইন তো মিথ্যে...

হাজারিবাবু যেন সামনে কেউটে সাপ দেখলেন। কিংবা চোখের সামনে আকাশ ভেঙে পড়তে দেখলেও বুঝি এত চমকাতেন না।

বললেন—ছি ছি, সেন সাহেবের ছেলে হয়ে তুমি কিনা এই কথা বললে?

তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বললেন না। আমার সঙ্গে কথা বলাও যেন তাঁর কাছে পাপ মনে হলো। যে-ছেলে আইনকে মিথ্যে বলে, তার ভবিষ্যতের দুর্দশার কথা ভেবে তিনি বোধ হয় সেদিন চমকে উঠেছিলেন। হাজারিবাবুদের কাছে আইনই হলো বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরাণ, সমস্ত কিছু—

হাজারিবাবু সত্যিই আমার সঙ্গে আর কথা বলতেন না তারপর থেকে। তারপর থেকে আমি হাজারিবাবুর কাছে আর মনুষ্য পদবাচ্য রইলুম না।

একদিন আমাকে আমার ল'-মিনিস্টার জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আপনি আইনকে এত ঘেন্না করেন কেন স্যার?

আমার ল'-মিনিস্টার জানে না যে আইনের মতন বে-আইনী জিনিস

ইণ্ডিয়াতে আর ছুটি নেই। আমি নিজে আইনের প্রণেতা হয়েও এই কথা বলছি, কারণ আমি নিজেই এই আইন ভেঙেছি। এই আইন ভেঙেই জেল খেটেছি। আবার ভাগ্যের কী বিরাট পরিহাস যে, যে-আইন ভেঙে আমি নিজে জেল খেটেছি, সেই আইন ভাঙবার জন্যেই আমি আবার অন্যদের জেল খাটাচ্ছি। আইন ভাঙবার জন্যেই আমি আজ হয়েছি দেশের চীফ মিনিস্টার, আবার চিফ-মিনিস্টার হবার জন্যেই অন্যরা এখন আইন ভাঙছে। যেটাকে একদিন আমি বে-আইনী বলেছি, আজকে আমিই আবার সেইটেকে বলছি আইন। আমি যখন আইন ভেঙেছিলুম তখন লোকে আমাকে ধন্য ধন্য করে আমার গলায় ফুলের মালা দিয়েছিল। এখন আমি আইন মানছি বলে লোকে আমার গলায় ফুলের মালা দিচ্ছে। সে যুগে মিস্টার জে. টি. সাণ্ডার-ল্যাণ্ড্ একটা বই লিখেছিলেন। তার নাম 'The Lawless Law' অর্থাৎ বে-আইনী আইন'। সেই ব্রিটিশ যুগে ব্রিটিশ সরকার সে-বই তাদের স্বার্থে ঘা লেগেছিল বলে বাজেয়াপ্ত করেছিল। আজকের আইন সম্বন্ধেও যদি আবার কেউ ওই নিয়ে বই লেখে তাহলে আমিও তা বাজেয়াপ্ত করবো।

এই-ই হলো নিয়ম।

এমনি করেই পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলেছে।

সেই স্বটুকে নিয়েই আমার সেই শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে সারা জীবনই আমার সেই শিক্ষাই চলছে।

স্বটু বার বার বলেছিল—দূর, আমাকে নিয়ে তুই এত ভাবছিস কেন! আমি গরীবের ছেলে, আমাদের অভাব কোন কালেই মিটবে না। তুই হাজার চেষ্টা করলেও মেটাতে পারবি নে—

আমি বলেছিলাম—তুই ছাখ না, আমি কী করি—

সেদিন আমি সত্যিই আইন ভাঙলুম। সে-ঘটনা আজকের এই আমার ল'মিনিস্টার জানে না, আমার পার্টির প্রেসিডেণ্টও তা জানে না।

হঠাৎ বাড়িতে হৈ-চৈ বেধে গেল। সকালবেলাই সোরগোল—চুরি চুরি! চুরি হয়েছে বাড়িতে। কৈলাশ, রঘু, কেশব, নিখিল সবাই সন্ত্রস্ত। মিস্টার সেন সবাইকে ডাকলেন। হরিসাধনবাবু যথারীতি সকালবেলা এসেছিলেন। তিনিও হতভম্ব।

—কী হয়েছে কৈলাস?—কী চুরি হয়েছে?

কৈলাস বললে—সাহেবের টাকাকড়ি, সোনায় ঘড়ি, হীরের বোতাম, দামী ক্যামেরা,—সব—

—সে কী! কী করে চুরি হলো? দারোয়ান কোথায় ছিল?

ততক্ষণে মিস্টার সেন থানায় খবর দিয়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে পুলিস-দারোগা এসে হাজির। তারা বাড়ির সামনে রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়ালো। সকলের বুক তখন ধুকপুক করছে। সাহেবের নিজের ঘরের ভেতর স্টীলের সিন্দুক খুলে চুরি হওয়া। চোরের তো বুকের পাটা খুব!

সে এক অদ্ভুত চোর। চুরির কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি সে। আরো কত দাম-দামী জিনিস ছিল সেগুলো সে নেয়নি। তাহলে চোরেরও আবার বাছ-বিচার আছে! ভিখিরির যেমন বাছ-বিচার থাকে, চোরেরও তেমনি।

একবার একটা ভিখিরি একটা আনি ফেরত দিয়ে দিয়েছিল জ্যোতির্ময় সেনকে।

রাস্তায় যেতে যেতে এমন তো কত ভিখিরি ভিক্ষে করে। জ্যোতির্ময় সেন তেমনি এক ভিখিরিকে একবার একটা এক-আনি দান করেছিলেন। দান করে চলে এসেছিলেন। কিন্তু তার দু'চার দিন পরে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একজন পেছন থেকে ডাকলো—বাবু, অ-বাবু—

জ্যোতির্ময় সেন পেছন ফিরে দেখলেন, সেই ভিখিরিটা।

বললেন—কী?

বলে কাছে এলেন। মনে ভেবেছিলেন ভিখিরি ভিক্ষে চাওয়া ছাড়া আর কী জন্যে তাঁকে ডাকবে?

ভিখিরিটা বললে—বাবু, সেদিন আপনি আমাকে একটা অচল আনি দিয়ে গেছেন—

কী রকম হলো! জ্যোতির্ময় সেন অবাক হয়ে গেছেন। কবে তিনি এ ভিখিরিকে ভিক্ষে দিয়েছিলেন তাও তাঁর মনে ছিল না। তাও একেবারে একটা অচল আনি!

বললেন—আমি তোমাকে ভিক্ষে দিয়েছিলুম নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, একটা আনি দিয়েছিলেন। আমিও বিশ্বাস করে সেটা নিয়ে নিয়েছিলুম। পরে ধরা পড়লো।

বলে থলি থেকে একটা আনি বার করে দেখালে। বললে—এই দেখুন—

জ্যোতির্ময় সেন অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—তা সেটা যে আমিই দিয়েছিলুম তা তুমি কী করে জানলে?

—আজ্ঞে, আনি তো কেউ দেয় না কখনও। সবাই পয়সা দেয়। কিন্তু আনি একমাত্তোর আপনিই দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই আপনার মুখটা চিনে রেখেছিলাম বাবু—

জ্যোতির্ময় সেন পকেট থেকে আর একটা দু'আনি বার করলেন। বললেন—এই নাও, সেদিনকার আর আজকের এই দু'দিনের দুটো আনি দিলাম তোমায়—

ভিখিরিটা মহা খুশী হয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলো।

কিন্তু জ্যোতির্ময় সেনের খট্‌কা গেল না। জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু একটা কথা বলো তো, তোমার এত পয়সা আধলার মধ্যে অচল আনিটা ধরা পড়লো কী করে? কিছু কিনতে গিয়েছিলে কোথাও?

ভিখিরি বললে—না বাবু, তা কেন? আমি ধরতে পারিনি, ধরলে আমার মহাজন—

—মহাজন? মহাজন মানে?

—বারে, আমার মহাজন নেই? আমাদের কি এত মূলধন আছে বাবু? মহাজন না থাকলে কে খাওয়াবে আমাকে? কে পরাবে? খাওয়া-পরার জন্যেই তো বেঁচে থাকা! এ সব পয়সা তো একটাও আমার নয়, সব মহাজনের। সেই মহাজনকে এই সব আমদানির হিসেব দিতে হবে যে—। সেই মহাজন রাত্তিরে সব হিসেবপত্তোর নেয়, কত আমদানি হয়েছে তা দেখে। কোন্‌টা অচল্ কোনটা চল্ তারও চুল-চেরা হিসেব করে—

এই ভিখিরিদের যেমন মহাজন থাকে, চোরেদেরও তেমনি। চোরেদেরও মহাজন থাকে। সেই মহাজনদের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয়। সেই মহাজন যদি বলে দেয় কোন্‌টা অচল আর কোন্‌টা চল্, তবেই সে পরিত্রাণ পায়। শুধু চোর আর ভিখিরিই বা কেন, যারা ভক্ত যারা অভাজন তারাও তো মহাজনকে ভজনা না করে এক পাও নড়ে না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ওঁরাও তো সব মহাজন। তাই তো তাঁদের রচনাকে বলা হয়—'মহাজন

পদাবলী'! মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। এখন এই মহাজনটি কে? বিভিন্ন মানুষের কাছে সে বিভিন্ন জন। ভিখিরির কাছে সে-ই মহাজন যে তাকে খাওয়ায় পরায়। কেরানীর মহাজন কাবুলিওয়ালা, যে তার বিপদে-আপদে মোটা সুদে টাকা ধার দেয়। পরম বৈষ্ণবের কাছে পদকর্তাই মহাজন। অভিধানে সবরকম মানেই লেখা আছে। ধার্মিক বা মহৎ ব্যক্তি, ব্যাপারি, আড়তদার, বণিক, উত্তমর্ণ, কুসীদজীবী, বৈষ্ণব পদকর্তা ইত্যাদি—

কিন্তু কথা হচ্ছিল চোর নিয়ে।

তা সেদিন একজন বাড়ির চাকরকে ডেকে জেরা করেছিল পুলিস। ঠাকুর, দারোয়ান সবাইকে জেরা করেছিল। শেষকালে কৈলাসকেই অ্যারেস্ট করলে দারোগা সাহেব। তার হাতে হাতকড়া পরালে। তারপর অকথ্য অত্যাচার করলে তার ওপর।

আমি তখন আর থাকতে পারলুম না।

বললাম—থামুন, ওকে মারবেন না। ও চুরি করেনি—

দারোগাও ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন—চুরি করেনি মানে? তুমি কী করে জানলে চুরি করেনি ও? ওই তো সকলের শেষে চাবি বন্ধ করে দিয়েছিল ঘরের দরজায়। ও একলাই তো জানে কোথায় কোন্ আলমারিতে, কোন্ সিন্দুকে কী থাকে? ও চুরি না করলে কে আর চুরি করবে? কে অত খোঁজখবর জানবে?

বললাম—কিন্তু বাইরের লোক কি তালা ভাঙতে পারে না?

—কী করে তালা ভাঙবে? তালা ভাঙলে তো সবাই শব্দ শুনতে পাবে।

আমি বললাম—কিন্তু তালা তো আসলে ভাঙেনি। তালা যেমনকার তেমনি আছে—

দারোগাবাবু বললেন—কিন্তু চাবি কার কাছে থাকে?

—কৈলাসের কাছে।

—তাহলে কৈলাসই দায়ী।

আমি বললাম—যদি ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ কৈলাসের কাছ থেকে চাবি চুরি করে নেয়?

—কিন্তু কে চুরি করতে যাবে?

—ধরুন আমি।

দারোগাবাবুর মুখে হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন।

বললেন—তুমি? তুমি চুরি করেছ?

—হ্যাঁ, আমি।

আশেপাশে যত লোকের ভিড় হয়েছিল, সবাই এবার চমকে উঠেছে।

—হ্যাঁ, আমিই সব চুরি করেছি। বাবার হীরের আংটি, সোনার বোতাম, ঘড়ি, ক্যামেরা সব কিছু আমি চুরি করেছি। আপনি কৈলাসকে কেন মিছিমিছি ধরেছেন? কোর্টে গিয়ে যদি ওর নামে আপনারা কেস করেন, তাহলে সেখানে গিয়েও আমি ওই কথা বলবো। তার চেয়ে ওকে এখুনি ছেড়ে দিন। তার বদলে আমাকে অ্যারেস্ট করুন—

ভিড়ের সমস্ত লোক তখন হতবাক নিস্তব্ধ। যেন সামনে দিনদুপুরে বিনামেঘে বজ্রপাত হলেও কেউ এমন হতবুদ্ধি হয়ে যেত না। দারোগাবাবু বিপদে পড়লো। কৈলাসকে ছেড়ে বাবার চেম্বারের দিকে চলে গেল।

ছোটবেলায় আমাদের পাড়ায় ছেলেদের মধ্যে একটা খেলার প্রচলন ছিল, সে খেলার নাম ছিল 'চোর-পুলিস'। খেলাটা কবে কে আবিষ্কার করেছিল তা কেউ জানে না। চোর পৃথিবীতে চিরকালই ছিল। কিন্তু পুলিস শব্দটা এল ব্রিটিশ আমলে। তার আগে ছিল কোতোয়াল। কিন্তু এমন কোনও যুগ ছিল কি যখন চোর ছিল, কিন্তু পুলিস ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। এমন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগ নিশ্চয় ছিল, যখন চোরও ছিল না, পুলিসও ছিল না। অর্থাৎ কল্পনায় যাকে বলা হয় সত্য যুগ। সেই সত্য যুগে যখন ধরা যাক, নিজের সম্পত্তি বলতে কিছু ছিল না, তখন নিশ্চয় চুরি বলতেও কিছু ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বইতে লিখে গেছেন 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে তাহাকে চুরি বলা হয়'। এই পর-আপনের ভেদ থাকলেই চুরির প্রশ্ন আসে। তা এই আত্ম-পরের ভেদ ঘুচবে কিসে? শাস্ত্রকার বলেছেন 'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'! এ-কথাটার উৎপত্তিই হলো ওই আপন-পর ভেদ থেকে। আমরা স্বদেশী যুগে গান গাইতুম—'স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়।' স্বদেশ-বিদেশ কথাগুলোই তো ভেদ-জ্ঞান। এই ভেদ-জ্ঞান থেকেই মানুষে মানুষে আজ এত বিভেদ, এত বিচ্ছিন্নতা। মানুষের যখন ভেদাভেদ-জ্ঞান লোপ পায় তখনই তাকে বলা হয় মহাপুরুষ! পরমহংসদেবের এই জ্ঞান হয়েছিল।

তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—যত মত তত পথ—। ইংরাজীতে তাই বলা হয় 'All roads lead to Rome', আর Romeই তো মানুষের মহাতীর্থ। কারণ সেখানেই মহাগুরু Pope-এর বাস। মহামানবের মিলনক্ষেত্র।

বহুদিন আগে ফরাসী বিপ্লবের সময় Marquis de Condorcet নামে এক দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। ভদ্রলোক দার্শনিকও বটে আবার অঙ্ক-শাস্ত্রজ্ঞও বটে। চরম অত্যাচারের মধ্যে সেদিন তাঁর জীবনাবসান ঘটেছিলো। কিন্তু অনেক দুঃখে একটা মোক্ষম কথা তিনি যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন। সেই কথাটার জন্যে আজও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বলেছিলেন—'The time will come when the sun will shine only upon a world of free men who recognise no master except reason ; when tyrants and slaves, priests and their stupid or hypocritical tools will no longer exist except in history or on the stage.'

কিন্তু সত্যিই কি সেইদিন আসবে যেদিন অত্যাচারী আর অত্যাচারিত বলতে কিছু থাকবে না? যেদিন পৃথিবীর মানুষ একমাত্র বিবেক ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নোয়াবে না? নইলে একদিন যারা মুসোলিনীকে মাথায় তুলে নেচেছিল তারাই আবার শেষকালে তার মুখে থুতু দিলে কেন? তা মুসোলিনী না হয় জাত ফ্যাসিস্ট, কিন্তু জওহরলাল নেহরু তো তা নয়? কোটি কোটি লোক একদিন যে নেহরুর বক্তৃতা শুনে আনন্দে আশায় আত্মহারা হয়ে হাততালি দিয়েছিল, তারাই আবার একদিন তাকে ব্ল্যাক-ফ্ল্যাগ্ দেখিয়ে তাড়া করেছে কেন? তারাই আবার তাঁকে পুঁজিবাদের দালাল, বিড়লা গোয়েঙ্কার দালাল বলে গালাগালি দিয়েছে কেন? যে কংগ্রেস একদিন 'জিন্দাবাদ' ছিল সেই কংগ্রেসই বা আবার একদিন 'মুর্দাবাদ' হয়ে গেল কেন? নিশ্চয়ই জওহরলাল নেহরু তাদের হতাশ করেছে, কংগ্রেস তাদের আশা পূরণ করতে পারেনি। তাই যদি হয় তাহলে আজ যে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসকে হটাতে চাইছে সেই কমিউনিস্ট পার্টিকেও আবার একদিন অন্য এক পার্টির কাছে হটে যেতে হবে—তা সে-পার্টির যে নামই হোক। আসলে একটা খাঁটি কথা এই যে, ওই 'Priest' আর 'Tyrant', ওরা চিরকালই থাকবে। এমন কোনও দিন আসবে না যেদিন রেলগাড়ির ভেতরে সাইনবোর্ড লেখা থাকবে না—'চোর জুয়াচোর নিকটেই আছে।'

Marquis de condorcet যা বলেছেন তা যদিও সত্যি নয়, ওটা তাঁর অনেক দুঃখের অনেক ক্ষোভের কথা বলেই ও কথাটা এত মূল্যবান।

এই যে আমি। আমার কথাই ধরা যাক্।

যেদিন বাবার কানে গেল সত্যিই আমি তাঁর দামী জিনিস-পত্র চুরি করেছি, সেদিন বাবার বড় দুঃখ হয়েছিল এই ভেবে যে তাঁর একমাত্র ছেলের শেষকালে এতটা অধঃপতন হলো! অথচ যাতে ছেলের অধঃপতন না হয় তার জন্যে তো সতর্কতার শেষ ছিল না তাঁর।

পুলিসের সামনেই বলে ফেললেন—স্ট্রেঞ্জ—ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইন্‌ডিড্—

বললেন বটে কথাটা, কিন্তু মনে-মনে কোন যুক্তিও খুঁজে পেলেন না। এ কেমন করে হয়? এ হয় কেমন করে?

মনে আছে যেদিন আমি মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গেলুম, সেদিন তিনি তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় শোক পেয়েছিলেন। হরিসাধন-বাবুর কাছে বলেছিলেন—আমার একমাত্র ছেলে, সেও মানুষ হলো না—তাহলে আমি কার জন্যে প্র্যাকটিস্ করছি—

শেষ জীবনটায় আমার জন্যে বাবা চূড়ান্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে হয়ে আমি খদ্দর পরি, আমি জেলফেরত, আমি স্বদেশী করি, রায় বাহাদুরের কাছে এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে! শুনেছি তিনি নাকি তিন দিন কোর্টে যাননি। যে হাইকোর্ট তাঁর কাছে তীর্থস্থান, সেই তীর্থস্থানকেও তিনি নিজের উপস্থিতি দিয়ে অপবিত্র করতে চাননি। ছেলে না হয় অন্যায় করেছে, কিন্তু হাইকোর্ট তো কোনও দোষ করেনি!

কিন্তু আজ? আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে কী হতো?

হরিসাধনবাবু একদিন এসেছিলেন। তখন আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। একেবারে অথর্ব। নিজের ছেলের একটা চাকরি করে দেবার জন্যে আমার কাছে তদ্বির করতে এসেছিলেন।

বললেন—আমি তখনই জানি, তুমি একদিন খুব বড় হবে জ্যোতি—

পুরনো দিনের কথা বলে তাঁর যন্ত্রণা আর বাড়াইনি আমি।

বললেন—আমি সকলকেই তাই এখন বলি, তোমাদের চিফ-মিনিস্টারকে আমি বাড়িতে একদিন পড়িয়েছি, সে তোমাদের কাছে চিফ-মিনিস্টার হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে সে আমার ছাত্র—

তারপর বাবার কথাও বললেন। বাবা মারা যাবার সময় আমি ছিলাম জেলে, আর তিনি বাবার শিয়রে বসে ছিলেন। আমার কথাই নাকি বলেছেন কেবল শেষ মুহূর্তের সময়। আমি যদি সৎপুত্র হতাম তাহলে নাকি তাঁকে অত শীগ্‌গির চলে যেতে হতো না।

—আজ মিস্টার সেন বেঁচে থাকলে তিনি খুব খুশী হতেন জ্যোতি।

বললাম—কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার তো প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে ঝগড়া, বাবা কি আমার মতে সায় দিতেন? আমি তো আর আমার প্রিন্সিপ্‌ল্ ত্যাগ করতুম না—

হরিসাধনবাবু উত্তরে একটা দামী কথা বললেন।

বললেন—দেখ জ্যোতি, আমি তোমার কথা নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত আসল কথা হলো সাক্‌সেস। সাক্‌সেস হলে সব কিছু মুছে যায়। এই দেখ না আমি সেকালের এম-এ। ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তাতে আমার হয়েছেটা কী? জীবনে কখনও সচ্ছলভাবে সংসার চালাতে পেরেছি? টাকার অভাবে আমার বহুদিনকার অর্শটা পর্যন্ত অপারেশান্ করাতে পারলুম না। অথচ…

অথচ বলে কিছু বলতে গিয়েও আর শেষ পর্যন্ত বলতে পারলেন না। অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলেন আমার কথা। আমার কিছুই কোয়ালিফিকেশন নেই, শুধু জেল-খাটার সার্টিফিকেট্‌খানা নিয়ে আর কিছু গরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে দেশের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছি।

কিন্তু তিনি মুখ ফুটে কিছু না বললেও কথাটা আমিই তুললাম। বললাম—আমার এই চিফ-মিনিস্টার হওয়াটাকেই কি আপনি সাক্‌সেস বললেন মাস্টারমশাই? আমি কি এতেই মোক্ষ পেয়ে গেছি?

—কী বলছো তুমি জ্যোতি? আমি তো তোমাকে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। তোমার অনেস্টি, তোমার এবিলিটি, তোমার ইনটিগ্রিটি, সে তো তোমার ক্যারেকটারে ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করে আসছি। মনে আছে সেই একটা গরীব চাষীর খোঁড়া ছেলের জন্যে তুমি কী কাণ্ডটাই না করেছিলে? তাকে হসপিট্যালে পাঠিয়ে তার খোঁড়া পা'টা অপারেশান্ করে ঠিক করে দিয়েছিলে? মনে আছে তোমার?

আমি কী আর বলবো, শুধু চুপ করে রইলাম।

কিন্তু হরিসাধনবাবু চুপ করে রইলেন না, বলতে লাগলেন—তোমার মনে

না থাক, আমার কিন্তু এখনও মনে আছে। তুমি তার জন্যে যা নোবল্ কাজ করেছ, তা ক'জন করতে পারে? সেই পুওর ছোঁড়াটাকে তুমি তোমার নিজের বিছানায় শুতে দিতে, তোমার টেবিলে একসঙ্গে এক খাবার খেতে দিতে। এটা কি কম গ্রেট্‌নেস? তুমি যা-ই বলো আর তাই বলো, এর মূল্য তুমি পেয়েছো, এ তোমায় স্বীকার করতেই হবে—

আমি আর কী বলবো। আমি মনে মনে হাসতে লাগলুম।

—আর আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি তোমার টেনাসিটি, তোমার ক্যাপাসিটি। আমি আমার ছেলেকেও তাই বললুম, এই পুলিনকে, এ আমার ছোট ছেলে। এদেরও সব সময় বলি তোমার কথা। বলি জ্যোতির লাইফটা তোমাদের যুগের ছেলেদের কাছে আইডিয়াল হওয়া উচিত…

হরিসাধনবাবু তাঁর নিজের কথা বলে চললেন। কিন্তু আমার কানে তার একবর্ণও ঢুকছিল না। আমি তখন সেই Francis de Condorcet-এর কথাই ভাবছিলাম। সেই 'Priests' আর সেই 'Tyrants' আর সেই 'hypocritical tools'দের কথা!

আমার মনে হলো আমার সামনেই যেন সেই 'Condorcet'-এর লেখা 'hypocritical tools'দের একজন সশরীরে বসে আছে। বসে বসে আমার খোসামোদ করে যাচ্ছে—

হঠাৎ ঘরের মধ্যে শঙ্কর ঢুকলো।

জ্যোতির্ময় সেন জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বলবে?

শঙ্কর একটু দ্বিধা করছিল। যেন কিছু বলতে চায়। যখনই বুঝবে কেউ কিছু বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না, তখনই বুঝতে হবে তার কিছু আর্জি আছে।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—বলো না কী বলবে?

শঙ্কর বললে—রথীন সিকদার মশাই আবার এসেছেন।

—আবার? আবার কেন? আমি তো বলে দিয়েছি যে তাকে নমিনেশান দেওয়া হবে না। ডিসট্রিক্ট কংগ্রেস নমিনেশান দেবার আসল মালিক। তারা যদি নমিনেশান না দেয় তো আমি কী করতে পারি? তা ছাড়া যে-লোক গভর্মেন্টের রিলিফ-ফাণ্ডের টাকা চুরি করার জন্যে ছ'মাস জেল খেটেছে, তাকে নমিনেশান দিলে পার্টি টি'কবে?

শঙ্কর বললে—ইনি মুড়াগাছার মণ্ডল কংগ্রেসের এক্স-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাই বলছেন নমিনেশান দিন এবার, অন্ততঃ আবার ওঁকে মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করে দিন। উনি তো টাকা চান না, সে তো আপনাকে বলেইছি। উনি আবার দেশসেবা করতে চান।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—দেখ শঙ্কর, যত মাছের ভেড়ির মালিক আর ভাঁটিখানার লাইসেন্স-হোল্ডার আজ টাকার জোরে দেশ-সেবক হয়ে পড়েছে, এ আমি জানি। শুধু আমি নই, সবাই-ই জানে। আর জানে বলেই বাইরে এত স্লোগান দিচ্ছে ওরা। তাই ওরা আজ এখানে এসে শাসাচ্ছে। আজ যদি উল্টো স্লোগান ওরা না দিত তো বুঝতুম দেশে মানুষ নেই। আর তা ছাড়া এত পার্টি থাকতে এই পার্টিতেই বা ওরা আসতে চায় কেন বলো তো? এই পার্টির ক্ষমতা আছে বলে তো? তারপর যদি কোনদিন আমাদের পার্টির হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায়, তখন যে-পার্টির হাতে ক্ষমতা আসবে সেই পার্টিতেই তো আবার তারা চলে যাবে—।

শঙ্কর চুপ করে রইল।

বললে—আমি এসব কথা বলেছি ওঁকে—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আরে, আমি তো সকালবেলাই ওকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ও কি জানে না যে আমাদের মাথাতেও কিছু বুদ্ধি আছে!

শঙ্কর বললে—না, সে তো উনি চাইছেন না, চাইছেন যাতে আবার উনি মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন।

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—তা তুমি কি চাও বৃটিশ আমলেও যা ছিল এখনও তাই হোক? তা যদি করি তো নেক্স্ট ইলেকশানে আমরা জিততে পারবো? এমনিতেই তো লোকে আমাদের বলে বিড়লা গোয়েঙ্কার দালাল। এর ওপরে যদি ভাঁটিখানার আর ভেড়ির মালিকরা এখানে ঢুকে পড়ে তো আমাদের রসাতলে যেতে কি কিছু বাকি থাকবে?

—তাহলে কি তাঁকে যেতে বলে দেব?

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—হ্যাঁ, যেতে বলে দাও। বলো ওসব কথা যদি বলতেই হয় তো রথীন সিকদার যেন কলকাতায় যান; সেখানে পার্টির অফিস আছে। আগে খবর দিয়ে যেন আসেন।

শঙ্কর বাইরে চলে যাচ্ছিল।

জ্যোতির্ময় সেন আবার ডাকলেন—শোন—

শঙ্কর ফিরলো। জ্যোতির্ময় সেন বললেন—আর একটা কথা বলে দিও রথীন সিকদার মশাইকে। বোল তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমাকে গলদা চিংড়ি খাইয়ে তোয়াজ করলেই তাঁর কার্যসিদ্ধি হবে, তো তিনি ভুল করেছেন। আর যদি তিনি চান তো আমি এখনই গলায় আঙুল দিয়ে সব গলদা চিংড়ি বমি করে ফেলছি, তিনি এসে তাঁর মাছ কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন—

শঙ্কর এর পর আর কোন জবাব দিতে পারলে না।

শুধু যাবার সময় বলে গেল—আমি একথা বলতে পারবো না জ্যোতিদা। আমি গিয়ে শুধু বলি—দেখা হবে না—

জ্যোতির্ময় সেন বললেন—হ্যাঁ—তাই বলো—

শঙ্কর চলে গেল। আবার খানিক পরেই সে ফিরে এল। বললে—বলে এসেছি—

—কী বললেন ?

শঙ্কর বললে—কী আর বলবেন। ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে গেলেন। বললেন—আপনার ইলেকশানের সময় তিনি সাড়ে আট হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিলেন সেটা যেন চিফ-মিনিস্টারের মনে থাকে। এক মাঘেই তো শীত পালায় না। মুড়াগাছার যত মেম্বার আছে সবাই নাকি দল বেঁধে কংগ্রেস ছেড়ে দেবে।

ছাড়ুক। ছাড়ুক ওরা কংগ্রেস। ওরা জানে না যে কংগ্রেসের চেয়ে দেশ বড়। কংগ্রেস থাকুক আর না থাকুক, দেশ থাকলেই হলো। এদের কী করে আমি বোঝাবো যে, কংগ্রেস যদি যায় তো ভয় আমারও কম নয়। আমি তো আর ওদের মত এই বুড়ো বয়েসে কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে গিয়ে জয়েন করতে পারি না ? আর পারলেও আমাকে ওরা ওদের দলে নেবেই বা কেন ?

শঙ্কর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম—দেখ শঙ্কর, তোমাকে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, আমাদের দেশে বড় বেশি দেশসেবক হয়ে গেছে। একটু কমা দরকার। আমি পণ্ডিত নেহরুকে একবার বলেছিলুম যে দেশ-সেবক দেখলেই যদি পুলিসকে গুলি করবার অর্ডার দেন, তবেই বোধ হয় দেশের কিছু মঙ্গল হয়, তার আগে কিছু হবে না। আসলে আজকাল দেশ-সেবকরাই দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু…

সত্যিই, জ্যোতির্ময় সেন ভাবতে লাগলেন, যেন দেশ-সেবা ছাড়া মানুষের এখন আর কিছু করবার নেই। শিল্প রয়েছে, সাহিত্য রয়েছে, ভাস্কর্য রয়েছে, সঙ্গীত রয়েছে। কত কী বিভাগ রয়েছে জীবনের। আর কিছু না থাক মাথার ওপর আকাশ রয়েছে, পায়ের তলায় মাটি রয়েছে, নিশ্বাস ফেলতে হাওয়া রয়েছে। বেশ সহজভাবে কি বাঁচা যায় না? সহজভাবে বাঁচতে কি মানুষ ভুলে গেছে? রাজনীতি কি করতেই হবে? নাকি রাজনীতির মত সহজ পথ নেই বলেই সবাই এমন করে রাজনীতি করতে চায়? ডাক্তারি পাস করতে গেলে পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হয়, ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করতে গেলেও পড়া-শোনার পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়। সঙ্গীতে পারদর্শী হতে গেলেও আজীবন সাধনা করতে হয়, সাহিত্যিক হতে গেলেও সাহিত্য-পাঠ করতে হয়। কিন্তু ত্রিভুবনে যদি কোনও কিছু পরিশ্রম অনুশীলন সাধনা না করে মোটা মাইনের চাকরি পাওয়া যায় তো সে কেবল রাজনীতি দিয়ে। একটু খুন-খারাবি করে জেল খাটার অভিজ্ঞতা আর রাস্তার মোড়ে বা পার্কের ভেতরে লেকচার দিতে পারার ক্ষমতা থাকলেই তুমি ভবিষ্যতে একদিন-না-একদিন মন্ত্রী হতে পারবে। প্রমথ চৌধুরী মশাই সেই জন্যেই বোধ হয় লিখে গিয়েছেন রাজনীতি এমনই এক রাজ, যার কোন নীতি নেই। প্রমথ চৌধুরী মশাই-এর কোনও অপরাধ নেই। আমার নিজের ক্যাবিনেটেই এমন মিনিস্টার আছেন যিনি শুদ্ধ করে একটা নোটিসও লিখতে পারেন না।

আমি একদিন রেগে গিয়ে বলেছিলাম—আপনি ইংরাজী লিখতে পারুন আর না-পারুন বাঙালীর ছেলে হয়ে একটু শুদ্ধ বাংলাও লিখতে পারেন না? ওতে যে আমাদের সেক্রেটারিরা হাসে!

আমার মিনিস্টার হেসে বলেছিল—লেখার অভ্যেস তো স্যার নেই আমার।

আমি বলেছিলাম—লেখার অভ্যেস না-ই বা থাকলো, কিন্তু কলেজে স্কুলেও তো লেখাপড়া করতে হয়েছে?

মিনিস্টার উত্তরে বলেছিল—ইস্কুলে আর পড়লুম কবে বলুন, ছোটবেলা থেকেই তো গান্ধীজীর কথায় কেবল মাঠে মাঠে বক্তৃতা দিয়েছি আর জেল খেটেছি।

—তা জেলে গিয়েও তো পড়াশোনা করতে পারতেন? এখন কাজে লাগতো।

তার জবাবে মিনিস্টার বলেছিল—জেলে গিয়ে কি পড়বার সময় পেয়েছি?

সেখানে গিয়ে তো কথায় কথায় গান্ধীজীর মতন হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেছি!

মনে আছে কথাটা শুনে আমার নাক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। হয়ত এদের জন্যেই আজ এই অশান্তি, এদের জন্যেই আজ এত অরাজকতা। অথচ উপায়ও নেই। আমাকে আমার পার্টি বাঁচাতে হবে। আর সেই পার্টি বাঁচাবার জন্যে টাকারও দরকার। সেই টাকার জন্যেই মাছের ভেড়ির মালিক রথীন সিকদার আর ভাঁটিখানার মালিক কেষ্ট হালদারদের নমিনেশান দিতে হবে। আর নমিনেশান দেবার পর ভোটে জিতে তারা এম-এল-এ হবে। আর এম-এল-এ হলেই হবে মন্ত্রী। পারা খেলে তা কত দিন চাপা থাকবে! ফুটে একদিন বেরোবেই। এও তাই।

মনে মনে তাই ভাবছিলাম, রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে এ-সব কথা ভাববার সময়ও থাকে না। ভাবা উচিতও নয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন—যাকে ভূতে পায় সে বুঝতেও পারে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে। কিংবা কেল্লায় যাবার সময় বুঝতে পারা যায় না যে, গড়ানে ঢালু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভেতরে গাড়ি পৌঁছলে বোঝা যায় কত নিচেয় এলাম। এ আমাদেরও বোধ হয় তাই হয়েছে। আমরা এই কুড়ি বছর ধরে গড়ানে রাস্তা দিয়ে কেবল নিচেয় নেমেছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি। আজ যখন রসাতলে এসে পৌঁছেছি তখন বুঝতে পারছি কত নিচেয় এলাম।

মুটুকেও যখন হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম তখন সেও বুঝতে পারেনি কোথায় যাচ্ছি।

মুটু জিজ্ঞেস করলে—এ কোথায় নিয়ে এলি রে?

বললাম—হাসপাতালে।

হাসপাতালের নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেল সে। সে জানতো মানুষ অসুখ হলে হাসপাতালে যায়।

বললে—কার জন্যে যাচ্ছিস? হাসপাতালে কে আছে?

বললাম—কেউ নেই—

কলকাতার হাসপাতাল আর গ্রামের গঞ্জের হাসপাতাল, তাদের মধ্যে অনেক তফাত। এখানে বড় বড় বাড়ি, বিরাট ভয়াবহ তার রূপ। অসহ্য ভিড়, অনেক তার সাজ, অনেক সরঞ্জাম। কিন্তু মুটু জানতো না যে এই কলকাতার বড় বড় হাসপাতালও, গ্রামের লোকের হাড়-ভাঙা খাটুনির পয়সা দিয়ে গড়া। সেখানকার লোক ট্যাক্স দেয়, সেই ট্যাক্সের টাকায় শহরে

হাসপাতাল গড়ে ওঠে, কল দিয়ে জল পড়ে, রাস্তায় ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে। আর শুধু হুটু কেন, তখন কি আমিই ও-সব জানতাম!

একটা অফিসের ভেতর ঢুকতে গিয়ে হুটু থেমে গেল।

আমি বললাম—আয়, ভেতরে আয়—

হুটু বললে—আমাকে যদি তাড়িয়ে দেয়?

আমি বললাম—তোর কিছু ভয় নেই, তুই চলে আয় আমার সঙ্গে। ডাক্তার তোর পা পরীক্ষা করবে—

—আমার পা?

বললাম—হ্যাঁ, ডাক্তার তোর খোঁড়া পা আগে না দেখলে কী করে ভালো করবে? ওই পা'টা অপারেশন করে ঠিক করে দিতে হবে।

—ছুরি দিয়ে পা কাটবে নাকি?

বললাম—হ্যাঁ, কাটতে তো হবেই। কিন্তু কিচ্ছু ব্যথা লাগবে না, ওষুধ দিয়ে সব ঠিক করে দেবে।

এ যুগে যেমন সিনেমা, সে যুগে তেমনি ছিল রাজনীতি। আসলে ও দুটো একই।

রাজনীতি করতে গিয়ে আমি এমন অনেক লোক দেখেছি যারা সারাজীবন ভয় পেয়ে পেয়েই কোনও রকমে টিঁকে রইল। আমি যখন দমদম জেলে ছিলাম তখন একটি ছেলে ছিল আমাদের দলে যে দিনরাত কেবল কাঁদত।

যতদূর মনে পড়ে তার নাম ছিল সদাশিব। মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিসের বেটন্ খেয়ে একেবারে আধমরা হয়ে যায়। আধমরা বললে সঠিক বলা হয় না। একটা হাত তার ভেঙে গিয়েছিল, মাথার খুলিটাও বোধ হয় খানিকটা ফেটে গিয়েছিল। তারপরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের সঙ্গে ছিল বরাবর।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম—তুমি এ লাইনে এলে কেন সদাশিব?

সদাশিব হুজুগে পড়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতে এসেছিল। রাজনীতি করার একটা সস্তা উত্তেজনা

আছে। যাদের কোথাও কেউ আমল দেয় না, লেখাপড়ায় ভালো নয় বলে ইস্কুলেও যারা তেমন খাতির পায় না, সে যুগে তেমন অনেক ছেলে সস্তায় শহীদ হবার ইচ্ছেয় রাজনীতি করতে আসতো। তাদের মন্ত্রী হবার বাসনা ছিল না, কোনও পুরস্কার পাবার আশাও করতো না তারা, শুধু আত্মীয়-স্বজন ও পাড়ার লোকের কাছে একটু বিশিষ্ট হওয়ার চেষ্টা মাত্র। সদাশিব ছিল সেই দলের একজন।

সদাশিব বলতো—আমাকে যে কেউ মানতো না জ্যোতিদা, আমার কথা যে কেউ শুনতো না।

তাই হয়তো সেই যুগের সদাশিবরা সস্তায় কিস্তিমাত করতেই রাজনীতিতে আসতো। লেখাপড়ায় ফার্স্ট হতে না পারি, একেবারে যে অকর্মণ্য নই সেটা প্রমাণ করার পক্ষে সে-যুগে রাজনীতি ছিল একটা সব চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ যুগে যেমন সিনেমা!

আমি সান্ত্বনা দিতুম তাকে। বলতুম—তোমার মত ছেলের এ লাইনে আসা উচিত হয়নি সদাশিব, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তুমি এই পলিটিক্‌স ছেড়ে দিও—

সদাশিব আমার কথাগুলো শুনতো, কিন্তু কিছু যুক্তি বেরোত না তার মুখ দিয়ে। বলতো—কিন্তু এ লাইন ছেড়ে দিয়ে আমি কোন্ লাইনে যাবো জ্যোতিদা? সব লাইন যে আমার বন্ধ—

—কেন, বন্ধ কেন হবে? তুমি ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।

সদাশিব বলতো—কিন্তু আমার লেখাপড়া করতে ইচ্ছা করে না যে জ্যোতিদা—

সদাশিবকে প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিলাম সে মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলে। বাবা একটা সরকারী অফিসের চাকুরে। অল্প আয়, অনেকগুলো ভাই-বোন। সদাশিব জেলে যাওয়াতে তার বাবার চাকুরি যাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও সে স্বদেশী করেছে। তাতে যেন কোথায় তার মনে একটা আত্মার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। হোক তাদের বাবা-মা-ভাই-বোনেদের সর্বনাশ কিন্তু সে নিজে তো বেঁচেছে। একটা কিছু তথাকথিত মহৎ কাজের জন্যে আত্মত্যাগ করতে পেরে সে যেন কৃতার্থ হয়েছে।

আমি জেলখানার ভেতরে বসে সদাশিবের কথা ভাবতুম। নিজের জীবনের সঙ্গে সদাশিবের জীবনটাও মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতুম। দু'জনেই

বাড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন তাঁর কথা শুনিনি বলে। আর সদাশিব তার বাবাকে ত্যাগ করেছিল নিজের অসাধারণত্ব প্রমাণ করবে বলে। আসলে কি আমাদের দু'জনের মধ্যে তেমন কিছু প্রভেদ ছিল?

কিন্তু প্রভেদটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হলো পরে। বহুদিন পরে।

এখন, এই এতদিন পরে যখন তাদের কথা ভাবি তখন বড় মুশকিলে পড়ে যাই এই ভেবে যে, তাহ'লে কি জীবনের সার্থকতাটাই সব? সাক্‌সেসটাই সব কিছু?

আসলে রাজনীতিতেই আসো আর সিনেমাতেই নামো, সাক্‌সেস্‌ দিয়েই আমরা তোমার মূল্য বিচার করবো। রাজনীতি করতে গিয়ে যদি তুমি আন্‌সাকসেস্‌ফুল হও তাহ'লে তুমি অপদার্থ। সিনেমা সম্বন্ধেও তাই। এমনও দেখেছি যে-মীটিং-এ আমি সভাপতি, সেখানেও যত ভিড়, সিনেমার অভিনেতা যেখানে সভাপতি সেখানে আরো বেশি ভীড়। অথচ খবরের কাগজে আমার বক্তৃতার জন্যে যতখানি জায়গা বরাদ্দ করা হয়, তার শতাংশের একাংশও বরাদ্দ হয় না অভিনেতার বক্তৃতার জন্যে।

হয়ত এটা চক্ষুলজ্জা! কিন্তু যা সত্যি তা তো চাপা থাকে না কখনও। একদিন না একদিন তার বহিঃপ্রকাশ হবেই। আসলে আমি বলি কি সব কিছুই ভালো যদি তুমি তাতে ফার্স্ট হও। সে রাজনীতিতেই হোক আর সিনেমাতেই হোক। তা যদি না পারো তো নেচে ফার্স্ট হও। পাহাড়ে উঠে ফার্স্ট হও। যেমন তেনজিং। যে-কোন বিষয়ে যে-কোনও-ক্রমে একবার ফার্স্ট হয়ে তারপরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো। তখন তোমার ভাত মারে কে? আসল কথা হলো ফার্স্ট হওয়া। মুখে আমি বলি বটে দেশের কল্যাণের কথা। হয়ত মনে মনেও একদিন তা ভেবেছিলাম। আসলে আমিও হয়ত ফার্স্ট হতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, আমি কী চাই! আমি কি আমার গদি আঁকড়েই থাকতে চাই না?

বহুদিন পরে যেদিন আবার সেই সদাশিবকে দেখলুম, আমার মনে হলো যেন আমার আসল আমিকেই আমি দেখছি।

কোন্‌ এক অজ গ্রামে সভা করতে গিয়েছিলাম। সভা মানেই তো আত্মপ্রচার। সভাপতির পক্ষেও যেমন আত্মপ্রচার, সভার কর্তৃপক্ষের পক্ষেও তেমনি। মাঝখানে রইল শ্রোতা। তা তাদের এ-কূলও নেই, ও-কূলও

নেই। শ্রোতার কোনও জাত নেই। সেক্সপীয়রের নাটক জুলিয়াস সিজারের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মত। তারা ক্যাসিয়াসের দলেও আছে, ব্রুটাসের দলেও আছে। তারা অনেকটা ব্যাড্‌মিন্‌টন খেলার বলের মত। যখন যার দিকে তখন তার। যাকে বলে 'বেড়াপার্টি'।

সেদিন আমি সভায় এমন বক্তৃতা দিয়েছিলাম যে শ্রোতার দল হাততালি দিতে দিতে হাত ব্যথা করে ফেললে। জয়ের গর্বে যখন চেয়ারে বসে পড়লাম তখন আনন্দের আতিশয্যে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। সভার ডায়াস থেকে নেমে যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ একটা পাগল আমার সামনে এসে বিকট চীৎকার করে উঠলো।

আমি তো ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম।

সভার একজন উদ্যোক্তা যথাসময়ে এসে পাগলটাকে ধরে ফেললে। ধরে না ফেললে যে কী হতো বলা শক্ত। তারপর তাকে ধরে বেদম প্রহার শুরু করে দিলে।

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—ও কে?

ভদ্রলোক বললে—ও একটা পাগল। আমাদের এই গ্রামেই ওর বাড়ি।

—পাগল মানে? আমি তো ওর কিছু করিনি, ও আমার দিকে তেড়ে এল কেন?

ভদ্রলোক বললে—ওই ওর এক বদ্ স্বভাব, খদ্দর আর গান্ধীটুপি দেখলেই ও তার দিকে তেড়ে যাবে।

—কিন্তু কেন অমন হলো?

ভদ্রলোক বললে—কেন হলো তা জানি না। অথচ এককালে ও খুব স্বদেশী করেছে। সেই ব্রিটিশ আমলে। পুলিস ওকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। একটা হাতও ওর ভেঙে দিয়েছে। অত বড় নির্ভীক ওয়ার্কার আমাদের গাঁয়ে একটাও ছিল না। কত বচ্ছর ও জেল খেটেছে। ওর জন্যে ওর বাবার গভর্ণমেন্টের চাকরি চলে গেছে। কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো, ওর মাথাটা বিগড়ে গেল—

—হঠাৎ মাথা বিগড়ে গেল কেন?

ভদ্রলোক বললে—তা জানি না জ্যোতিদা, নতুন যখন কংগ্রেস মিনিস্ট্রি হলো আমরা ওকে বললাম কংগ্রেস অফিসে আসতে, কাজ করতে বললাম। বললাম—তুমি হলে পুরনো কংগ্রেসী, তুমি এসো। আমাদের সঙ্গে যোগ

দাও। কিন্তু কিছুতেই ও এলো না। তখন থেকেই কেমন উল্টো-পাল্টা কথা বলতে লাগলো। আর গান্ধীটুপি আর খদ্দরের জামাকাপড় দেখলেই তেড়ে মারতে আসতে লাগলো। ডাক্তার দেখে বললে—ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো আমার। জিজ্ঞেস করলাম—ওর কে কে আছে এখানে?

—সবাই আছে, কিন্তু সে-বাড়িতে তো ওর ভাইরা ওকে ঢুকতে দেয় না।

—কেন?

—পাগলকে কে সহ্য করবে বলুন! ওর যে মাথা খারাপ! তাই ও রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কেউ দয়া করে যদি খেতে দিলে তো খেলে, না দিলে উপোস করে থাকে—

জিজ্ঞেস করলাম—ওর নামটা কী বলো তো?

—সদাশিব।

আমার মাথায় যেন কেউ থাপ্পড় মারলে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না সেখানে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললাম—চলো চলো শীগ্‌গির চলো—

মনে হলো আমার সঙ্গে সদাশিবের তফাত বোধ হয় কেবল ওইটুকুই। আমি চিফ মিনিস্টার আর ও পাগল। আমি ফার্স্ট হয়েছি, আর সদাশিব হয়েছে লাস্ট্। নইলে আমিও ত্যাজ্যপুত্র, সদাশিবও তাই। একই সঙ্গে একই ঘরের ভেতর দু'জনে জেল খেটেছি। দু'জনেই খদ্দর পরে ব্রিটিশের আইন ভেঙেছি, দু'জনেই পুলিসের লাঠি খেয়েছি। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর যেই দেশ স্বাধীন হয়েছে, তখন আমি হয়েছি চিফ মিনিস্টার আর সদাশিব হয়েছে পাগল।

আমার জীবনে এরকম ঘটনা আমি আরো অনেক দেখেছি। ইংরিজীতে একটা শব্দ আছে value. Value কথাটার বাংলা তর্জমা করা হয় মূল্য বা মান। কিন্তু মূল্য বললে ঠিক যেন বলা হয় না। সেই Plato-র আমল থেকেই বলতে গেলে এই মূল্যবোধের শুরু হলো। এই মূল্যমান নিয়ে Francis Bacon আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন Comte. কিন্তু আসলে এই মূল্যবোধের চেতনার কথা উঠলো কেন? আর উঠলোই বা যদি তো তা নিয়ে এত হৈ-চৈ হলো কেন? হলো এই জন্যে যে সবাই চাইতে লাগলো মানুষ সুখী হোক। বাঁচার সঙ্গে সুখের যেন

কোন বিরোধ না থাকে। কিন্তু আসলে আমরা কী দেখি? সংসারে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের সৃষ্টি। এই দুঃখকে দূর করার জন্যে পৃথিবীর তাবৎ মুনি ঋষি ভাবুক দার্শনিক সবাই উপায় বার করতে লেগে গেলেন। Plato একরকম ভাবলেন, Bacon একরকম ভাবলেন, Comte একরকম ভাবলেন। তথাগত বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, উপনিষদকার, শ্রীমদ্‌ভাগবতকার সবাই নানাভাবে ভাবতে ভাবতে শেষকালে ভাবনাটা দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ চলে গেল বিজ্ঞানের দিকে, আর একটা ভাগ গেল অধ্যাত্মবাদে। সেখানেই মুশকিলটা বাধলো। আশ্চর্য, যেন জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়! যেন জীবন অখণ্ড নয়! ঠিক এই সময় রাধাকমল মুখার্জী একটা কথা বললেন। তাঁর কথাটা বড় দামী। তিনি বললেন—Man is a unity, but the knowledge of man and his behaviour is now dispersed between two separate compartments of research with their own conceptual mirrors and logical equipment and no doors and windows for communication with each other—one assigned to the sciences and their various applications, and the other to ethics, aesthetics, philosophy, metaphysics and religion.

প্লেটো থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত নাকি ইনটিগ্রেশনই চলছিল। আর যেদিন থেকে স্পেশালিজেশান্ শুরু হলো সেই দিন থেকেই শুরু হলো ডিস্‌ইনট্রিগেশন। রাধাকমলই প্রথম বললেন যে জ্ঞানের রাজ্যে এ-রকম ভাগাভাগি করা ঠিক নয়। জীবন যেমন একটা, সমাধানও তার একভাবেই করতে হবে। তা সে-জীবনের যত হাজার-গণ্ডা সমস্যাই থাক না কেন।

এ-সব জেলখানায় বসেই শেখা। পড়াশোনা যা-কিছু আমার সেখানেই আরম্ভ আর সেখানেই শেষ। মরতে এসেছিলাম রাজনীতিতে। নইলে হয়ত বাবার সঙ্গেও বিচ্ছেদ হতো না, অত টাকার সম্পত্তিও হাতছাড়া হতো না।

জেলখানায় আমাকে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়তে দেখে ত্রৈলোক্যদা আমাকে sociology-র বই পড়তে দিয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যদা বলতেন—সব রকম বইই পড়বে হে, তবে মানুষ হবে—specialisation কথাটা কখনও বিশ্বাস কোর না,—ওটা ধাপ্পাবাজি—

ত্রৈলোক্যদা আরো বলেছিলেন—বিজ্ঞান ভালো আর অধ্যাত্মবাদ খারাপ এ-কথা যারা বলে তারাই হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক—

অনেক কথাই বলতেন ত্রৈলোক্যদা। আমিও বলতাম আমার কথা। বলতাম—জানেন ত্রৈলোক্যদা, আমি ছেলেবেলায় একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। পালিয়ে গিয়েই বুঝেছিলুম যে বাড়িটা কত জঘন্য জায়গা!

—কী রকম?

ত্রৈলোক্যদা আমার সেই কাহিনী মন দিয়ে শুনতেন। আর হাসতেন। সেই বাবার কথা, সেই মুটুর কথা, সেই প্রাইভেট টিউটর হরিসাধনবাবুর কথা। তারপর বলতুম সেই বাবার টাকা চুরি করে মুটুকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা।

—তার পা ভাল হয়ে গেছে?

বলতাম—সহজে কি ভালো হয় ত্রৈলোক্যদা? অত সহজে ভালো হয়নি। আউটডোরের ক্লার্ককে কুড়ি টাকা ঘুঁষ দিতে হয়েছিল, নইলে বেড্ পাওয়া যায় না যে!

তা সত্যিই ভদ্রলোক ঘুঁষ নিতে জানেন বটে। বললে—এক মাস পরে খবর নিয়ে যেও—

আমি তো অবাক! আমি বললাম—কেন, এক মাস পরে কেন?

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, তাই নিয়ম।

আমি রেগে গেলাম। বললাম—নিয়ম কোথায় লেখা আছে?

ভদ্রলোক অনেকদিন এই চেয়ারে চাকরি করছেন। বললেন—তার কৈফিয়ত কি আমি তোমায় দেব নাকি হে ছোকরা, এখন কথা বলবার সময় নেই,—যাও, সরো—

বলে আমার পেছনের লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। প্রথমে 'ছোকরা' বলে আমাকে অপমান করা। তারপর এক মাস পরে আসতে বলা। দুটোই অপরাধ। এ-ধরনের বেয়াদপি সহ্য করবার মত কুশিক্ষা আমি পাইনি। আমার লক্ষপতি বাবাকেই আমি পরোয়া করিনি, তা পরোয়া করবো সামান্য একজন ক্লার্ককে।

বললাম—সরবো না, আগে আপনি আমার কথার জবাব দিন।

—তোমার কী কথা?

বলে ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলে। তারপর কিছু না বলে যেমন পেছনের লোকের সঙ্গে কথা বলছিল আবার তেমনিই কথা বলতে লাগলো। আমার পেছনে মুটু দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। সে

তখনও ভয়ে-লজ্জায়-সঙ্কোচে কাঁপছে।

এবার পেছন থেকে বললে—জ্যোতি, চল্, দরকার নেই আমার পা ভালো করে, চল্ চলে যাই—

আমি বললাম—তুই চুপ কর তো, তোকে কিছু বলতে হবে না—আমি যা ভালো বুঝি তাই করবো—

মানুষের জন্যেই মানুষ হাসপাতাল তৈরী করে দিয়েছে, তবু মানুষই সেই হাসপাতালে মানুষকে ঢুকতে দেবে না। এর চেয়ে বড় অনাচার আর কী হতে পারে! কিন্তু তখন কি বুঝতুম যে মানুষই মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু! আমার বাবা যেমন আমার সব চেয়ে বড় শত্রু, আবার আউট-ডোরের সেই ক্লার্কটাই মুটুর সব চেয়ে বড় শত্রু। আবার ডাক্তারি এমনই একটা বিদ্যে, যাদের সেই জ্ঞান আছে তাদের সংস্রবে আমাদের যেতেই হবে। আমার যদি সম্মতি না থাকে তো আমি উকিলকে এড়িয়ে চলতে পারবো। আমি যদি সহজ জীবন-যাপন করি তো ইঞ্জিনীয়ারের সংস্পর্শে আমার না এলেও চলবে। আর আমি যদি পয়সা উপায় না করি তো অ্যাকাউন্টেন্টের খপ্পরে পড়বারও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ডাক্তারকে এড়িয়ে বাঁচা শক্ত। কারণ যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ রোগও আছে। আর ডাক্তারি এমনই এক বিদ্যে যা পাস করাটাই একটু শক্ত। কিন্তু কোনও রকমে একবার পাস করতে পারলে তখন আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই, বসে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুধু প্র্যাকটিস করে যাও, হুড়-হুড় করে টাকা এসে যাবে। রোগী যদি বাঁচে তো ডাক্তারের পসার বাড়বে, কিন্তু রোগী মরলে ডাক্তারের কোনও দায়িত্বই নেই। ডাক্তারির মত আয়েসের প্রফেশান আর দুটি নেই পৃথিবীতে। পৃথিবীতে বোকা লোকের যেমন অভাব নেই, রোগীরও তেমনি অভাব নেই। রোগী ডাক্তারের ডিগ্রী দেখেই আসবে, বিদ্যের দৌড় দেখে আসবে না। John B Watson-এর একটা লেখায় পড়েছি 'Medicine men have always flourished. A good medicine man has the best of everything, and best of all, he doesn't have to work.'

পেছনে হঠাৎ পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠলাম, দেখি হাসপাতালের একজন চাপরাসী আমাকে যেন কী বলতে চাইছে।

বললে—একটু এদিক আসুন—

বলে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বললে—কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন, কী ব্যাপার আমাকে বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

বললাম—আমার রোগীকে ভর্তি করছে না কেন ও ?

চাপরাসী চোখের কটাক্ষে একটু রহস্যময় ইঙ্গিত করে বললে—পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন না—

আমি বললাম—কিন্তু ঘুঁষ নেবে কেন ও ?

চাপরাসীটা বললে—আরে ওকে ঘুঁষ বলছেন কেন আপনি ? ছাপোষা মানুষ, কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে সংসার করে, এই মাইনেতে কি কুলোয় ?

শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ নয়, কুড়ি টাকায় রফা হলো। কুড়িটা টাকা চাপরাসীটার হাতে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্‌মিশন হয়ে গেল।

মনে আছে বহুকাল পরে যখন আমি হেলথ্-মিনিস্টার তখন আর একবার সরকারিভাবে ওই হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে পুরনো স্মৃতিটা মনে পড়ছিল। সেদিনকার সেই ভদ্রলোক দেখলাম তখনও চাকরি করছেন। তখন আরো অনেক বয়েস হয়েছে তাঁর। প্রমোশনও হয়ত হয়েছে। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিনি সব দেখাতে লাগলেন। অতি মিষ্টি অমায়িক ব্যবহার। কোথাও কোন খুঁত-ত্রুটি নেই। তাঁর আগেকার সেই ব্যবহারের সঙ্গে তাঁর সেদিনকার ব্যবহারের কোনও মিল আর খুঁজে পেলাম না।

আর মিল থাকবেই বা কেন ? আমি যে তখন হেলথ্-মিনিস্টার !

কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার বিরোধ শুরু হলো সেই সময় থেকেই। আর শুধু আমার বিরোধ কেন ? পৃথিবীতে যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে সেইদিন থেকেই সকলের সঙ্গে সকলের এই বিরোধ শুরু হয়েছে। সেই-ই তো শুরু হলো ভাঙনের যুগ। অতবড় যে ব্রিটিশ এম্পায়ার, তার ভাঙনের সূত্রপাতও ঠিক সেই সময়ে। নইলে যে ব্যারিস্টারের ভক্তি আর বশ্যতার ওপর নির্ভর করে তাকে রায়বাহাদুর পদবী দেওয়া হয়েছিল, তারই ছেলে কী করে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে জন্মালো ?

বাবার অবস্থা তখন শোচনীয়। একদিন হরিসাধনবাবুকে ডেকে তাঁকে ছাড়িয়ে দিলেন তিনি। বললেন—আপনার হাতে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি, কিন্তু আপনিই আমার সঙ্গে সব চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—

হরিসাধনবাবু সবিনয়ে বললেন—আর যাই করুণ রায়বাহাদুর, আমার ওপর অবিচার করবেন না—

—অবিচার? আপনি আমার ওপর কত অবিচার করেছেন তা জানেন? আমি আমার ছেলেকে স্কুলে দিইনি পাছে বদমাইশ ছেলেদের সঙ্গে মিশে সে গোল্লায় যায়। আমি ভেবেছিলাম আপনি তার পুরো ভার নেবেন। তার বদলে আপনি শুধু মাসে মাসে মোটা মাইনে নিয়ে গেছেন—

হরিসাধনবাবুর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক সেখানেই শেষ। কিন্তু আমার সঙ্গে বাবার আর এক নতুন সম্পর্কের শুরু সেখান থেকেই। আমার বাবার লক্ষ লক্ষ টাকা আমার কাছে তখন থেকেই বিস্বাদ হয়ে গেল। আমার আর কোনও কাজ নেই তখন থেকে। যে-ক'দিন মুটু হাসপাতালে ছিল সে-ক'দিন রোজই যেতাম তাকে দেখতে। আমার যাওয়ার পথের দিকে সে রোজই চোখ চেয়ে বসে থাকতো। বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত দেখাশোনা করার সময়। আমি সেই সময়েই যেতাম তার কাছে।

মুটু আমাকে দেখে ভীষণ খুশী হতো। বলতো—তুই এত দেরি করে এলি কেন? কখন চারটে বেজে গেছে—

আমি তার জন্যে বাজার থেকে ফল কিনে নিয়ে যেতাম, ডাব কিনে নিয়ে যেতাম। সেদিকে সে ফিরেও তাকাতো না। বলতো—এখানে আমার আর থাকতে ভালো লাগছে না রে। আমাকে ময়নাডাঙায় পাঠিয়ে দে—

আমি বলতুম—তোর পা ভালো হয়ে যাক্, তারপর ময়নাডাঙায় যাবি—

এই সব কথাই তাকে বলতুম। একদিন সে জিজ্ঞেস করলে—আমার কাছে আসিস বলে তোর বাবা তোকে বকে না?

আমি মুখে বলতুম—না।

কিন্তু আসল কথাটা চেপে যেতাম তার কাছ থেকে। হরিসাধনবাবুকে যে বাবা ছাড়িয়ে দিয়েছে তাও তাকে বলতাম না। বলতাম না যে আমাকে গাড়ি ব্যবহার করতেও দিত না বাবা। শুধু কোনও রকমে দুটো খেতে দেওয়া আর পরতে দেওয়া ছাড়া আর সব অধিকারই বাবা কেড়ে নিয়েছিল। হয়ত ভেবেছিল সবরকমে বঞ্চিত করেই বাবা আমাকে তার বশ্যতা স্বীকার করাতে পারবে। ফলে হলো কী, আমি সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। পরিবার থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হলাম ততই সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে লাগলুম। তখন সংসার কাকে বলে, সমাজ কাকে বলে, জীবন কাকে

হলে তাই নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেদিন রাত্রে দেখলুম বাবার গাড়িটা বাড়িতে ঢুকলো। যেমন রোজ ঢোকে তেমনি। কিন্তু সেদিন যেন আরো দেরি করে ঢুকলো। পোর্টিকোর সামনে গাড়িটা থেমেছে। আমি সামনের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম বাবা একলা নয়, বাবার সঙ্গে আরো একজন নামলো। একজন মেয়েমানুষ।

দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠলাম। আগেও একবার যেন দেখেছি ওই মেয়েমানুষটাকে।

কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। এক মুহূর্তের মধ্যেই দু'জনে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। আমার সমস্ত অন্তরাত্মার মধ্যে যেন রক্ত-চলাচল থেমে যাবার মত অবস্থা হলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িতে যেন শোরগোল পড়ে গেল। বাবা বাড়িতে এলে অবশ্য বরাবরই শোরগোল পড়ে যেত। কিন্তু সেদিন যেন বিশেষ শোরগোল পড়ে গেল। রঘু কৈলাস দুখমোচন সবাই যেন একটু বেশি সন্ত্রস্ত।

সামনে দিয়ে রঘু যাচ্ছিল, তাকে ডাকলুম।

বললাম—হ্যাঁ রে, ও কে রে?

রঘুর তখন উত্তর দেবার সময় নেই। যেতে পারলেই যেন সে বাঁচে। বললে—নতুন মা—

আমি যা সন্দেহ করেছিলুম ঠিক তাই। বললুম—তা হঠাৎ নতুন মা আবার আজকে এল যে?

রঘু একটু যেন বেশি বিব্রত ছিল। বললে—নতুন মা আজ রাত্তিরে এ-বাড়িতেই থাকবে—

—রাত্তিরে এ-বাড়িতে থাকবে? হঠাৎ থাকবে কেন? কখনও তো থাকে না?

রঘুর কি তখন অত কথা বলবার সময় আছে? কেন থাকবে তা জানি নে—বলে রঘু তার নিজের কাজে চলে গেল।

জেলখানায় বসেই গল্প হচ্ছিল। এই পর্যন্ত শুনে ত্রৈলোক্যদা বললেন—তারপর ?

তারপর ? তারপর দেখলাম আমার নতুন-মা সেদিন খুব ভোরেই উঠেছে। বাড়ির মধ্যে হঠাৎ সাড়া পড়ে গেল যেন। আগে এমন হৈ-চৈ ছিল না বাড়িতে, আগে আস্তে আস্তে সকাল হতো, আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হতো। আস্তে আস্তে সকাল হওয়াটাই আমার ভালো লাগতো চিরকাল, কারণ আমার ধারণা ছিল তাড়াতাড়ি সকাল কিংবা সন্ধ্যে হলে মানুষ মেশিন হয়ে যায়। যে যুগে টেক্‌নোলজি ছিল না তখন মানুষ ঘুম থেকে দেরি করে উঠতো। সূর্যের সঙ্গে বাঁধা ছিল তার জীবনযাত্রা। কিন্তু এই টেক্‌নোলজির যুগে সূর্য ওঠার অনেক আগে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যে হবার অনেক পরে সন্ধ্যে হয়।

মহাকবি কালিদাস মেঘকে দূত করে প্রিয়ার কাছে বিরহীর যন্ত্রণার বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মাহকাব্যের নাম দিয়েছিলেন তিনি মেঘদূত। মেঘ বড় আস্তে আস্তে নড়ে বলে যদি তিনি জেট্-প্লেনকে দূত করতেন তো তার নাম দিতেন জেট-দূত। কিন্তু জেট-দূত যত তাড়াতাড়িই দৌড়োক সেটা মহাকাব্য তো নয়ই, কাব্যও হয়ে উঠতো না। অনেকের ধারণা তাড়াতাড়ি যে কাজ করতে পারে সে কর্মী। কিন্তু এটাও তো সত্যি, যে সত্যিই তাড়াতাড়ি কাজ করে সে কখনও ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ঘোড়ায় চড়ে দৌড়তে দৌড়তে লড়াই করতে যাওয়া যায়, কিন্তু ঘড়ি মেরামত করতে গেলে বসে ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে কাজ করলেই ঘড়ির কাঁটা নিয়ম করে চলে। একবার কোন লেখক নাকি শরৎচন্দ্রের কাছে একটা উপন্যাস এনে বলেছিল—আমি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। এই তিনশো পাতার উপন্যাসটা আমি সাতদিনের মধ্যে শেষ করেছি—

লেখক ভেবেছিল শরৎচন্দ্র বুঝি তার কথাটা শুনে খুব তারিফ করবেন। কিন্তু উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—তাড়াতাড়ি লেখা তো কেরানীর কাজ হে, লেখকের পক্ষে ওটা দোষের—

যা হোক, পরের দিন দেখি রঘুর গায়ে হঠাৎ জামা উঠেছে।

জামা গায়ে দিয়ে সে ভেতর-বাড়ির দিকে চায়ের ট্রে নিয়ে যাচ্ছিল।

শুধু রঘু নয়, কৈলাসের গায়েও জামা উঠেছে। যারা যারা ভেতর-

বাড়ির সঙ্গে যুক্ত তারা সবাই জামা গায়ে দিয়েছে। সবই একরকম ধরনের জামা। যাকে বলে ইউনিফর্ম।

আমি রঘুকে ডাকলুম। বললুম—শোন্ এদিকে—

রঘুর আসতে ইচ্ছে ছিল না, তবু এল। বললে—কী ?

বললাম—তোমাদের গায়ে এসব নতুন জামা কেন ?

রঘু বললে—নতুন মায়ের হুকুম—

—হুকুম মানে ?

রঘুর হাতে চায়ের ট্রে, দেরি হলে যেন পৃথিবী উলটে যাবে। বললে—এবার থেকে কারো খালি গায়ে থাকা চলবে না। সবাইকে জামা পরতে হবে।

বললাম—তা নতুন মা কি এখন থেকে এ-বাড়িতেই থাকবে নাকি ?

রঘু বললে—হ্যাঁ—

এতদিন বাইরে বাইরেই ঘটনাটা ঘটছিল। এবার সেটা বাড়ির ভেতরে ঘটতে থাকবে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার নিজের মাকে আমি দেখিনি। মা কেমন দেখতে ছিল তা-ও আমি জানতুম না। কিন্তু মা'র সম্বন্ধে একটা কল্পনা করা স্মৃতি ছিল। মনে হতো মা বেঁচে থকেলে এ জিনিস ঠিক এমন হতো না। মা'র কল্পনাটা এমনই বাস্তব ছিল যে, তার না-থাকাটা আমার কাছে তার থাকার চেয়েও বেশি সত্যি ছিল। মা ছিল না বলে মনে হতো মা অদৃশ্য হয়ে বুঝি সমস্তই দেখছে। মা'র তৈরি এম্‌ব্রয়ডারির কাজ, মা'র ব্যবহার করা আলমারি-ট্রাঙ্ক, সবই যেন মা'র অদৃশ্য অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। মা ছিল না বলেই আমার কাছে মা'র অস্তিত্ব জলের মত সোজা ছিল। মা থাকলে হয়তো এই স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যেত। মা থাকলে হয়ত আমি এমন করে ময়নাডাঙায় পালিয়েও যেতুম না।

যে-ক'দিন বাড়িতে ছিলাম সে-ক'দিন যেন জেলখানায় ছিলাম। নিজের ঘরখানার মধ্যে বসে-বসে সারা বাড়ির রং-বদলের চেহারাটা দেখতাম। এর আগে পর্যন্ত এ-বাড়িতে আমিই ছিলাম সব। এর পর থেকে হয়ে গেলাম কয়েদী। ন্টুটু তখন পা অপারেশন করে চলে গেছে। তার পা ভালো হয়ে গেছে। সোজা হয়ে তখন সে হাঁটতে পারতো। সেদিক থেকে আমার কোনও অভিযোগ ছিল না। অভিযোগ ছিল বাবার ওপর—

সেদিন গেলাম বাবার ঘরে।

—কী, আবার কী চাও ?

বললাম—হুটুর পা অপারেশন হয়ে গেছে। সে এবার চলে যাবে। তার টাকাটা।

—হোয়াট্?

বাবার খারাপ মেজাজের জবাবে আমি মেজাজ খারাপ করলাম না। খারাপ মেজাজের জবাবে মেজাজ কখনও খারাপ করতে নেই।

বললাম—সেই দশ হাজার টাকা!

বাবা বললেন—আমার ভ্যালুয়েবল্ প্রপার্টি চুরি করেও আবার টাকা? আমার ক্যামেরা, হীরের আংটি, টাকা পয়সা সেগুলো তাহলে কোথায় গেল?

বললাম—সব বেচে দিয়েছি—

—তাহলে তো দশ হাজার টাকা দেওয়াই হয়ে গেছে। বরং আরো বেশি কিছু দেওয়া হয়ে গেছে—

বললাম—কিন্তু সেগুলো বেচে আমি পেয়েছি মাত্র সাত হাজার টাকা, তবু আরো যে তিনি হাজার টাকা হুটুর পাওনা বাকি আছে—

হঠাৎ বাবা যেন ক্ষেপে উঠলো। বললে—তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

আমি বললাম—হুটুর ন্যায্য পাওনা চাইতে এসেছি, বেরিয়ে যাবো কেন?

বাবা বললে—আমার ভুল হয়েছিল প্রাইজ্ ডিক্লেয়ার করা, এখন হলে আর কাগজে অমন অ্যাড্ভারটাইজ করতাম না—

—কিন্তু হুটুর কাছে আমি মুখে দেখাবো কেমন করে?

বাবা বললে—তোমার মুখ কাউকেই দেখাতে হবে না। আমিও তোমার মুখের ইমেজ্ দেখতে চাই না। আই অ্যাম্ টায়ার্ড অব্ ইউ—

আমিও হঠাৎ বলে ফেললাম—তাহলে আমিও তোমার মুখ দেখতে চাই না।

বলে চলে এসেছিলাম। হঠাৎ মেয়েলী গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম —যেও না, শোন—

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। দেখি আমার নতুন-মা। নতুন-মা ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে ফিরতে দেখে বললে—ছি, বাবার সঙ্গে অমন করে কথা বলতে আছে?

উত্তরে আমি কী বলবো বুঝতে পারলুম না। নতুন-মা'র দিকে আমি

একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। বাবার দেওয়া শাড়ি-গয়না, বাবার দেওয়া লিপ্‌স্টিক রুজ্‌ সব কিছু আমার চোখের ওপর জল্‌জল্‌ করতে লাগলো।

নতুন-মা আবার বলতে লাগলো—তুমি তো লেখাপড়া-জানা ছেলে, বাবার সঙ্গে কী-রকম করে কথা বলতে হয় তাও জানো না? এতদিন কি তোমার এই শিক্ষা হয়েছে?

বাবার মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল—তুমি চুপ করো আরতি, ওর শিক্ষা কোনকালে হবে না, ও ইন্‌কোরিজিবল্‌, ওকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দেব।

—তুমি থামো না!

নতুন-মা বাবাকে যেন শাসন করার ভঙ্গিতে বললে—আমার কথার মধ্যে তুমি কথা বলো কেন?

বলে আমার দিকে তাকালো। তারপর আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে ঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। যেন আমি তার কত আপন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

দেখলাম বাবার সেই পুরানো শোবার ঘরখানার চেহারা আমূল বদলে গেছে। পর্দা, চাদর, খাট, ফার্নিচার সব কিছু নতুন। যে ঘরে মা শুতো সেই ঘর থেকে মা'র সমস্ত চিহ্ন যেন মুছে ফেলা হয়েছে।

—এখানে বোস তুমি।

বললাম—না, আমি বসবো না।

আমার যেন কেমন মনে হলো আমায় ঘুষ দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। মা'র জায়গায় যে এসে হাজির হয়েছে, পাছে তার নতুন জায়গায় প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটে তাই সেই ছদ্ম স্নেহ। আসলে ওটাই তো ঘুঁষ। নামে ঘুঁষকে আমরা ঘুঁষ বলি, কিন্তু ঘুঁষের তো আর একটা নাম নয়। শ্রীকৃষ্ণের শত নামের মত তারও অসংখ্য নাম। আমার সরকারের ঘুঁষখোর হিসেবে বদনাম আছে। কিন্তু ঘুঁষ কখনও কখনও বখ্‌শিশ নামেও পরিচিত। আবার কোথাও কোথাও তার নাম 'পান খাওয়ানো'। কোথাও সেলামি। আসলে সবই ওই ঘুঁষ। দেখেছি মানুষ যেখানে দুর্বল সেখানেই সে ঘুঁষ দেওয়ার পক্ষপাতী। কৌশলে তাড়াতাড়ি কাজ আদায় করার সহজতম পথই হচ্ছে ঘুঁষ।

আমি একবার আমার সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এত জিনিস করতে পারছেন আর ঘুঁষ বন্ধ করতে পারছেন না এই স্টেট্‌ থেকে?

আমার সেক্রেটারি বলেছিল—ঘুঁষ বন্ধ করতে পারলেও তা কখনও বন্ধ করবেন না স্যার—

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন? কোর্ট-কাছারিতে ঘুঁষের উৎপাতে মানুষের জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, এর কোনও প্রতিকার নেই? এটা বন্ধ হচ্ছে না বলে সবাই যে গভর্মেণ্টকে দোষ দিচ্ছে—

আমার সেক্রেটারি বলেছিল—ঘুঁষ নেওয়া-দেওয়া বন্ধ হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে স্যার—

—কেন?

—এখন যে-পার্টিরই গভর্মেণ্ট হোক, কারোর সাধ্যি নেই ঘুঁষ বন্ধ করে, এখন যদি দশরথ-পুত্র রামও ফিরে আসে তো ঘুঁষ-সিস্টেম বন্ধ করতে পারবে না। কারণ ঘুঁষ বন্ধ হলে কোর্ট-কাছারিতে মকর্দমা আরো বেড়ে যাবে। এমনিতেই সব সময় কোর্টে আশি-নব্বুই হাজার মামলা জমে থাকে, এর পরে লক্ষ-লক্ষ কেস জমে যাবে। আর তা ছাড়া…

—তা ছাড়া কী?

—আর তা ছাড়া এখন তো লোকে তবু ঘুঁষ দিয়ে পার পাচ্ছে, কিন্তু তখন আর সামান্য ঘুঁষে কাজ হবে না স্যার, উকিল-অ্যাটর্নী মুহুরি-পেশ্‌কারে সাধারণ মানুষকে একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলবে। তার চেয়ে চোখের আড়ালে ঘুঁষ যেমন চলছে তেমনি চলুক—

আশ্চর্য! এতদিন পরে আমি নিজেই তো আজ ঘুঁষ নিলুম। ভেড়ির মালিক রথীন সিকদারের দেওয়া টাট্‌কা গল্‌দা চিংড়ি তো আমি আজই খেলুম। একটু আগেই যে স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ভেণ্ডার রসগোল্লা দিতে এসেছিল, সেও তো ঘুঁষেরই সামিল। সত্যিই তো, ঘুঁষ কি আমিই নিই না? তাহলে সভা-সমিতিতে গিয়ে আমি যে ফুলের দামী দামী মালা পরছি, তাও তো ঘুঁষ! খবরের কাগজওয়ালারা যে আমার ছবি বড় বড় করে ছাপে সেও তো এক রকমের ঘুঁষই। তারা সে-ছবি ছাপায় আমার কাছ থেকে কোনও উপকার পাবে বলেই তো। আমি সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়ার মালিক। আমি বিগড়ে গেলে তো তাদেরই ক্ষতি।

অর্থাৎ ঘুঁষ সারা পৃথিবীতেই চলছে। কখনও সেটা সোজা পথে, কখনও বাঁকা। গুলজারিলাল নন্দজী সেন্ট্রাল গভর্মেণ্টের মন্ত্রী হয়ে সদাচার-সমিতি

করেছিলেন ঘুঁষ বন্ধ করবার জন্যে। তাই তাঁকেও মিনিস্ট্রি ছাড়তে হলো।

আমার সেক্রেটারি তাই আমাকে বলেছিল—ও যেমন চলছে তেমনি চলুক স্যার, ওদের ঘাঁটাতে যাবেন না। শেষকালে মিনিস্ট্রিতে চিড় থাবে—

আমি বলেছিলাম—কিন্তু আমি কী করে ওসব সহ্য করবো? তাতে যে আমার বদনাম হয়ে যাবে? জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, গরীব মানুষ ক্ষেপে গেলে শেষে যে আমাদের ভোটই দেবে না—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কোনও কিছুরই কিনারা করতে পারিনি। ঘুঁষ আমার আগেও যেমন চলেছে, আমার আমলেও ঠিক তেমনি চলছে। আবার আমার পরের আমলেও হয়তো তেমনিই চলবে—

সেদিন হরিসাধনবাবু থাকলে কী বলতেন কে জানে। আর হরিসাধনবাবুর চাকরিও তো চলে গেল আমারই জন্যে। আমারই অবাধ্যতার জন্যে। কিন্তু আমি কী করতে পারতুম! আমি ঘুঁষ নিতে রাজি হলে আমাকে বাবার বাড়িও ছাড়তে হতো না। আমিও অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারতুম এতদিনে। আর তাহলে আমাকে এমন করে ভোটের আশায় লোকের সামনে ভালোমানুষ সাজতে হতো না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একাধারে সকলের চক্ষুশূল আর মাথার মণি হতে হতো না। সকলের ভালো করবার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতাম, জীবনটা সরল-সহজ ভাবে কাটিয়ে দেবার সুযোগ-সুবিধে পেতাম।

কিন্তু অ্যামবিশন্?

জীবনে বড় হবার, সকলের চেয়ে উঁচু হবার আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকতো তো থাকতুম কী নিয়ে? আর সকলের মত বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিয়ে ইন্‌কাম ট্যাক্সের ঝামেলা সহ্য করে বেঁচে থাকার দায়ই কি কম? তার চেয়ে তো অ্যাম্‌বিশন্ থাকা ভালো। কিছু থাকার যেমন ঝামেলা আছে, কিছু না-থাকারও তো তেমনি ঝামেলা আছে। এক এক সময় মনে হয় কিছু না থাকার ঝামেলার চেয়ে কিছু থাকার ঝামেলাটাই বোধহয় বেশি। অর্থাৎ সংসারে বেঁচে থাকাটাই ঝামেলা—কম আর বেশি এই যা তফাত। তবু তো সাধারণ মানুষ হলে এমনি করে খবরের কাগজে আমার ছবিও ছাপা হতো না। তাহলে আজকের মত এত ঘটা হতো না আমাকে নিয়ে। এত আয়োজন এত আন্দোলন সব তো আমাকে কেন্দ্র করেই। আসলে কৃষিজীবী সম্মেলনটা তো উপলক্ষ্য। লক্ষ্য তো আমিই। আমারই লেকচার হয়ত

এতক্ষণ খবরের কাগজের লোকরা কম্পোজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তাদের কাছে আমার লেকচারের আগাম কপি পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সেক্রেটারি। তাদের স্টাফ রিপোর্টার এখানে আসবে, নোট নেবে, কিন্তু আসলে কম্পোজিটারেরা তো আগেই জেনে গেছে আমি আজ এখানে কী বলবো।

সেদিন হাসপাতালে গিয়ে ফুটুকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। ফুটুর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। যেন সব কথা তার চোখের জলেই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

বললাম—তোর কিছু করতে পারলুম না ফুটু—আমার কথা আমি রাখতে পারলুম না—

ফুটু উত্তরে কিছু বললে না। শুধু জলই পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে।

বললাম—চোখে আবার তোর কি হলো?

ফুটু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তুই আমার সব ধার শোধ করে দিলি বুঝি!

আমি বললাম—আমার জন্যে তুই তোর বৈকুণ্ঠকে কশাইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়েছিলি, সে ধার কি শোধ করা যায়? তোর ধার শোধ করতে গেলে আমাকে আর একবার এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে।

ফুটু বোধহয় উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

বললাম—আমি শীগ্‌গির আবার ময়নাডাঙায় যাবো—কিছু ভাবিস নি—

ফুটুর চেহারাটা আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারপর আমি আমার বাড়ি ফিরে এলাম।

হায় রে! সেই ময়নাডাঙায় যাওয়ার কথা দেওয়া যে এতদিন পরে সত্যিই আবার ফলবে তা কে জানতো। সে কবেকার কথা। বোধহয় পঞ্চাশ বছর হবে। পঞ্চাশ বছর পরে যে আবার একদিন আমি ময়নাডাঙায় আসবো তা কি আমিই কোনও দিন ভেবেছিলুম? ফুটুর পা অপারেশন করে ভালো হয়ে গিয়েছিল। বেমালুম অপারেশন। ফুটু নয়, যেন আমিও সুস্থ হয়ে

উঠেছিলুম তার সঙ্গে। তাকে চিকিৎসা করার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমারও মনের সমস্ত রোগের আরোগ্য হয়েছে। কিছু লোকে বলে চীফ্ মিনিস্টার হয়ে আমি নাকি দেশের অনেক কাজ করেছি। দেশে যেখানে জলকষ্ট ছিল, তা দূর করেছি, যেখানে স্কুল ছিল না, সেখানে স্কুল করে দিয়েছি। আরো কী-কী কত কাজ করেছি তা আমার সম্বর্ধনার সময় প্রায়ই সবিস্তারে বলা হয়। আমি কারো কারো কাছে নাকি দেশগৌরব, দেশপূজ্য, দেশসেবক। ব্যাকরণে যত বিশেষণ আছে সবগুলোই নানা সময়ে আমার নামের আগে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো জানি ও সমস্তই হলো ঘুঁষ। আমার পদের জন্যে সবাই ওই ঘুঁষটা আমাকে দিয়েছে। আমি ভোটে হেরে যাবার পর আবার এই চেয়ারে যে লোক বসবে তাকেও তারা এই বিশেষণ দিয়েই বিভূষিত করবে। এইটেই নিয়ম। কিন্তু জীবনে সত্যিই যদি কারোর কোন উপকার করে থাকি তো সে একমাত্র মুটুর। আমি মুটুকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তার পা ভালো করে দিয়েছি, এর চেয়ে বড় কাজ আমি জীবনে কারোর জন্যে করিনি, কিছুর জন্যেই করিনি।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসেই ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম।

দেখি আমার ঘরের বিছানা চাদর পর্দা সব কিছু বদলে গেছে। একেবারে আনকোরা নতুন। বাবার শোবার ঘরে যেমন ঠিক তেমনি।

আমি রঘুকে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম—এ সব কে করলে রে?

রঘু বললে—আমি—

—কে তোকে করতে বললে?

—নতুন-মা।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম—ঘুঁষ। নতুন-মা নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাকে ঘুঁষ দিয়েছে। আজ এত বছর ধরে ঘুঁষ নিয়ে আসছি। ঘুঁষ নিয়ে নিয়ে আমার হাত কালো হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন সেই জীবনের প্রথম পাওয়া ঘুঁষ, তার জ্বালা যেন আমার কাছে অসহ্য লাগলো।

আর দেরি করলাম না। বিছানা চাদর পর্দা বালিশের ওয়াড় সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম—এসব নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়, আমার দরকার নেই এসব—

দেখি ঘরের বাইরে নতুন-মা এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—এসব কী হচ্ছে?

জেলখানায় ত্রৈলোক্যদার কাছে বসে বসে এই সব গল্প করতাম।

ত্রৈলোক্যদা জিজ্ঞেস করতেন—তারপর ?

সে-সব গত যুদ্ধের অনেক আগেকার ঘটনা। জীবন তখন এত জটিল ছিল না। আমাদের সকলের একমাত্র শত্রু ছিল তখন ইংরেজরা। সকলের শত্রুই যখন একজন হয় তখন বিবাদীদের মধ্যে মিল থাকে, ভালবাসা থাকে।

তাই ত্রৈলোক্যদা বলতেন—এখন আমাদের এ লড়াইটা তো সোজা হে। সবাই আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু যে দিন ইংরেজরা চলে যাবে ?

আমি জিজ্ঞেস করতুম—সত্যিই চলে যাবে ?

—চলে যাবে না ? কেউ কোনদিন চিরকাল থাকতে এসেছে ? আকবর বাদশা চলে যায়নি ? রেজা খাঁ চলে যায়নি ? বর্গীরা চলে যায়নি ? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চলে যায়নি ? কিন্তু একজন অত্যাচারী চলে গেলেই যে সব আপদের শান্তি হবে তা তো নয়। ইংরেজরা চলে যাবার পরই অশান্তি আরো বাড়বে।

বলে আবার তখন বুঝিয়ে বলতেন—দেখ, একটা বাড়িতে দেখেছি শাশুড়ি-বউতে দিনরাত ঝগড়া লেগে থাকতো। পাড়ার লোক ঝগড়ার জ্বালায় বাড়িতে টিঁকতে পারতো না। তারা ভাবতো, শাশুড়ীটা আর ক'দিন ? শাশুড়ীটা মারা গেলেই সব আপদের শান্তি হবে। আর শাশুড়ীও তখন বুড়ী হয়ে গিয়েছিল। তারও যাবার বয়েস। তা একদিন শাশুড়ী মরলো। লোকে কালীঘাটে গিয়ে মহা ধুমধাম করে পুজো দিলে। ভাবলে এবার আপদ চুকলো। কিন্তু তা হলো না। বউ তখন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলো, পাড়ার লোকের সকলের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলো। তা এইটেই সংসারের নিয়ম—

ত্রৈলোক্যদার অনেক বয়েস হয়েছিল, অনেক দেখেছেন তিনি, অনেক ভুগেছেন।

—তারপর ?

বললাম—সেই সময়ে স্কুল-কলেজ ছাড়ার হিড়িক চলেছে। দলে দলে সবাই লেখাপড়া ছেড়ে দেশের কাজে নামছে। পার্কে পার্কে পাড়ায় পাড়ায় মীটিং হচ্ছে। পুলিস এসে লাঠি মেরে মীটিং ভেঙে দিচ্ছে। ইতিহাসে এক-একটা পিরিয়ড আসে যখন জীবন বাঁধা-পথে চলতে চলতে হঠাৎ অন্যদিকে মোড় নেয়। তখন দেশের মানুষের মনে একটা নতুন ভাবনা এসে ঢোকে। চিরকালের বাঁধা-ধরা ভিতের গায়ে চিড় ধরে। এও

ঠিক সেই রকম সময়। আমিও তাদের দলেই ভিড়ে গেলুম। আমিও তাদের দলের সঙ্গে মিশে বিলিতি কাপড় পোড়াতে লাগলুম—

মানুষ যখন কিছু ধ্বংস করে তখন সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকেও ধ্বংস করে। নিজেকে ধ্বংস করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। নিজেকে ধ্বংস করছে এটা যখন সে জানতে পারে, তখন আর তার মধ্যে সে আনন্দ পায় না। আমিও জানতে পারিনি, তাই মন-প্রাণ দিয়ে বিলিতি কাপড় পেলেই পোড়াতে আরম্ভ করি। আমার মনে হয়েছিল বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে আমি একটা মহৎ কাজ করছি। দেশের সেবা করছি।

আমার এখনও মনে পড়ে সেই দৃশ্যটা।

আমার ঘরের চাদর, পর্দা, বালিশের ওয়াড় সব কিছু তখন ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরের ধুলোয় ফেলে দিচ্ছি।

আমি রঘুকে বললুম—ওতে আগুন ধরিয়ে দে—

নতুন-মা আবার চীৎকার করে উঠলো—ও কী, হচ্ছে কী?

আমি বললুম—ও-সব পুড়িয়ে দিতে বলছি। ও-সব কে দিয়েছে আমার ঘরে?

নতুন-মা বললে—আমি, কেন?

—বিলিতি জিনিস কেন দিলে তুমি? আমি বিলিতি কিছু আর ব্যবহার করবো না—

সেকালে বাড়িতে বিলিতি জিনিসের প্রাচুর্য গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের চিহ্ন বলে স্বীকৃত হতো। এ বিষয়ে সেকালের সঙ্গে একালের কোনও তফাত নেই। দেশের রাজা পালটে গেছে। এখনও যার বিলিতি গাড়ি আছে সমাজে তার খাতির বেশি। বিলিতি সিগারেট থেকে আরম্ভ করে বিলিতি কলম পর্যন্ত, সব জিনিসের ওপর আমাদের লোভ কি? এটা ঠিক বিলিতি জিনিস বলে নয়। আসলে নিজের থেকে পরের জিনিসের ওপরেই আমাদের লোভটা বেশি। যেমন নিজের চেয়ে পরের নাম, পরের গয়না, পরের বউ। Slave mentality বলে একটা কথা আছে ইংরিজীতে। কিন্তু আসলে ওটা Slave mentality নয়, human mentality.

ছোটবেলায় বইতে পড়েছিলুম, প্রতিবেশীরাই অশান্তির আসল মূল। সেকালের মুনি-ঋষিদের আশ্রমের পাশে কোনও প্রতিবেশী ছিল না বলে তাঁদের সাধন-ভজন নিয়মমাফিক চলতো। ঋষি-পত্নীদের ঈর্ষার সৃষ্টি

করতো না প্রতিবেশিনীর শাড়ি-গয়না-রূপ। আসলে প্রতিবেশীরা পর বলেই তাদের জিনিসের ওপর মানুষের এত লোভ, এত ক্ষোভ! ব্যক্তির পক্ষেও কথাটা যেমন সত্যি, রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনি। সেই কৌটিল্যের আমল থেকেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঝগড়া ওই পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলে। আসলে লোভ ওই পর বলে। চায়না যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র না হতো তো কোনও ঝঞ্ঝাটই হতো না তাকে নিয়ে। পাকিস্তানকে নিয়েও হতো না। সেই কারণেই রাজনীতিতে buffer-state রাখবার রীতি আছে। দুটো বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যিখানে একটা ছোট্ট গরীব স্টেট্। উদ্দেশ্য যত ঝুট-ঝামেলা তার ওপর দিয়েই কেটে যাক্।

এই পরের জিনিসের ওপর লোভের একটা আধুনিক উদাহরণ সেদিনই পেয়েছি। আমার লেবার-মিনিস্টার কোন্ কন্‌ফারেন্সে বিলেত গিয়েছিল। আজকাল কন্‌ফারেন্স করা তো ফ্যাশন হয়েছে একটা। ইন্টারন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স করাটা আরো বড় ফ্যাশন। আসার পথে ধরা পড়েছে কাস্টম্‌স্ অফিসে। দু'টো ক্যামেরা, চারটে ঘড়ি, তিনটে মেক্ আপ্ বক্স, দুটো ট্র্যানজিস্‌টার সেট সঙ্গে ছিল।

চিঠি এল আমার কাছে।

আমি ডেকে পাঠালাম। বললাম—এসব নিয়ে এসেছ কেন? জানো না, ওসব আনলে কাস্টমস-অফিসে ধরা পড়বে?

লেবার মিনিস্টার বললে—খুব সস্তা পেলুম, সবাই নানারকম জিনিস আনতে বলেছিল। আমার শালার জন্যে একটা ঘড়ি. আর শালী বলেছিল মেক্-আপ্ বক্স আনতে—

আমার লেবার মিনিস্টার স্বজাতির মোটা ভোট পেয়ে ইলেকশানে জিতেছিল। প্রচুর টাকার মালিক, ব্যাঙ্কের টাকা, দশ-বারোখানা বাড়ি, তার ওপর কংগ্রেস ফাণ্ডে পঞ্চাশ-হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিল। ইচ্ছে করলে ওরকম ঘড়ি, মেক্-আপ্ বক্স, ক্যামেরা সে হাজার গণ্ডা কিনতে পারে। কিন্তু তবু তার লোভ পরের জিনিসের ওপর। লোভটা বিলিতি জিনিস বলে নয়, পরের জিনিস বলে।

তা বাবা হঠাৎ দৌড়ে এল আমার কাছে।

বললে—এসব কী দুইস্যান্স হচ্ছে এখানে?

কাপড়গুলো তখন দাউ দাউ করে পুড়ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে

জায়গাটা।

বললাম—বিলিতি জিনিস তাই পুড়িয়ে দিচ্ছি—

রাগে আত্মহারা হয়ে ওঠা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে পাপ। কিন্তু সেই পাপই বাবা সেদিন করে ফেললে।

বললে—বি অফ্, বি অফ্, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও এক্ষুনি, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না আর—বি অফ্—

কথাগুলো পুরো ইংরিজী ভাষাতেই বলছিল বাবা। বাঙালীরা বাংলা ভাষায় গালাগালি দিলে গালাগালির গুরুত্ব বাড়ে না, বাড়ে হিন্দীতে বা ইংরিজীতে বললে। তাতে ভাষার মানে না বদলালেও গুরুত্বের তারতম্য হয়।

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। সেই অবস্থায়ই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কারণ বুঝলুম এর পর আর এ-বাড়িতে থাকা অর্থহীন। শুধু অর্থহীন নয়, অপমানকরও বটে।

একটা কথা পড়েছিলুম: when a man and woman are married, their romance ceases and their history commences. বিয়ে পর্যন্ত শুধু প্রেম আর প্রেম, তখন প্রেম ছাড়া আর সব কিছু তুচ্ছ। যেই বিয়ে হয়ে গেল সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেল ইতিহাস। তখন প্রেমের সঙ্গে জুটবে ইন্সিওরেন্স, সিকিওরিটি, ডাক্তার আর তার সঙ্গে জুটবে প্রপার্টি। ওরই নাম তো ইতিহাস।

সেইদিনই রাত্রে পাড়ার একটা পার্কে স্বদেশী মিটিং চলছিল। সেখানে যেতেই আরো অনেক দলবলের সঙ্গে পুলিস আমাকেও জেলে ধরে নিয়ে গেল। আমি বেঁচে গেলুম।

একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে হুটুদের ময়নাডাঙায় গিয়েছিলাম। সেও এক রকমের বিদ্রোহ। কিন্তু এবারের বিদ্রোহ অন্য রকম। এ বিদ্রোহ চিরস্থায়ী। সেবার তবু আবার একদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এবার আর বাড়ি ফেরা নয়, গৃহত্যাগ। স্থায়ীভাবে গৃহত্যাগ।

গৃহত্যাগ মানে Establishmentএর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ইংরিজী ভাষাতে Establishment কথাটার আমদানি নতুন। Concise Oxford Dictionaryতে Establishment-এর মানে লেখা আছে: An organised body of men maintained for a purpose, as army, navy, civil service.

কিন্তু বিরাট বপু American Random House Dictionaryতে আছে : The existing power structure in society.

ইংলণ্ডের রাজা Edward VIII এখন নামে Duke of Windsor. সম্প্রতি বি. বি. সি.তে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তার মধ্যে ওই কথাটা ব্যবহার করেছেন। সবাই জানে একদিন মিসেস সিম্‌সনের জন্যে তাঁকে ইংলণ্ডের রাজার সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল।

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—Even if I had not married Mrs. Simpson, a clash between me and the establishment would have been inevitable.

তখন প্রশ্ন করা হলো—Establishment মানে কী ?

ডিউক বললেন—কথাটা নতুন, পনেরো বছর আগে যখন আমি কথাটা প্রথম শুনি, তখন আমিও লোককে জিজ্ঞেস করেছিলুম কথাটার মানে কী ?

তারপর তিনি বুঝিয়ে বললেন—কথাটার মানে যা-ই হোক, আমি নিজের মনের মত শব্দটার একটা মানে করে নিয়েছি। Establishment মানে যদি রাজত্ব হয় তো আমার বাবা ছিল establishment, আমার দাদাও ছিল তাই, কিন্তু একমাত্র আমিই হলাম স্বাধীন। So one may give a negative definition of the establishment. Whoever strives to be independent cannot be part of the establishment.

আমাদের দেশে তথাগত বুদ্ধদেব, রাজকুমার সিদ্ধার্থ, নদীয়ার নিমাই, লালাবাবু, গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সবাই ছিলেন স্বাধীন। স্বাধীনতা কখনও establishment সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে পারে না বলেই তাঁরা সবাই establishment-কে অস্বীকার করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। ছোটবেলায় ভাবতাম কেউ গৃহত্যাগ করেন ধর্মের জন্যে, কেউ ঈশ্বরের জন্যে, কেউ সাধনভজনের জন্যে, আবার কেউ বা নারীর জন্যে। কিন্তু এখন বুঝতে শিখেছি আসলে ও-সব উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য হলো স্বাধীনতা।

আমার স্বাধীন হওয়ার স্পৃহাই সেদিন আমাকে এই establishment-এর নিগড় থেকে বাঁচিয়েছিল। সারা ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে বাড়ির মধ্যে বন্দী করে রাখতে চাইতেন পাছে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমি খারাপ হয়ে যাই। কিন্তু আজ ভাবি ভাগ্যিস্ সেদিন আমি এই

establishment-এর জাল কেটে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলুম !

মনে আছে, একদিন আমি নিজের ঘরে বসে ছিলাম। বাইরে থেকে চাপরাশীর হাত দিয়ে আমার কাছে একটা স্লিপ্ এল।

স্লিপ্টা পড়ে দেখি তাতে কালি দিয়ে লেখা আছে একটা নাম—অজয় সেন—

অজয় সেন! ও-নামে কখনও কাউকে চিনতুম বলে মনে পড়লো না। তখন আমি আমার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে জরুরী চিঠির ডিক্টেশন দিচ্ছি। একবার মনে হলো দেখা করবো না। কিন্তু ভোট! আবার কিছুদিন পরেই ভোট আসছে। তখন তো আবার আমাকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে হবে!

স্টেনোগ্রাফারকে বিদায় দিয়ে অজয় সেনকে ডেকে পাঠালুম। দেখি একজন অচেনা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গায়ে সিল্কের চাদর, খালি পা, হাতে কুশাসন।

বললাম—বসুন, কী চাই?

ভদ্রলোক আসনটা পেতে বসলেন। বললেন—আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি আপনার ছোট ভাই—

ছোট ভাই কথাটা শুনে চমকে গেলাম।

বললাম—ছোট ভাই মানে?

ভদ্রলোক তখন আমার বাবার নাম করলেন। বললেন—তিনি সম্প্রতি গত হয়েছেন—

বলে আমার দিকে কালো বর্ডার দেওয়া একটা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নর চিঠি এগিয়ে দিলেন। ওপরে লেখা আছে—৺গঙ্গা—

পড়লাম। পড়তে পড়তে যেন আমি চোখের সামনে তাঁকে দেখতে পেলাম। মনে হলো মানুষের জীবনে মৃত্যুই বোধ হয় চরম শিক্ষা। মৃত্যুর সময়ে নিশ্চয় সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলো বাবার স্মরণে এসেছিল। আমাকে যে তিনি একদিন ত্যাগ করেছিলেন তাও নিশ্চয় তাঁর স্মরণে এসেছিল। যখন তিনি মারা যান তখন আমি জেলে ছিলাম, কিন্তু যখন তাঁর শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান হলো তখন আমি চিফ্ মিনিস্টার। আমি যে একদিন চিফ্ মিনিস্টার হবো তাও কি তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন? কল্পনা করতে পারলে তিনি কি সুখী হতেন? কল্পনা করলে বাবার ভাগ্য-বিধাতা সে সময়ে হাসতেন কি না কে জানে, কিন্তু

যদি তিনি না-ও হাসতেন তো তাঁর হাসা নিশ্চয় উচিত হতো।

বাবা যখন মারা যান আমি তখন সামনে ছিলাম না।

—খুব কষ্ট পেয়েছেন নাকি শেষ সময়ে?

অজয় বললে—খুব। আমি তো ছিলুম না, মা'র কাছে শুনলুম খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। দিনরাত কাঁদতেন। মা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো—জ্যোতিকে খবর দেব? বাবা বলেছিলেন—না—

আমার মনে পড়ল সেই নতুন-মা'র কথা। একদিন যে নতুন-মা বাবাকে বলে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই নতুন-মা-ই তখন আবার আমাকে অন্য পথ দিয়ে বাড়িতে ডাকিয়ে আনবার মতলব করেছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপর আপনাকে খবর দিতে বলেছিল মা। সেইজন্যে আমি আপনার বাড়িতেও দেখা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার সেক্রেটারি দেখা করতে দেননি। বললেন—তিনি মিটিং করছেন। কিন্তু আজকে আর থাকতে পারলুম না—আপনি কিন্তু যাবেন একবার দয়া করে। মা একেবারে ভেঙে পড়েছে, আপনি গেলে মা তবু একটু বুকে বল পাবে—

এর উত্তরে আমি অনেক কিছু বলতে পারতুম। বলতে পারতুম—তখন তোমার মা কোথায় ছিল, যখন আমাকে পুলিসে লাঠি মেরেছে? যখন আমি জেল খেটে মরছি? সে সময়ে তো কত লোক আমার সঙ্গে জেলখানায় দেখা করেছে। তখন তো তোমরা কেউ আমার কথা ভাবোনি। যখন কাঁথিতে নুনের সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে আমার মাথায় পুলিসের লাঠি পড়লো, তখন বহু লোক টেলিগ্রাম করে আমায় অভিনন্দন জানিয়েছে। তখন কোথায় ছিল আমার বাবা, আর কোথায়ই বা ছিল আমার নতুন-মা! বাবার অত টাকার সম্পত্তির একমাত্র ভাগীদারকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আরামের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিতে তো কোন পাপ-বোধ নতুন-মা'র অন্তরকে পীড়িত করেনি! যেদিন আমি বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম সেদিন আমার সম্বল বলতে শুধু ছিল মাথার ওপর উদার ওই আকাশ, আর পায়ের তলায় পদানত এই মাটি। মানুষের জীবনের মূল কথাটাই তো তাই। শূন্য থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে আবার শূন্যতে এসে শেষ হওয়া। এই জীবনের মত পৃথিবীটাও তো তাই। শূন্য থেকে আরম্ভ করে মহাশূন্যে সমাপ্তি। এই আরম্ভ আর এই শেষের মাঝখানটাতেই তো যত গণ্ডগোল।

ওই মাঝখানটাতেই গ্রাসাচ্ছাদন, জীবিকা, মামলা-মকর্দমা, সুখ, বিচ্ছেদ, প্রতিযোগিতা, প্রতিষ্ঠা, নৈরাশ্য, অহঙ্কার সব কিছুর ঝামেলা। কিন্তু এক-একজন মানুষ থাকে যারা ওতে জড়ায় না, যারা আরম্ভের আর শেষের শূন্যের কথাটা মনে রেখে সুখে-দুঃখে বিগতস্পৃহ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে জীবন কাটায়। সংসারী লোক তাদের বলে মহাপুরুষ। কিন্তু মহাপুরুষই হোক আর যাই হোক অভিজ্ঞতা থেকেই তো আসে অনুভূতি। আর অনুভূতি থেকেই তো জন্মায় দর্শন। যাকে বলি জীবনদর্শন। অস্কার ওয়াইলড বলেছেন মানুষ বার বার ভুল করে আর সেই ভুলের নাম দেয় অভিজ্ঞতা। আমি দর্শন পর্যন্ত পৌঁছোইনি। অভিজ্ঞতার বেড়াজালে আটকে গিয়ে মুক্তি পাবারই চেষ্টা করেছি কেবল। বুঝতে চাইছি আমার আমিটা কে? আমি বলে যাকে আমি এত ভালবাসি সে আমিটা কী বস্তু!

যাবার সময় অজয় বলে গেল—আপনি গিয়ে একবার দাঁড়ালে মা তবু একটু সান্ত্বনা পেত, মা খুব ভেঙে পড়েছে—

তা গেলুম। দিন-ক্ষণ সব আমার সেক্রেটারির ডায়েরিতে লেখা থাকে। আমি যখন কোথাও যাই তখন আমাকে ঘিরে আমার চাপরাসী, পুলিস, প্লেন ড্রেসে সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের লোক থাকে। ওটা বহুকালের নিয়ম। অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। ক্বচিৎ কখনও কখনও ওদের সঙ্গে নিয়ে যাই না। যেমন আজকে এই ময়নাডাঙায় ওদের নিয়ে আসিনি। কিন্তু সিকিউরিটির বন্দোবস্ত কি নেই? আছে। এই জেলার এস-ডি-ও তার নিজের চাকরির দায়িত্বে সে-বন্দোবস্ত করে রেখেছে। তার জন্যে কয়েক হাজার টাকার বিলও পাঠিয়ে দেবে আমার হোম-মিনিস্ট্রির কাছে।

কিন্তু সেদিন কাউকেই আমার সঙ্গে নিয়ে গেলাম না। একদিন একলাই ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, আবার একলাই সে-বাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম।

সেই বাড়ি! কত বছর পরে সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু একলা গেলে কী হবে, জানাজানি হতে তো দেরি হয় না এ ব্যাপারে। পাড়ায় পাড়ায় রটে যেতে দেরি হলো না যে ব্যারিস্টার সেনের শ্রাদ্ধে চিফ্ মিনিস্টার এসেছে। চিফ্ মিনিস্টার কোনও বাড়িতে গেলে পাড়ায় সে-পরিবারের ইজ্জত বাড়ে। ইজ্জতটা এখানে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যে নয়, আমার ওই চেয়ারটার জন্যে। একথা অন্য কোনও চিফ্ মিনিস্টার জানুক

আর না জানুক, আমি জানতুম। আমাকে দেখে গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না। আমার কোনও দিনই এই ভণ্ডামি ভালো লাগেনি। কারণ আমি দেখেছি একদিন ব্রিটিশ-আমলের সাহেবদেরও এরা এইভাবে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখিয়েছে। আসলে এটা কিছু আশ্চর্যেরও নয়। এরা establishment-কেই শ্রদ্ধা করে, স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি যে একদিন establishment ত্যাগ করেছিলুম সে জন্যে কোনও দিন কারো কাছে কোনও সম্মান পাইনি। পেয়েছি নতুন একটা বৃহত্তর establishment-এর প্রতিনিধি হয়েছি বলে। Duke of Windsor যখন Edward the Eighth ছিলেন তখন যা সম্মান পেয়েছিলেন এখন কি তিনি আর তা পান? কেন পাবেন? এখন যে তিনি স্বাধীন! তাই তো বলছিলাম মানুষ স্বাধীনতাকে সম্মান দেয় না, সম্মান দেয় establishment-কে।

শ্রাদ্ধবাসর খুব ঘটা করে সাজানো হয়েছিল। বাড়ির ভেতর দিকটায় চেয়ে দেখলাম, সেই বাড়ি, সেই আমার জন্মস্থান। সেই রঘু, সেই কৈলাস। আরো অনেকে ছিল। অনেকেরই নাম মনে নেই এখন। রঘু তখন বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, সামনে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করলে।

বললে—আমি রঘু হুঁজুর—

বললাম—ভালো আছিস?

কৈলাসও প্রণাম করলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। বললে—নতুন-মা আপনাকে একবার ডাকছেন হুঁজুর, আপনি যদি একবার ভেতরে আসেন—

একদিন সমস্ত সভ্য-সমাজের রীতি-নীতি ভেঙে বাবা এই নতুন-মাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন তিনি যা ইচ্ছে করবেন তাই হবে। আরো ভেবেছিলেন জীবনের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই জীবন। কিন্তু জীবনের দাবীর কাছে মানুষ তো তুচ্ছ। সে তার প্রয়োজনে একজন মানুষকে ওঠায় আর একজনকে নামায়। জীবন সেই অমোঘ ইতিহাস যা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে একজন মানুষকে গড়ে আবার তারপর ভাঙেও। মানুষ নিজের সার্থকতায় যখন সেই জীবনকেও অস্বীকার করে তখন বাবার মতই তার দশা হয়। শুধু বাবা কেন? রাজনীতির ক্ষেত্রে এসেও দেখেছি, যে ভেবেছে কংগ্রেসের জন্যে আমি নয়, আমার জন্যে কংগ্রেস তখনই তার

বাবার মত দশা হয়েছে। অর্থ চিরদিন থাকে না, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সম্মান স্বাস্থ্য কিছুই চিরদিন থাকে না। কিন্তু জীবন থাকে। অর্থাৎ মহাজীবন। সেই মহাজীবনের ইতিহাসের লিখন যে পড়তে না পারবে সে একদিন ধ্বংস হবেই। তার আর রক্ষে নেই।

কিন্তু Establishment ?

কথাটা নতুন এসেছে ইংরিজী ভাষায়। এই কথাটা নিয়ে আজকাল বড় আলোচনা হচ্ছে। কথাটা ঘন ঘন ব্যবহার করা হচ্ছে। চারদিকের ভিড়, কীর্তন, গান, অতিথিদের অভ্যর্থনা, সব কিছুর মধ্যে তখন আমার মাথায় ওই কথাটাই ঘুরছিল কেবল।

নতুন-মা'র কথাগুলোও মনে পড়ছে। তিনি বললেন—তুমি যে এসেছ তাতে বড় খুশী হয়েছি বাবা। অজয়কে কত বার বলেছি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, কিন্তু ও যা লাজুক ছেলে—

আমার ক্যাবিনেটের মীটিং-এ একদিন একজন মিনিস্টার বলেছিল—জ্যোতিদা, আমরা চলে গেলে লোকে বুঝবে কমিউনিস্টরা কত খারাপ, ওরা একবার মিনিস্ট্রিতে আসুক।

আমি বলেছিলাম—দেখ, ওদের বদনাম করবার জন্যে আমরা গদী ছাড়তে রাজী নই, যেদিন বুঝবো আমরা গদী আঁকড়ে আছি বলে দেশের ক্ষতি হচ্ছে সেইদিনই আমরা যাবো—

—কিন্তু জ্যোতিদা, তাতে আমাদের পার্টির কী সুবিধে হবে ?

নতুন-মা হঠাৎ বললেন—এই সন্দেশটা খেয়ে নাও বাবা, একটু মিষ্টিমুখ করতে হয়—

মিনিস্টারের কথায় আমি সেদিন উত্তর দিয়েছিলাম—আমাদের পার্টির কোন সুবিধে হোক বা না হোক তবে তাতে মানুষের যদি কিছু সুবিধে হয় তো হবে—

আমি একটা সন্দেশ তুলে মুখে পুরে দিলুম। আর মনে মনে হাসি পেতে লাগলো। ব্যারিস্টার সেনের মৃত্যু মানেই তো আমার নিজের বাবার মৃত্যু! কিন্তু কই, আমি তো সেজন্যে অশৌচ পালন করিনি! অজয়ের মত আমি তো মাথা কামাইনি! তার জন্যে কারোর কাছে তো কোনও অনুযোগ শুনতে হচ্ছে না আমাকে! সত্যিই তো, কেন শুনতে হবে ? আমি যে চিফ্ মিনিস্টার!

সেইটেই অন্যায়। ন্যায়-অন্যায় যদি মানতে চাও তাহলে এ-লাইনে এসো না—

আমি ত্রৈলোক্যদার কথা তখনও মানিনি, এখনও মানি না।

ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়া সব কথাগুলোই কি ভুল? 'সদা সত্য কথা বলিবে'—এ কথাটা নাকি আজকাল আর চলে না। একবার একজন আমার কাছে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এসেছিল। সই করবার আগে ভেতরের পাতার লেখাগুলো পড়ছিলুম। একজন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি দেখলুম লিখেছেন—'সদা সত্য কথা বলিবে না।' মনটা খারাপ হয়েছিল দেখে! কে কাকে উপদেশ দিচ্ছে? কিসের উপদেশ? সত্য কথা না বলার মানে যদি হয় ডিপ্লোমেসি, তাহলে তো সেই ডিপ্লোমেসিতেই এ পৃথিবী চলছে। কিন্তু ডিপ্লোমেসির আর একটা মানে তো মিথ্যে কথা! যাকে বাংলা ভাষায় বলে মনকে চোখ ঠারা। সেইটেই কি ত্রৈলোক্যদা শিখিয়েছিল?

জ্যোতির্ময় সেন সেদিন বলেছিলেন—আমি ডিপ্লোমেসি না মেনেই রাজনীতি করবো—

সত্যিই তো, ডিপ্লোমেসি মানেই তো আপোস। আপোস যে করে সে ভীরু। ক্ষমা যেমন একটা গুণ, তেমনি বীরত্বও। অসহনীয়তা আর ভীরুতাও তেমনি দোষের। অথচ রাজনীতিতে সেই আপোসকেই বড় গলায় প্রশংসা করা হয়েছে। ইংরিজীতে সেই আপোসকে প্রশংসা করার জন্যেই আর একটা শব্দ তৈরী করতে হয়েছে, তার নাম Tact. Tact মানেটা যে কী তা বাংলায় বলা যায় না। কলা-কৌশল কথাটা দোষের, কিন্তু Tact কথাটা ভালো অর্থে ব্যবহার করার কথা বলা আছে অভিধানে। এক কথায় Tact-এর বাংলা হয় না।

অথচ আত্মরক্ষার জন্যে আমরা প্রতিনিয়ত ওই Tact-ই ব্যবহার করে চলেছি। কখনও বলি না যে আমরা আপোস করছি, কখনও বলি না যে আমরা ভয় পেয়েছি। আসলে আমরা মুখে বলছি আমরা আপোসহীন সংগ্রাম করছি, কিন্তু আসলে আপোস করে-করেই আমরা বেঁচে আছি। এরই নাম নাকি ডিপ্লোমেসি। তাই আমরা সবাই এক-একজন ডিপ্লোম্যাট।

এই ডিপ্লোমেসির চক্রান্তেই আমি আজ চিফ্‌ মিনিস্টার।

একদিন ভোটের আগে আমিই পাড়ায় পাড়ায় লেকচার দিয়েছিলাম—আমাদের আপনারা ভোট দিন আমরা আপনাদের চাকরি দেব। আমরা

সমস্ত প্রাইমারি স্কুলে মাইনে ফ্রি করে দেব। দেশের খাদ্যাভাব দূর করবো। দেশের নিরক্ষরতা, বেকারি বিনাশ করবো……

এমনি কত কথা বলে ভোটারদের আমরা ভুলিয়েছি। আমরা তাদের আমাদের দলে টেনেছি। আমাদের কথা বিশ্বাস করে তারা আমাদের ভোট দিয়েছে। এ বরাবর এমনিই চলে এসেছে। আমার আগে যে পার্টি ছিল তারাও এমনি ডিপ্লোমেসি করেছে। মানুষের দুর্বল জায়গায় সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষের ভোট আদায় করেছি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারিনি। বা করিনি। যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে তখন তাদের অন্য বাহানা করে স্তোকবাক্য দিয়েছি। শুধু আমি কেন? আমাদের পরেও যে-পার্টি আসবে তাদের চিফ্ মিনিস্টারও এমনি করে ডিপ্লোমেসি করবে। এমনি করে মিথ্যা স্তোকবাক্য বলে ভোট আদায় করবে। আর আজ আমি যেখানে বসে আছি, তারাও এই ঘরে এইখানে বসে থাকবে কৃষিজীবী সম্মেলন উদ্বোধন করবার জন্যে। আর ঠিক তখনও একটা বিরুদ্ধ পক্ষ এসে শ্লোগান দিয়ে হল্লা বাধাবার চেষ্টা করবে।

আর এখানকার এস-ডি-ও? এস-ডি-ও মিস্টার রায়?

আমার পরে যখন অন্য চিফ্ মিনিস্টার আবার এখানে আসবে, তখন তাকেও রক্ষা করবার জন্যে এমনি করে প্লেন-ড্রেসে পুলিস বসাবে। যখন দমদম জেলে ছিলাম তখন সেখানকার জেল-সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট হাত জোড় করে বলেছিলেন—দেখুন, দয়া করে আপনারা গোলমাল করবেন না, আমরা চাকরি করি। যখন যিনি মিনিস্টার হন তাঁকেই আমাকে খাতির করতে হয়। যখন আপনারা জেলে আসবেন তখন নিয়মকানুন মানতে হবে।

মনে আছে বহুদিন বাদে আর একবার সেই দমদম জেলখানায় গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার সেক্রেটারি ছিল, জেল-মিনিস্টারও ছিল। আদর-অভ্যর্থনার পর্যাপ্ত আয়োজন। সে-জেলখানা আর তখন নেই। আমি জেলখানা দেখতে যাবো বলে জেলের দেয়াল-সিলিং-মেঝে সব কিছু পরিষ্কার করা হয়েছে, চুনকাম করা হয়েছে ঘরগুলো। ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে সমস্ত কিছু।

আগেকার সেই জেল-সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট, তিনি আমাকে চিনতে পারলেন কিনা বুঝতে পারলুম না, বার বার 'স্যার' 'স্যার' করে খাতির করতে লাগলেন। বয়েস হয়েছিল বেশ। বোধহয় আর কিছুদিনের মধ্যেই রিটায়ার করবেন।

যখন সব চুকে-বুকে গেল, একটু একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমাকে আপনি চিনতে পারেন মিস্টার ব্যানার্জি ?

জেল-সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট বিস্মিত ভাবে বললেন—হ্যাঁ স্যার—

—কবে রিটায়ার করছেন আপনি ?

—আর দু'বছর বাকি আছে।

—কেমন কাটলো আপনার চাকরি-জীবন ?

জেল-সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মিস্টার ব্যানার্জি কী উত্তর দেবেন যেন বুঝতে পারলেন না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—বলুন না! ব্রিটিশ পিরিয়ডও দেখেছেন, এখনকার স্বদেশী পিরিয়ডও দেখছেন। কেমন লাগলো বলুন না ? আপনার কোনও ভয় নেই—

মিস্টার ব্যানার্জি বোধহয় অভয় পেলেন।

বললেন—সত্যি কথা বলবো স্যার ?

বললাম—বলুন না, আমি তো চিফ্‌ মিনিস্টার হিসেবে জিজ্ঞেস করছি না, মানুষ হিসেবেই আপনাকে প্রশ্ন করছি। আপনি আমাকে লাঠি মেরে আমার হাত ভেঙে দিয়েছিলেন মনে আছে ?

মিস্টার ব্যানার্জি চুপ করে রইলেন। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না তাঁর। তারপর বললেন—এমন আগেও হয়েছে—

ঔৎসুক্য হলো! জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম ?

—ব্রিটিশ আমলে আমরা কয়েদীদের যত অত্যাচার করেছি আমাদের তত প্রমোশন হয়েছে, তত মাইনে বেড়েছে। এখন আপনাদের আমল, এখনও কয়েদদের যত মারি ততই আমাদের প্রমোশন হয়, আমাদের মাইনে বাড়ে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তিনি আবার বললেন—আমি মানুষ হিসেবেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, জেলার হিসেবে নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন এমন হলো বলতে পারেন ? আমাদের দেশ তো এখন স্বাধীন হয়ে গেছে, সেই ব্রিটিশরা তো এখন এদেশ ছেড়ে কবে চলে গেছে—

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন—সে উত্তর আপনারা দেবেন।

বললাম—তবু আপনার মতটা বলুন না, একবার শুনি—

মিস্টার ব্যানার্জি তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলেন।

তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে বললেন—কিছু মনে করবেন না, আগে আমার স্টাফ্‌রা ঘুঁষ নিত। তা আপনি ভালো করেই জানেন। আগে আপনাদের কাছে ঘুঁষ পেয়ে আমরা বাইরে থেকে সিগারেট বিড়ি নানা রকম জিনিস ভেতরে এনে আপনাদের সাপ্লাই করেছি। আপনাদের চিঠিপত্র বাইরে চালান করে দিয়েছি। দরকার হলে আমরা বাইরে থেকে আপনাদের হাতে রিভলবার পিস্তল পর্যন্ত এনে তুলে দিয়েছি। তা নিয়ে আপনারা সাহেব খুন করেছেন। এখন সেই আপনারাই আবার গভর্মেণ্ট হয়েছেন। এখন যদি সেই আপনারাই আবার ঘুষ নিতে বারণ করেন, তাহলে আমরা তা শুনবো কেন? আপনারাই তো আমাদের এককালে ঘুঁষ নিতে শিখিয়েছেন, এখন অন্যরকম কথা বললে মানবো কেন?

আমি কী আর বলবো! চুপ করে রইলুম।

—আর একটু আগেই আপনি জিজ্ঞেস করলেন আমার এই দীর্ঘ চাকরির জীবন কেমন কাটলো! তারও উত্তর দিই। আমার প্রত্যেকটি স্টাফ্‌কে আমি আপনার কাছে ডেকে আনতে পারি। যারা পুরনো লোক তারা প্রত্যেকেই বলবে—এ আমলের চেয়ে ইংরেজদের আমল ঢের ভালো ছিল—

আমি থামিয়ে দিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন এমন হলো তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন—আমি যদি আপনাকে উল্টো প্রশ্ন করি কেন এমন করলেন আপনারা? কেন এমন হতে দিলেন? আগে এই জেলখানায় থাকতুম, জেলখানাতেই চাকরি করতুম। কিন্তু জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ি যেতুম তখন ছিলুম স্বাধীন। কিন্তু এখন সারা দেশটাই যে জেলখানা হয়ে গেল, এর কারণ কী বলুন? আমি একটা জেলখানার জেল-সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্, কিন্তু সেই সঙ্গে একধারে আর একটা বড় জেলখানার কয়েদী। এর কারণই বা কী বলুন? শুধু আমি নই, আমি আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, ছেলে মেয়ে সবাই আমরা কয়েদী।

তবু বুঝতে পারলুম না। বললাম—তার মানে?

—তার মানে কি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? আমার ছেলের কথাই

ধরুন না, আমার ছেলে এখানে ভালো ভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে, তার ইচ্ছে সে ফরেনে গিয়ে আরো হায়ার স্টাডি করবে। আমার যা টাকা আছে তাতে আমি তাকে বিদেশে রেখে পড়াতে পারি। কিন্তু তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। অথচ—কিছু মনে করবেন না স্যার—আপনার ছেলে যদি বাইরে যেতে চায় তো তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার জহরলাল নেহরুর নাতিরা তো সেখানেই পড়ছে। আর তাঁর মেয়ে তো দিনরাত সেখানে যাচ্ছে, ছেলেদের দেখাশোনা করে আসছে। যত বাধা আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলায়। আরো দেখুন, তাদের বেলায় ইংরিজী ভাষা। তারা ইংরিজীতে লেখাপড়া করবে। আর আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলায় তাদের হিন্দী শিখতেই হবে। না শিখলে চাকরি হবে না। এও কি একরকমের জেলখানা নয়?

সেদিন আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকিনি।

সেই জেল-সুপারিন্‌টেনডেন্ট মিস্টার ব্যানার্জি নিশ্চয়ই এতদিনে রিটায়ার করে গেছেন। আর তাঁর সঙ্গে কখনও আমার দেখা হয়নি। দেখা করবার অবসরও পাইনি। কিন্তু কথাগুলো এখনও মনে আছে। বার বার ভেবেছি কথাগুলো কি মিথ্যে?

মনে আছে সুটুকেও একবার জেলে যেতে হয়েছিল। আমি আর সুটু সেদিন গরুর গাড়ির মাথায় মোট বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। পেছনে পেছনে ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে আসছিল বৈকুণ্ঠ। রেল-বাজারের কাছে আসতেই পুলিস মামুলি চেয়ে বসলো।

—এ্যাই ছোকরা, মামুলি দিলি নে?

পাড়াগাঁয়ের পুলিসের চৌকিদার।

সুটু বললে—আজকে মামুলি আনতে পারিনি চৌকিদার মশাই—

বড় রেগে গেল চৌকিদার। ছুটো করে তামার পয়সা ছিল তখনকার দিনে চৌকিদারের বাঁধা বরাদ্দ। তাও দেবে না!

চৌকিদার কড়া ভাষায় বললে—বার বার তোকে বলেছি না, মামুলি না দিলে তোকে ছাড়বো না আর—আজ আর তোকে ছাড়ছি নে, চল্—

সুটুর অপরাধ যতখানি মাল নেওয়া নিয়ম তার চেয়ে বেশি মাল তার গাড়িতে সে বোঝাই করেছে।

সুটু হাতজোড় করে মাপ চাইলে। বললে—এবার ক্ষ্যামা করুন

চৌকিদার মশাই, কাল ঠিক মামুলি দেব, আজকে এখনও মজুরি পাইনি। এই মজুরি পেলে তবে চাল কিনবো, তাই সেদ্ধ করলে তবে ভাত খেতে পাবো—

কিন্তু পুলিস চিরকালই পুলিস। সেই ইংরেজ আমলেও যা, আমার আমলেও তাই।

তা মুটুকে চৌকিদার ধরে নিয়ে গেল থানায়। আমি বৈকুণ্ঠকে নিয়ে মুটুদের বাড়ি ফিরে এলুম। মুটুর বাবা দিগম্বর হালদার তখন রাস্তার দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে আছে। কখন ছেলে চাল কিনে বাড়িতে ফিরবে, ফিরে সেই চাল দিয়ে ভাত রান্না হবে।

আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—কী খোকাবাবু, মুটু এলো না? মুটু কোথায়?

আমি সমস্ত খুলেই বললুম।

দিগম্বর হালদার সব শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল। তারপর তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো। উঠে সোজা সদরের দিকে চলতে লাগলো হন্-হন্ করে—

মুটুর মা চেঁচিয়ে উঠলো—কোথা যাও তুমি?

দিগম্বর হালদার যেতে যেতে বললে—বাড়িতে হাঁ করে বসে থাকলে আমার চলবে? বাড়িতে বসে বসে আমি বুড়ো আঙুল চুষবো?

—তাহলে খাবে কী?

দিগম্বর হালদার বললে—হারাণ চাটুজ্জে মশাই আজ হাঁফ-কাশিতে মরো-মরো দেখে এইচি, যদি বুড়ো এখন মরে তো আমার খাবার ভাবনা? এখুনি শ্মশানে গেলে একটা পাঁট কে আটকাবে……—

শঙ্কর বললে—স্যার, মিস্টার রায় এসেছেন—

—কে মিস্টার রায়?

—ময়নাডাঙার এস-ডি-ও—

এস-ডি-ও মিস্টার রায়ের কাল থেকেই খুব খাটুনি যাচ্ছে। কোন মিনিস্টার সফরে এলে এস-ডি-ওদের খাটুনি যাবেই! ওতে এস-ডি-ওরা একটু বিরক্ত হয়। শুধু এস-ডি-ও নয়, এস-ডি-ওর বউ ছেলে মেয়েরাও

বিরক্ত হয়। মনিব দেখলে কোন্ মানুষ না বিরক্ত হয়। মনিব যতক্ষণ সামনে না থাকে ততক্ষণ চাকরই মনিব। কারো কাছে তাকে টাটকা-টাট্‌কি জবাবদিহি করতে হবে না।

এক রাজা এই রকম নিজের রাজ্যের মধ্যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। উদ্দেশ্য প্রজারা কে কী করছে, কী ভাবছে তা জানা। একদিন রাত্রে রাজা ওইরকম নিশা-অভিযানে বেরিয়েছেন। দেখলেন তাড়িখানায় বসে তাঁর রাজপ্রাসাদের একজন প্রহরী খুব হল্লা করছে। পয়সা না দিয়ে মদ খাচ্ছে—

রাজাকে চিনতে পারলে না প্রহরী।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এ-রকম বেআদপি করছো কেন?

প্রহরী তখন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। বললে—খবরদার বলছি, আমি সকলকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি, তখন ঠেলা বুঝবে—

রাজামশাই বললেন—বিনা অপরাধেই কি তোমার রাজামশাই শাস্তি দেবেন? প্রমাণ দেখতে চাইবেন না?

প্রহরী বললে—প্রমাণ আবার কী? রাজার কি প্রমাণ দেখবার অত সময় আছে? আমার কথাই প্রমাণ।

রাজামশাই বললেন—ঠিক আছে, আমাকে ধরে নিয়ে চলো রাজার কাছে, দেখি তোমার কত ক্ষমতা।

বলতে বলতে রাজামশাই তাঁর গায়ের চাদরটা খুলে ফেলেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর নেশা কেটে গেছে। সে রাজার পায়ের ওপর পড়ে মাফ চাইতে লাগলো—আমাকে ক্ষমা করুন হুঁজুর, আমি চিনতে পারিনি—

এ-সব প্রাচীন কাহিনী। এ যুগে এ ধরনের প্রহরী থাকলেও এ ধরনের রাজা আজ আর নেই। এ ধরনের রাজা থাকলে আজ তাঁকে সিংহাসন্ ছেড়ে পালাতে হতো।

গল্পের রাজা নিজের প্রহরীকে শাস্তিও যেমন দেন, তেমন আবার ক্ষমাও করেন তাকে। কিন্তু আজকের রাজারা শাস্তিও দেয় না, ক্ষমা করবার উদারতাও দেখায় না। তারা প্রহরীদের কাছ থেকে ভোট পেলেই খুশী। ভোটের আশ্বাস পেলেই তারা নিশ্চিন্ত।

আমি কিন্তু মিস্টার রায়ের কাছ থেকে কোনও ভোটের আশ্বাস চাইনি। তবে মানুষ তো অভ্যেসের দাস। ভোট পেয়ে পেয়ে আমার আগেকার চীফ মিনিস্টাররা এস-ডি-ওদের এত খোসামোদ করেছে যে এস-ডি-ও-রাও

তাঁদের খোসামোদ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ভেবেছে আমিও বুঝি সেইরকম।

খোসামোদ জিনিসটা অনেকটা গানের মত। একতরফা ঠিক জমে না। যেমন একহাতে তালি বাজে না। যে গান গায় সে তো গায়ই। গলা ছেড়েই গায়। কিন্তু যারা গান শোনে তারাও গায়। গায় বটে তবে মনে মনে। খোসামোদ যে করে এবং খোসামোদ যে পায় দুজনকেই এক স্তরে উঠতে হবে তবে খেলা জমবে। খোসামোদকারক যখন বলবে—প্রভু আপনি মহৎ, খোসামোদ-প্রাপককে তখন সমান ভণ্ডামির সঙ্গে সেটি হজম করতে হবে। তা না করলে খেতে নুন-কম নুন-কম লাগবে!

মিস্টার রায় কিন্তু সে-জাতের অফিসার নন।

ঘরে ঢুকে বললেন—এবার চলুন, সময় হয়ে গেছে—

এ যেন সেই লালাবাবুর কানে 'বেলা যায়' ডাক। চীফ মিনিস্টারের জীবনে কাব্য করার সময় বড় একটা জোটে না। যদিও আধ্যাত্মিকতা করবার অবসর মাঝে মাঝে মেলে। কোনও-না-কোনও মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান তো সারা বছরই লেগে আছে। সেখানে গিয়ে সেই মহাপুরুষের স্বর্গতঃ আত্মার কল্যাণ কামনা করতে হয়। বড় বড় গালভরা শব্দ দিয়ে জীবনের নশ্বরতা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হয়।

—সমস্ত রেডী স্যার।

জিজ্ঞেস করলাম—লোকজন সবাই হাজির?

শঙ্কর বললে—হাজির কী বলছেন, প্যাণ্ডেলের ভেতরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে বসবার জন্যে। সবাই আপনার লেকচার শোনবার জন্যে অস্থির—

—আর সেই তারা?

মিস্টার রায় বললেন—তারা বোধহয় গণ্ডগোল করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু আমার পুলিসও তৈরি আছে—প্লেন ড্রেসেও কিছু লোক রেখেছি চারদিকে—

মনে আছে আসবার সময় নতুন-মা বললেন—তুমি কিন্তু আমাদের একেবারে ভুলে যেও না বাবা, মাঝে মাঝে এসো—

মাঝে মাঝে শুধু নয়, আমি যে আর সে-বাড়িতে মোটেই আসবো না তা

আমিও যেমন জানতুম, নতুন-মাও তেমনি জানতো। তবু আশা করতে ক্ষতি কী? যে-জিনিস কখনও পাবো না সে-জিনিস চাইতে তো আপত্তি নেই!

আমাকে দর্শন করতে চারিদিকে তখন অনেক লোকের ভিড়। সবাই হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এ বাড়িতে তারা আমাকে দেখতেই এসেছে। যে লোকটি এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মত চলে গেল তিনি যেন উপলক্ষ্য, লক্ষ্য আমিই। আমারই অভ্যর্থনার জন্যে এই সমারোহ, আমারই সম্বর্ধনার জন্যে এই এলাহী আয়োজন। হায় রে, এরই নাম পৃথিবী, এরই নাম সমাজ। এই সমাজ নিয়েই আমরা ঘর করি, এই সমাজের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের এত প্রচেষ্টা! এত ভণ্ডামি আর এই অসভ্যতাই আমরা আবার মন-প্রাণ দিয়ে সহ্য করি!

—অজয় খুব লাজুক ভাই তোমার।

তারপর অজয়ের দিকে চেয়ে নতুন-মা বললেন—অজয় অনার্স নিয়ে এম-এস্-সি পাস করেছে, তা জানো তো? যেখানে চাকরি করছে, সেটা বড় খারাপ জায়গা বাবা, ওর ইচ্ছে—

আমার মনে হলো নতুন-মা'র গালে একটা চড় মারি। মানুষ যত সভ্য হবে ততই কি সে নিজেকে এমনি নিষ্ঠুর ভাবে ঠকাবে? নিজেকে ঠকিয়ে মানুষ এত আনন্দ পায় কেন? তার চেয়ে নতুন-মা যদি আমাকে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিত তাও যেন আমার ভালো লাগতো। কেন, আগেকার মত ব্যবহার করলে কি আমি রেগে যেতুম?

তখন সন্দেশটা নিয়ে ফেলেছি।

নতুন-মা হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন—অ্যাই, সন্দেশ দিয়েছিস, জল দিসনি যে?

আমার মনে হলো নতুন-মা যেন চাকরকে বকছেন না, বকছেন আমাকে। চাকরকে বকে যেন আমাকেই শিক্ষা দিতে চাইছেন। বলছেন—ওগো, তুমি বড় হয়েছ স্বীকার করছি, কিন্তু আমরাও ছোট হইনি, ছোট নইও। এই দেখ বাড়ি। এ বাড়ির আরো অনেক ভ্যালুয়েশন বেড়েছে। বলছেন—যে ডিশটায় তোমায় সন্দেশ খেতে দিলাম, ভালো করে লক্ষ্য করো, ওটা যে-সে ডিশ নয়, রূপোর ডিশ, আর ওই কাচের গ্লাস, ওটা খাঁটি বিলিতি। বেলজিয়ান গ্লাস। আর ওই ফার্নিচার দেখ, দেখ আলমারি, চেয়ার, সোফা-কৌচ। প্রত্যেকটা চীনে ছুতোর মিস্ত্রীর তৈরি। কিন্তু যা দেখতে পাচ্ছো না তা আরো দামী। দু'লাখ টাকার শেয়ার কেনা আছে আমার নামে। তার দাম দশ গুণ বেড়ে

এখন কুড়ি লাখে উঠেছে। তা ছাড়া আমি এখন বিধবা হয়েছি, এখন তো আর দামী জড়োয়া গয়নাগুলো পরতে পারি না। নইলে দেখতে পেতে তারও দাম কয়েক লাখ টাকা। সুতরাং মনে করো না আজ আমি তোমার কাছে নিচু হয়েছি তোমার প্রসাদ-কণা পাবার জন্যে।

—ওরে, পান দে। কই রে তোরা?

আমি পান খাই না। কিন্তু না-ই বা খেলাম। পান দিতে তো দোষ নেই। দু'চারজন চাকর-বাকরের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে আগে পান দেবে।

—আমি তো পান খাই না!

কিন্তু তা কে শোনে? ততক্ষণ চার-পাঁচজন পান নিয়ে এসেছে ডিশে করে। এক-একজনের হাতে এক-এক রকমের ডিশ। কোনওটা তামার, কোনওটা পেতলের, কোনওটা বা কাচের। কোনওটা···

—এই, এ ডিশে করে কে পান দিতে বললে? রূপোর ডিশ কোথায় গেল? একজনকে তো অজয় প্রায় ধাক্কাই দিলে গলায়।

কিন্তু নতুন-মা প্রতিবাদ করে উঠলেন ছেলের কথায়। বললেন—না, এই নাও, চাবি নাও—আমার আলমারিতে সোনার ডিশ আছে তাইতে পান নিয়ে এস—ছি, এটা বড় লজ্জার কথা, কাচের ডিশে পান!

বলে নিজের আঁচলের চাবিটা খুলে অজয়ের হাতে দিলেন। চাবিটা খুলে অজয় ঘরের আলমারিটা খুলতে লাগলো।

আমার সহ্যের সীমা তখন ছাড়িয়ে গিয়েছে। সত্যিই আমি কি শ্রাদ্ধ-বাড়িতে এসেছি না বিয়ে-বাড়িতে এসেছি! আমার সামনে ঐশ্বর্য-প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলেছে। আমাকে জানাবার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে যে আমাদের বাড়ির কর্তার মৃত্যু হলেও এখনও আমরা অনাথ হয়ে যাইনি। এখনও আমাদের সোনা-রূপো টাকাকড়ি গয়না-গাঁটি সব কিছু অটুট আছে আগেকার মত। এখনও আমরা সলভেন্ট!

ত্রৈলোক্যদা বলতেন—তারপর?

তারপর একদিন জেল থেকে ছাড়া পেলুম। জন্মের সময় শিশুর অনুভূতি থাকে কি না জানি না। অনুভূতি থাকলে সেই অন্ধকার থেকে আলোয় এলে কী রকম মনের ভাব হতো তাও বলতে পারি না। কিন্তু জেলখানার

বাইরে বেরিয়ে চারিদিকের আকাশ-পৃথিবীর দিকে চেয়ে আমার মনে হলো আমি যেন আবার পৃথিবীতে নতুন করে জন্ম নিলাম। আমার তো মনে হয় মাঝে মাঝে মানুষের নবজন্ম হওয়া ভালো। একবার জন্ম হলে মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। কিন্তু সূর্য প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করে বলে পৃথিবী এমন করে চির-যৌবন বজায় রাখে। কিন্তু মানুষ সেই যে একদিন জন্মালো তারপরে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত তার আর জন্মান্তর হলো না।

জেলখানার সামনে কেউ আমাকে অভ্যর্থনা করতে আসেনি দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। এই তো ভালো। নতুন করে আমার জীবনযাত্রা শুরু করার মত একেবারে একলা। সেদিনও পৃথিবীতে একলা এসেছিলাম, তারপর বাড়ি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আজ যেন এতদিন জেলখানায় ভ্রূণ অবস্থায় থেকে আবার নতুন করে পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করলাম। এ সেই মাটি যে-মাটির ওপর আমি আর একদিন পা রেখেছিলাম। কোন্ দিকে কোথায় যাবো বুঝতে পারলাম না। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। রাস্তা দিয়ে ট্রাম-বাস চলেছে। অফিসে যাচ্ছে লোকজন। সকলেরই ব্যস্ততা অসীম। আমারই কেবল কোনও কাজ নেই। আমি বেকার।

লোককে জিজ্ঞেস করে করে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে হাজির হলাম।

বৌবাজারের কংগ্রেস অফিসটার দরজা তখন বন্ধ। সামনে গোটাকয়েক তালা ঝুলছে। গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম সেখানে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম উল্টোদিকে।

হঠাৎ রাস্তায় একজনের ডাকে জ্ঞান ফিরে পেলাম—জ্যোতি না?

চিনতে পারলুম। একই জেলখানায় একসঙ্গে ছিলাম বহুদিন।

সে বললে—এখানে কোথায়? কবে ছাড়া পেলে হে?

বললাম—আজই, এখুনি—

—বাড়ি যাওনি?

বললাম—বাড়িতে আর যাবো না—

—তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? তা কোথায় উঠবে তাহলে?

—তাই তো ভাবছি।

—মহেশপুরে যাবে?

—সে কোথায়?

—চলো, সেখানে গান্ধী-আশ্রম করেছি আমরা। চরকা কাটা হয়, তাঁত

বোনা হয়, গোসেবা হয়, চলো—

তা সেই সেখানেই আমার এই কাজে প্রথম হাতেখড়ি। সেখানেই শিখেছিলাম যে মানুষের স্বাধীনতা দরকার। সেখানেই শিখেছিলাম—স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই স্বাধীনতায় যে হস্তক্ষেপ করবে তার সঙ্গেই আমাদের বিরোধ। রুশোর বইতেও পড়েছিলাম যে 'Man is born free but everywhere he is in chains.'

কিন্তু লেনিনের মুখ থেকে অন্য কথা শুনলাম। লেনিন বলেছেন মানুষ স্বাধীনতা চায় না, চায় ক্ষমতা। কথা বলবার ক্ষমতা, সুখে-শান্তিতে বাঁচবার ক্ষমতা, আরো কত ক্ষমতা তার ঠিক নেই। সেই ক্ষমতা, যাকে ইংরেজীতে বলে power, সেই ক্ষমতার লোভ তো সকলেরই ছিল। আমিও তো স্বাধীনতা চাইনি, চেয়েছিলাম শুধু ক্ষমতা। এই ক্ষমতার লড়াই শুধু ব্রিটিশদের সঙ্গেই তো লড়িনি, আমার দেশের লোকের সঙ্গেও লড়েছি। আমার যারা সহকর্মী তাদের সঙ্গেও ক্ষমতার লড়াই লড়েছি। বন্ধুদের সকলের সঙ্গে রেষারেষি করেছি। সকলকে ল্যাং মেরে কী করে নিজে সকলের শীর্ষে ওঠা যায় তার চেষ্টা করেছি। কত অন্যায়, কত অবিচার, কত মিথ্যাচার করেছি লীডার হবার জন্যে। ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে। যে স্বাধীনতা সকলের পাওয়ার কথা তা মুষ্টিমেয় লোকে মিলে ভাগ-বখরা করে নিয়েছি। আর ক্ষমতার কথাই যদি বলা যায় তো সকলের ক্ষমতা হরণ করে কী করে আমি ক্ষমতাবান হবো সেই চেষ্টাই কেবল করেছি। আর সেই চেষ্টায় সফল হয়েছি বলেই আমি আজ চীফ মিনিস্টার।

আমি গাড়িতে উঠলুম।

অজয় তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে আমার পায়ের ধুলো নিলে।

মনে মনে ভাবলুম—নিক। নিক পায়ের ধুলো। আমি তাতে বাধা দেব না। কার্যোদ্ধার করবার যতরকম পদ্ধতি আছে সংসারে তার সবগুলো কাজে লাগাক ও। সংসারে দশজনের মাথায় উঠতে গেলে শুধু পায়ের ধুলো কেন, দরকার হলে জুতোর ধুলো নিতেও যে পেছপাও হয় না সেই-ই তো আজকের যুগের মানদণ্ডে কর্মবীর। ব্যারিস্টার মিস্টার সেনের ছেলে হয়ে যদি ওটা না করতে পারে তাহলে সে কিসের বাপ্‌কা বেটা!

নতুন-মাও গাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার যখন ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে তখন নতুন-মা বলে উঠলো—আবার একদিন এসো বাবা—

ভেবেছিলাম যখন জেলখানায় কাটিয়েছিলাম, তখনকার কথাগুলো লিখে

রাখবো। যেমন করে লোকে ডায়েরি লেখে। তার জন্যে খাতাও যোগাড় করে-
ছিলাম একটা। এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ছে না, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, দু'তন দিন
কিছু লিখেও ছিলাম। এখন কোথায় সে-সব হারিয়ে গেছে তা খেয়াল নেই। অবশ্য
হারিয়ে গেছে ভালোই হয়েছে। কারণ অতখানি পণ্ডশ্রম করার সময় এখন কারই
বা আছে! হয়ত ওই ডায়েরি পরে আত্মজীবনী লেখার সাহায্য করে। কিন্তু
যে আত্মজীবনী লিখবে না? আত্মজীবনী যারা লেখে তাদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন
অহঙ্কার থাকে। রুশোর Confession বইতে গোড়ার প্যারাগ্রাফে যতই বিনয়
প্রকাশ হয়ে থাক্, আসলে তো তা অহঙ্কার। অহঙ্কার মানে আত্মপ্রচার।
নিজের অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Popularity is a crime from the moment it is sought; it is only a virtue where men have it whether they will or no. আমি জনপ্রিয়তা চাইনি বললে ভুল হবে। কিন্তু জনপ্রিয়তা চাইতে গেলে যে বিপুল স্বার্থত্যাগ করতে হয়, তা করতে কি আমি কখনও তৈরী ছিলাম? মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমি নিজেও তো সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত নই। ডায়েরি লিখতে গেলে নিজের গুণাবলীর সঙ্গে নিজের দোষ-ত্রুটির কথাগুলোও তো লিখতে হবে! সেগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা করবার মত সৎ-সাহস কি আমার আছে?

হয়ত তা নেই। নেই বলেই হয়ত আমি জীবনে ডায়েরি লিখিনি কখনও। আর তা ছাড়া নিজের ওপরেও কি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পেরেছি কখনও? যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন—পুরনো কাপড়ে নতুন কাপড়ের তালি লাগালে তা শীগ্রি ছিঁড়ে যায়। আমি হয়ত তাই-ই করেছি। রামকৃষ্ণদেব বলতেন—নতুন হাঁড়িতে দুধ রাখলে তা ঠিক থাকে। কিন্তু দই-পাতা-হাঁড়িতে সে-দুধ রাখলে তা নষ্ট হয়ে যায়। আমার এক এক সময় মনে হয় আমিও যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছি। কিন্তু কাউকে সে নষ্ট হওয়ার কথা বলতে পারি না। কাকে বলবো? কে বুঝবে এই তত্ত্ব? মনে আছে কোনও মীটিং-এ গেলে এখনও ফটোগ্রাফারের দিকে নজর রাখি। যাতে আমার ছবিটা ভালো ওঠে। যখন চীফ মিনিস্টার ছিলাম না লোভটা আরও বেশি ছিল। ভাবতাম কী করলে বা কী বললে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমার নামটা উঠবে। তখন গরম-গরম কথা বলবার লোভ ছিল। সাজ-পোশাকটা আরো সাদাসিধে করবার দিকে ঝোঁক ছিল। এখন চীফ মিনিস্টার হয়েছি, এখন আমার তত দায় নেই, এখন দায় যত ফটোগ্রাফারদের। আমার

ছবি খারাপ উঠলে তাদেরই বদনাম হবে।

মনে আছে পরের দিন খবরের কাগজে ব্যারিস্টার সেনের শ্রাদ্ধের খবর ফলাও করে বেরিয়েছিল। ফলাও করে বেরিয়েছিল কারণ তিনি চীফ মিনিস্টারের বাবা।

অথচ যখন মহেশপুরের আশ্রমে ছিলাম তখন কেউ আমার খবর রাখেনি। খবরের কাগজের রিপোর্টার দূরে থাকুক, আমরা খেতে পেলুম কি পেলুম না তাও কেউ খবর নিত না। নিজেরা নিজের কাপড় কেচেছি কুয়োর জলে। বালতি-বালতি জল টেনে এনে উঠোন, ঘর, রান্নাঘর পরিষ্কার করেছি। তারপর গ্রামের লোক যদি কখনও কোনও তরি-তরকারি দিয়ে গেছে তো আরাম করে খেয়েছি। যেদিন কিছুই জোটেনি সেদিন কিছুই খাইনি।

দেশসেবা তখন ছিল কৃচ্ছ্রসাধন। নিজেরা আদর্শ-চরিত্র হতে পারলে তবে তো অন্যরা আমাদের আদর্শ অনুসরণ করবে। তারপর আমাদের যে গ্রামের লোকেরা সাহায্য করবে সেখানেও অনেক বাধা। পুলিসের সি-আই-ডি আশে-পাশে পাহারা দিত দিনরাত। খোঁজ-খবর নিত কে কে আমাদের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু আসলে তো আমরা অহিংস। আমাদের খুঁত কে পাবে!

তবু কী জানি কেন, একদিন পুলিস এসে আমাদের আশ্রমে তালা লাগিয়ে দিলে। আমরা হয়ে গেলাম 'ডেটিনিউ'।

অপরাধ? অপরাধ আমরা রাত্রে নাইট-স্কুল করি। গ্রামের নিরক্ষর লোকদের পড়াই। পড়াই মানে আমরা তাদের মনে স্বদেশী-মন্ত্র ঢুকিয়ে দিই। এ অভিযোগ আদালতে গেলে হয়ত টিঁকতো না। কিন্তু আদালতে পাঠাবার মত নির্বোধ নয় ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট। ব্রিটিশের নিজের তৈরি আদালতকেও ব্রিটিশরা বিশ্বাস করতো না বলেই ব্রিটিশ এম্পায়ার অতদিন টিঁকেছিল।

সেই কথাই মনে হয় এই শঙ্করকে দেখে।

সকালবেলাই শঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তুমি কখনও জেল-টেল খেটেছ শঙ্কর?

শঙ্কর এই প্রশ্নে প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল—জেল কেন খাটতে যাবো জ্যোতিদা?

আমি বলেছিলাম—তাও তো বটে! তুমি তো সে-সময়ে জন্মাওনি!

শঙ্কর বলেছিল—জেল খাটা থাকলে কিন্তু ভালো হতো স্যার—

—কেন?

—জেল খাটলে মণ্ডল-কংগ্রেসে একটা যা'হোক উঁচু পোস্ট পেতাম। এখনও তো শুধু অর্ডিনারি মেম্বার হয়ে আছি এখানে। কিন্তু যারা তখন জেল খেটেছিল তারা সব কেউ ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি হয়ে গেছে। আমি কতদিন ধরে কাজ করছি তবু এখনও আমার প্রমোশন হলো না। এবার আপনি এসেছেন, আপনি যদি একটু বলে ছান—

সেই এক কথা। চাকরি আর প্রমোশন। অথচ তা না থাকলে এরাই বা এতদিন কোন্ আশায় কাজ করছে! থালি পেটে দেশসেবা করবার দিন তো শেষ হয়ে গেছে।

—জানেন জ্যোতিদা, আমার দাদারা সব খুব লেখাপড়া-জানা লোক। তারা বড় বড় চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। একজন দিল্লীতে থাকে আর একজন বোম্বাই। তারা বাবা-মাকে টাকা পাঠায় তাই আমাদের চলে। আর আমি তো ভ্যাগাবণ্ড! আমি কংগ্রেসের কাজ করি বলে আমাকে দাদারাও বলে ভ্যাগাবণ্ড—

আমি আবার ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম শঙ্করের দিকে।

শঙ্কর আবার বলেছিল—আপনি একটা কিছু করে দিন আমায় জ্যোতিদা, নইলে বাবা-মা'র সামনে আমি আর মুখ দেখাতে পারছি না। বাবা-মা বলে—কংগ্রেসের কাজ করে কত লোকের কত হিল্লে হয়ে গেল, আর তুই একটা ভ্যাগাবণ্ডই রয়ে গেলি—

মনে আছে শঙ্করের কথা শুনে তখন আমার নিজের কথাও মনে পড়েছিল। আমিও তো শঙ্করের মতই একদিন আত্মীয়-স্বজন বাবা-মা সকলের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর এ দশা হলো কেন, আর আমারই বা দশা এমন কেন হলো? তবে কি বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্ন আইন? যে আইনে আমি হয়েছি এ-এদেশের চীফ মিনিস্টার, সেই আইনেই আবার শঙ্কর চিরকাল এমন ভলান্টিয়ার হয়ে আছে কেন? আসলে শঙ্কর কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার কিন্তু তার মন যে রয়েছে চাকরির দিকে। সেই রামকৃষ্ণের কথায় আছে—শুয়োরের মাংস খেয়েও যদি ঈশ্বরে মন থাকে তো সে ধন্য, আর হবিষ্যি করে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে তো তাহলে সে ধিক্!

আমি জানি ধর্মের কথা আজ কেউ শোনে না। ধর্মের কথা আজ বাতিল হতে চলেছে। কিন্তু ধর্ম আর সত্য কি আলাদা? সত্যকে বাদ দিয়ে কি কখনও কোন কিছুই চলেছে? নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণই তো হলো অধর্ম

আর অসত্য। ফ্রান্সের মানুষ তখন সৎ-অসৎ যে কোনও উপায়েই শুধু রাজপ্রসাদ পেতে চেয়েছে। তাই অন্যেই তো তা টিঁকলো না। রোম-সাম্রাজ্যের পতনের সময় রোমানরা যে পশু হয়ে গিয়েছিল তা তো গিবন সাহেবের বইতেই লেখা আছে। ছেলে-মা, বাপ-মেয়ের সঙ্গে অবৈধ অনাচার চলেছে। মোগল সাম্রাজ্যের যে পতন হবে তা তো সেদিনই জানা গিয়েছিল যেদিন ছেলে বাপকে বন্দী করে রাখলো। বাদশা সাজাহানের অত মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করার গুণোগার দিতে হলো শেষ সম্রাট বাহাদুর শা'কে আর বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে। অধর্ম যদি বাদই দাও তো সত্যটাকে অন্ততঃ মানো। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীটা ঘুরছে এটা ধর্ম বলে না-ই-বা মানলে, বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মানবে তো! সেই সূর্য যদি হঠাৎ একদিন পূর্বদিকের আকাশে না ওঠে তো পৃথিবী চলবে?

—তাহলে আর দেরি করছেন কেন স্যার? উঠুন!

—হ্যাঁ, উঠি।

সূর্যও প্রতিদিন ভোররাত্রে এমনি করে বলে—হ্যাঁ উঠি। আর সে ওঠে বলেই পৃথিবী প্রতিদিন নতুন করে জন্মায়। কিন্তু আমি উঠলে যদি বাংলা দেশের নবজন্ম হতো! আমি জানি আমি উঠলেও যা হবে, এমনি করে বসে থাকলেও তাই হবে। কারণ আমি তো সূর্য নই। সূর্যের মত শাশ্বত শক্তি যদি আবার কোনও দিন এখানে জন্মায় তো সেদিন তার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশ আবার নতুন করে জন্মাতো! যেমন করে সম্ভব করেছিল রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ···

—নিচেয় গাড়ি আছে, চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িতে বসলাম। অনেক লোক জমে ছিল আমাকে দেখবার জন্যে। আমি যে এক দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছি এ-কথা ভাবতেও লজ্জা হলো। যেদিন থেকে চীফ মিনিস্টার হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমার এ-জন্যে লজ্জা হয়। লজ্জা হয় নিজের তুচ্ছতার কথা ভেবে। আসলে ওরা তো জ্যোতির্ময় সেনকে দেখে না, দেখে ওয়েস্ট-বেঙ্গলের চীফ মিনিস্টারকে। গ্রামের জমিদারকে সবাই ঘাড় ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে। তা করে কারণ জমিদার তাদের গ্রামের জমিদার বলে। তারপর যখন জমিদার মারা যাওয়ার পর তার ছেলে জমিদার হয় তাকেও সবাই ঘাড় ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে। সে জমিদার যদি লম্পট, মাতাল, ডাকাত, গুণ্ডা হয়, তাহলেও ঘাড় ঝুঁকিয়ে প্রণাম করবে। জমিদারের

জমিদারিটাই সমস্ত ভক্তির উৎস, আমার রাইটার্স বিলডিংএর চেয়ারটাই এই ভক্তির উৎস। কিন্তু ওরা জানে না আমি ওতে লজ্জা পাই, আমি ওতে বিরক্ত হই, আমি ওটা ঘেন্না করি।

এস-ডি-ও মিস্টার রায় গাড়িতে যেতে যেতে বলতে লাগলেন—এই রাস্তাটা ডিসট্রিক্ট-বোর্ড থেকে করানো হয়েছে এবার—আগে ময়নাডাঙায় কিছুই ছিল না, এখন তবু একটা জুনিয়ার হাই-স্কুল হয়েছে, আর একটা টু-বেড্ হস-পিট্যাল্ও হয়েছে। এখন আর গ্রামের লোকদের কোনও কষ্ট নেই—

—কষ্ট নেই ?

—না, কোনও কষ্ট নেই।

বললাম—মানুষের কষ্ট আপনি দূর করতে পারেন মিস্টার রায় ? রাজা অশোকও তো তা পারেননি ?

—সে-কষ্টের কথা বলছি না। এডুকেশন, জল-সরবরাহ, হসপিট্যাল্ সবই হয়েছে।

—খাওয়ার কষ্ট ?

এস-ডি-ও বললেন—না স্যার, খাওয়ার কষ্ট বলে কোনও কিছু আর নেই। কন্ট্রোলে রেশন দেওয়া হচ্ছে, এরা এখন হ্যাপি—

—কিন্তু জমি ?

এস-ডি-ও বললেন—জমি তো আপনাদের হাতে স্যার। ও আমার হাতে নেই। ইয়ার বিফোর লাস্ট চল্লিশটা মার্ডার হয়েছিল জমি-জমা নিয়ে, লাস্ট ইয়ারে কিছু হয়নি। আর এবার একটাও হতে দিইনি।

—আচ্ছা, দক্ষিণপাড়ায় হালদার বলে কোনও ফ্যামিলি আছে আপনি জানেন ?

—হালদার ?

মিস্টার রায় একটু ভাবতে লাগলেন। বললেন—আমি খবর নিতে পারি আপনি যদি বলেন। আর কী খবর নেব বলুন ? তারা কি ওখানকার জোতদার ? তাদের এক ছেলে ডাক্তার হয়েছে ?

বললাম—না না, ওসব কিছুই নয়।

—দক্ষিণপাড়ায় হালদার বলে আর একটা ফ্যামিলি আছে, তারা হলো ওখানকার আদি বাসিন্দা—

—আদি বাসিন্দা মানে ?

—মানে এককালে থাকতো ওখানে। কিন্তু এখন বাড়িটা ভেঙে পড়ে গেছে। এখন কেউ নেই এখানে, সবাই কলকাতায় থাকে।

আমি আর ও-নিয়ে কোনও কথা বললাম না। বড়লোক ছাড়া যে আর কারো সন্ধান আমি করতে পারি তা মিস্টার রায় কল্পনাও করতে পারেন না। আমি আবার বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে পুরোনো জায়গাটা আবার নতুন করে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই ছোটবেলাকার ছোট পুরোনো জায়গাটাই যেন আবার আমার কাছে বড় নতুন ঠেকতে লাগলো। সেই স্টেশনটাই বা কোথায় গেল? সেই গাছটা, যে-গাছের তলায় আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? যেখানে গরুর গাড়ি চালাতে চালাতে নুটু এসে প্রথম আমায় ঘুমোতে দেখে গাড়িতে তুলে নিলে? যেখানে প্রথম সেই বৈকুণ্ঠকে দেখলাম আমি? আর কোথায় সেই ইটখোলাটা, যেখানে নুটু মজুর খাটতো? আর কোথায়ই বা সেই বাজারটা? সেই যে কেদার কয়াল, যে নুটুকে কাজ দিয়ে খেপ-পিছু কমিশন আদায় করতো? আস্তে আস্তে আমার সব মনে পড়তে লাগলো। বাজারের কশাইয়ের কথাটাও মনে পড়লো। মনে পড়লো আমার সেই অসুখে পড়ে থাকা। দিগম্বর হালদার বোধহয় এখন আর বেঁচে নেই। নুটুর মাও নিশ্চয়ই মারা গেছে। আমারই তো কত বয়েস হয়ে গেল! আর নুটু?

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা ময়নাডাঙা স্টেশনটা কোনদিকে, দেখতে পাচ্ছি না তো?

মিস্টার রায় বললেন—সেটা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি স্যার। কেন, সেদিকে যাবেন নাকি আপনি?

বললাম—স্টেশন থেকে গ্রামে আসবার পথে খুব বড় বড় গাছ ছিল, সেগুলো এখনও আছে নাকি?

—হ্যাঁ, এখনও আছে। তবে আগে কী রকম ছিল তা তো আমি জানি না। আমি তো লাস্ট তিন বছর হলো এখানে পোস্টেড—

শঙ্কর সামনের সীটে বসে ছিল। সে পেছন ফিরে বললে—হ্যাঁ স্যার, এখনও আছে, তবে ছোটবেলায় যত গাছ দেখেছি তত নেই, পিচের রাস্তা হবার পর থেকে এক-একটা গাছ মরে যাচ্ছে—

মিস্টার রায় হঠাৎ বললেন—আপনি আগে এসেছিলেন নাকি স্যার এখানে?

আমি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললাম—এখানে একটা বাজার ছিল না?

—বাজার এখানে স্যার ছুটো। একটা হাট আছে। উইকে একদিন হাট বসে। আর একটা নতুন বাজার হয়েছে, সেখানে রোজ বাজার বসে।

—সেখানে মাংসর দোকান আছে?

—হ্যাঁ, মাংসর দোকান না থাকলে চলে স্যার? ডিসট্রিক্ট-বোর্ড থেকে হেলথ-ইনস্পেক্টর রোজ এসে মাংস চেকিং করে যায়, তবে বিক্রির পারমিশন পায়—

আমার মনে হতে লাগলো এগ্রিকালচারাল কন্‌ফারেন্সে না গিয়ে এই ময়নাডাঙায় রাস্তায় রাস্তায় আবার ঘুরি। আবার গিয়ে দেখি সেই খড়ের আড়তটা ঠিক সেখানে আছে কিনা। সেই কশাইটার দোকানটাই বা কেমন আছে! কলিমুদ্দিন মিয়া যদি না-ই বেঁচে থাকে তো অন্য কেউ আছে নিশ্চয়। তার ছেলে কিংবা নাতি। এখনও কত বৈকুণ্ঠকে কেটে তারা হয়ত খদ্দেরকে বিক্রি করছে, কে জানে!

আর সেই বিষ্টু সামন্তর ইট-খোলা! বিরাট ইটের পাঁজা ছিল যেখানে! সেইখানেও হুটু মজুর খাটতো। আনা চারেক রোজ পেত সে। তাই দিয়ে হুটুদের পেট চলতো।

চারদিকে খোলা মাঠ আর মাঝে মাঝে কয়েকটা বাড়ি। এ বাড়িগুলো তখন ছিল না। সব জায়গাই ছিল মাঠ। মাঠ আর পোড়ো জমি। আমার মনে হতে লাগলো এই রাইটার্স-বিলডিং, এই কংগ্রেস, এই সভা-মীটিং, এই খবরের কাগজ, এই প্রচার পাবলিসিটি, সব কিছু ছেড়ে যদি একবার আবার সেই অতীত যুগে ফিরে যাওয়া যেত যখন কেউ আমাকে চিনতো না, কেউ আমাকে সেলাম করতো না, কেউ আমার নামও জানতো না! আর কি সেইখানে ফিরে যাওয়া যায় না? হঠাৎ যেন বড় কষ্ট হতে লাগলো আমার। যেন বুকটা ব্যথা করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো—সেই-ই ভালো ছিল, সেই হুটু আর বৈকুণ্ঠর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। সেই রোদে পোড়া আর পেট ভরে না-খেতে পাওয়া। Byron-এর সেই লাইনটা মনে পড়তে লাগলো: The best of prophets of the future is past. সেদিনকার সেই ছোট ছেলেটা আজকের এই চীফ মিনিস্টারের চেয়ে যেন বেশি ভাগ্যবান। সে স্বাধীন ছিল, আজকের চীফ মিনিস্টার তার যা-খুশি করতে পারে না। হঠাৎ রাইটার্স-বিলডিং ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না। সে বড় পরাধীন।

আমার মনে হতে লাগলো হয়ত ডায়েরি লেখার নিয়মটা ভালো। ডায়েরি পড়তে পড়তে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ সেই অতীতে ফিরে যেতে পারতাম।

এখন আর তার উপায় নেই। আমি আজ হারিয়ে গিয়েছি। বর্তমান আর ভবিষ্যতের গোলকধাঁধায় নিরুদ্দেশ হয়ে আমি এখন পায়ের তলায় মাটি খুঁজতে চাইছি। লোকে আমাকে যত ভাগ্যবানই ভাবুক, আমি নিঃসহায় নিরবলম্ব নিঃশেষ।

মিস্টার রায়ের কথা আমার হঠাৎ কানে ঢুকলো—ওই দেখুন স্যার, ওই যে আমাদের প্যাণ্ডেল।

—কত খরচ পড়েছে প্যাণ্ডেলটা তৈরী করতে ?

—দেড় লক্ষ টাকার মতন।

হঠাৎ গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। একটা গ্রামের চাষাভুষো লোক চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

মিস্টার রায় চাপা গলায় কী যেন একটা গালাগালি দিয়ে উঠলেন—বললেন —বেটার খুব ভাগ্য ভাল, বেঁচে গেছে—

আমি বললাম—শুধু ওর নয়, আমাদের ভাগ্যও ভালো—

বললাম বটে কিন্তু আমার মনে হলো ভাগ্য আমাদের ভালো নয় মোটেই। শুধু চাষাটা নয়, আমরা সবাই-ই যেন গাড়ির চাকার তলায় আজ চাপা পড়ে গিয়েছি। আমি, মিস্টার রায়, শঙ্কর, সবাই। দেড় লক্ষ টাকার গাড়ির চাকার তলায় আমরা সবাই চাপা পড়ে গিয়েছি।

গাড়িটা আবার চলতে লাগলো।

এমন জায়গায় আমায় রাখা হয়েছিল যেখান থেকে প্যাণ্ডেলটা খুব কাছেই। এককালে জায়গাটা একটা পোড়ো মাঠ ছিল। সেখানে কাজ-কর্ম কিছু হতো না। চাষ-আবাদ দূরের কথা, চাষ-আবাদ করবার লোকই ছিল না ময়নাডাঙায়। আর গরু-ছাগল চরবার জায়গাও তো থাকা চাই গ্রামে! গরু-ছাগল আগে খেতে পেলে তবে তো মানুষরা খেতে পাবে। আজকাল ময়নাডাঙায় প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের ক্ষেত-খামারটুকু বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। কেউ কারো এলাকায় পা দিতে দেবে না। তার মানে এ আমার নিজের সম্পত্তি। এখানে অন্য কারো এক্তিয়ার নেই।

মিস্টার রায়ের কাছ থেকেই ঘটনাটা শুনছিলাম। শুনছিলাম আর ভাব-

ছিলাম, শুধু ময়নাডাঙা কেন, সারা পৃথিবীতেই তো তাই হচ্ছে। কেউ কাউকেই নিজের এলাকায় পা দিতে দিচ্ছি না। আমরা কেউ কাউকেই সহ্য করতে পারছি না। সবাই আমাদের পর। অন্যকে আমরা পর করে রেখেছি বলে আমাদের সবাই পর করে দিচ্ছে।

মিস্টার রায় বললেন—এমন জায়গা কোথায়ও নেই যেখানে গরুগুলো বেড়াবে। বাড়িতেও তাদের খেতে দিই না, মাঠেও তাদের চরতে দিই না—

আমি বললাম—তাহলে এই প্যাণ্ডেলের জমিটা কোথায় পেলেন?

মিস্টার রায় বললেন—এর পেছনে অনেক মতলব বার করতে হয়েছে স্যার। জমির মালিক একজন জোতদার, তাকে দু'লাখ টাকার একটা কাজের কন্‌ট্রাক্ট দিলাম—

—কী কাজ?

—রোড্ রিপেয়ারিং। রাস্তাগুলো এখানকার খারাপ হয়ে গেছে, তা সারাতে হবে। অন্য আরো ঠিকেদার আছে। একে দিলাম দু'লাখ টাকার কন্‌ট্রাক্ট। তার বদলে তিন দিনের জন্যে জমিটা আমাদের ব্যবহার করতে দিলে।

আমি মনে মনে হিসেব করে দেখলাম—তাতে লোকটার অন্তত: এক লাখ দশ হাজার টাকা লাভ থাকবে।

—লোকটা ওখানে ছোলা বুনেছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। তার একটা তো দাম আছে।

ভাবলাম—তা আছে। তিন বিঘেতে অন্তত: কম করেও দশ মণ ছোলা হতো। সেই দশ মণ ছোলার চেয়েও এই আমাদের এগ্রিকালচারাল কন্‌ফারেন্সের মূল্য বেশি। দশ মণ ছোলা দিয়ে আর কত মানুষের ক্ষিদে মেটানো যেত! তার চেয়ে এই কন্‌ফারেন্সের প্রচারে আমাদের পার্টির অনেক লাভ হবে। এতে যত টাকা ছড়ানো হবে, তত আমাদের প্রচার হবে। আর এ যুগে প্রচারই তো সব! কাজের গুণাগুণ বিচারের দরকার নেই, শুধু প্রচার চাই। এ যুগে প্রচারের জোরে মেয়েমানুষকেও পুরুষমানুষ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

গাড়িটা আর কিছুদূর যেতেই প্যাণ্ডেলের সামনে ভিড় দেখা গেল। ময়নাডাঙার চাষীরা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কখন চীফ মিনিস্টার আসবে দেখবার জন্যে। দূর থেকে দেখলাম একটা উঁচু তোরণ তৈরী হয়েছে। তোরণের ওপরে বড় বড় অক্ষরে লাল শালুর ওপর লেখা রয়েছে 'স্বাগতম্'।

হয়ত আমি গিয়ে পৌঁছলেই আমাকে মঞ্চের ওপর নিয়ে যাবে। যেমন সব

জায়গাতেই হয়। মঞ্চের ওপর গিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে একদল ছোট ছোট মেয়ে অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাইবে। বেশির ভাগ সময়েই তা বেসুরো লাগে। কিন্তু আন্তরিকতা যেখানে থাকে সেখানে সুর না থাকলেই বা কী ক্ষতি! তাই যখন যেখানে গেছি গানের সুর নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। মানুষের মনুষ্যত্ব যদি থাকে তো সে কী পোশাক পরেছে তা জেনে আমার কীসের লাভ!

আরো দেখলাম শুধু মানুষই নয়, পুলিসও দাঁড়িয়ে রয়েছে সার সার।

আমি বিরক্ত হলাম—অত পুলিস দিয়েছেন কেন?

মিস্টার রায় বললেন—আমি এস-পির সঙ্গে ওই নিয়ে আলোচনা করেছিলুম, আমি বলেছিলুম যে আপনি পুলিস প্রোটেকশন চান না। কিন্তু এস-পি রাজী হলেন না। বললেন—সে রিস্ক আমি নিতে পারবো না—

বললাম—রিস্কটা কীসের?

কথাটা আমি জিজ্ঞেস করলুম বটে, কিন্তু আমি তো জানি এস-ডি-ও'র কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি! আজ এতদিন ধরে আমি চীফ মিনিস্টার হয়ে আছি, এত বছর ধরে তো আমরা সকলকে কেবল স্তোকবাক্যই শুনিয়ে এসেছি। আর শুধু আমি কেন? আমার মত পৃথিবীর যত পলিটিসিয়ান সবাই মানুষকে কেবল মিথ্যে কথাই শুনিয়েছি। আর যারা বিদ্বান বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ, তারা পলিটিকস্ থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গিয়েছে। কোনও ভদ্রলোক, যাদের এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞানও অবশিষ্ট আছে তারা আজ আর পলিটিক্সের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। সাধারণ মানুষ যেমন তেমনি বুদ্ধিজীবী, কেউই আর আমাদের সঙ্গে নেই আজ। এ কেন হলো? কারণ আমরাই তাদের কাছে টানিনি। আমাদের নির্লজ্জতা, আমাদের ভণ্ডামি, আমাদের অসাধুতা দেখে তারাও আমাদের কাছে ঘেঁষেনি।

আজ এতদিন পরে তারা আমাদের স্বরূপ ধরে ফেলেছে। তারা বুঝেছে আমরা এতদিন শুধু ভাঁওতা দিয়ে ভোট আদায় করেছি। এখন আজ যদি তারা আমাদের মারতে আসে তো আমরা পুলিস না ডেকে করবো কী? পুলিস ছাড়া আমাদের বাঁচাবে কে?

—একটা কথা ছিল মিস্টার রায়।

—কী, বলুন?

মিস্টার রায় যেন আমার কাজ করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবেন এমনি ভাবে আমার দিকে চাইলেন।

মিস্টার রায়ের চাওয়া দেখে আমার খারাপ লাগলো। কেউ আমার হুকুম পালন করুক এ আমি কখনও চাইনি। কিন্তু আমি চীফ মিনিস্টার, আমার অনুরোধও তো হুকুম। এর জন্যে আমি দায়ী নই, এ আমার চেয়ারের দোষ। আমার চেয়ার যদি দোষ করে তো আমি কী করতে পারি? আমরা মুখে বলি আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। জনগণের প্রতিনিধি বলেই আমরা সকলের কাছে ভোট চাই, কিন্তু যখন চেয়ারে বসি তখন জনতা থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, এর জন্যে খানিকটা দায়ী এই মিস্টার রায়েরা। এই গভর্মেণ্ট অফিসের অফিসাররা। এরাই জনগণের প্রতিনিধিদের সরকারের প্রতিনিধি করে তোলে। এদের খোসামোদের আওতায় পড়ে আমাদের মতিচ্ছন্ন হয়। এরাই প্রতিদিন আমাদের সেলাম দিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে দেয় যে আমরা মিনিস্টার নই, আমরা দেশসেবক। আর দেশসেবক চেয়ারে বসে যেই মিনিস্টার হয়ে যায় তখনই বাধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিনিস্টারদের বিরোধ।

বললাম—হুটু বলে একজন লোক আছে এখানে জানেন?

—এখানে? এই ময়নাডাঙায়?

—হ্যাঁ। তার আসল নাম নটবর হালদার। তার বাবার নাম ছিল দিগম্বর হালদার। দক্ষিণপাড়ার লোক। তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

শঙ্কর বলে উঠলো—আমি ডেকে আনতে পারি স্যার—

বললাম—না, তুমি না, মিস্টার রায়ই ডেকে আনবেন—

মিস্টার রায় বললেন—আমি স্যার এখ্খুনি এস-পি'কে বলছি, এস-পি প্যাণ্ডেলেই আছেন—

বললাম—এস-পি'কে বললে এস-পি ডি-এস-পি'কে বলবেন, ডি-এস-পি আবার ও-সি'কে বলবেন, ও-সি বলবেন তাঁর কনস্টেবলকে, কনস্টেবল আবার বলবে চৌকিদারকে। আপনাদের তো এই সিস্টেমেই কাজ হয়!

—তাহলে আপনি যদি বলেন আমি নিজেই যেতে পারি—

বললাম—না, তার দরকার নেই, আপনি আপনার পিওনকে দিয়ে ডাকলেই হবে। বলবেন আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—প্যাণ্ডেলেই আনবো?

বললাম—হ্যাঁ, পারলে ডায়াসের ওপরেই তাকে তুলে আনবেন।

—সে কি চাষী?

—ঠিক চাষী নয়। ল্যাণ্ডলেস লেবার। আসলে তার চাষ করবার জমিই

নেই নিজের—

মিস্টার রায় বোধ হয় আমার কথা শুনে কিছু অবাক হয়ে গেলেন। কেষ্ট নয়, বিষ্টু নয়, সামান্য ল্যাণ্ডলেস লেবারের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই কেন তা তাঁর মত ক্লাস ওয়ান অফিসারের মাথায় ঢুকলো না।

গাড়িটা তখন একেবারে তোরণের তলা দিয়ে প্যাণ্ডেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠলো—বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্—

'বন্দে মাতরম্' শুনে আমার কেমন হাসি পেল। আজকাল যে-স্লোগান কেউই বলে না, কেউ উচ্চারণও করে না, যে-স্লোগান দিয়ে আমরা এককালে জেলে গিয়েছি, এত বছর পরে সেই স্লোগানটাই যেন আমার কাছে নতুন লাগলো—

মিস্টার রায় আগে নামলেন। তারপরে শঙ্কর।

আর আমি পেছনে। সকলে শ্রদ্ধা মেশানো অবাক্ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। যেন আমি অন্য জগতের লোক। যেন আমাকে শ্রদ্ধা করা চলে, ভয় করা চলে। কিন্তু ভালবাসা? আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তাদের দৃষ্টির মধ্যে ভালবাসার নাম-গন্ধও নেই—

আর কেনই বা ভালবাসবে তারা আমাকে? আমার চেয়ারের জন্যে ভালবাসবে? আমি যে চেয়ার পেয়েছি তার বদলে আমি তাদের জন্যে কী করেছি? আমার জেলখাটা কি আমার ত্যাগ? যখন স্বদেশী-আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছি তখন নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করিনি কি? যাতে আমাকে সবাই লীডার বলে মানে তার জন্যে মিছিলের সামনে এগিয়ে গিয়ে পুলিসের লাঠি খেয়েছি। তারপরে ভলাণ্টিয়ারদের কী কাজ দেব তার জন্যে মাথায় বুদ্ধি খাটাতে কত রাত কাবার হয়ে গিয়েছে। তারা অনবরত কাজ চাইতো। কাজ যতক্ষণ দিতে পারবো ততক্ষণ আমি লীডার। যখন কোনও কাজ দিতে পারিনি তখন মনে হয়েছে আমার লীডারশিপ গেল। আলাদীনের গল্পের সেই দৈত্যের মত অবস্থা তাদের। শেষকালে যখন মাথায় কোনও বুদ্ধি গজাচ্ছে না তখন মনে আছে কলেজ-স্কোয়ারে গিয়ে আমি নিষিদ্ধ বই 'দেশের ডাক' পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ বই পড়ার জন্যে পুলিস আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছে। আমি বেঁচে গেছি।

তাই তো বলি জেলে যাওয়া কি ত্যাগ ?

জেলের ভেতরে তুমি কাজ না করেও লীডার। লীডার বটে কিন্তু কোনও দায়িত্ব নেই তোমার। ক্যাডাররা তোমার কাছে কাজ চেয়ে তোমাকে বিব্রত করবে না। শুধু খাবে দাবে আর ঘুমোবে। আর তুমি যখন লীডার তখন জেলখানায় তোমাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী বলে গণ্য করা হবে। তোমাকে শোবার জন্যে খাট-বিছানা-মশারি দেওয়া হবে, খবরের কাগজ দেওয়া হবে। আর দেওয়া হবে প্রথম শ্রেণীর খাওয়া। সেখানে আরাম করে কয়েক মাস কাটাও। তোমার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে। অথচ যখন তুমি জেল থেকে বেরোবে তখন তোমার জন্যে বাইরে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার ভক্তরা। তারা তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাবে ময়দানে। সেখানে তোমার লেকচার শুনে ভক্তরা হাততালি দেবে। তুমি শহীদ হয়ে গেলে। তোমার ছবি বেরোবে খবরের কাগজে।

এই তো তোমার কেরীয়ার। যারা ডাক্তার হয়েছে তাদের পয়সা খরচ করে ডাক্তারী পড়তে হয়েছে পাঁচ-ছ' বছর। পরীক্ষা দিতে হয়েছে। যারা ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে তাদেরও পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয়েছে। কিন্তু তোমাকে কিছুই করতে হয়নি। শুধু লেকচার দিয়েছ আর জেল খেটেছ। তোমার কোয়ালিফিকেশন মাত্র এই যে তুমি শুধু জেল-ফেরত! সেকালের বিলেত-ফেরতের চেয়ে তোমার খাতির বেশি! কেন ?

কিন্তু আজ!

আজ তোমার বিদ্যে ধরা পড়ে গেছে। সবাই জেনে গেছে যে তুমি ধাপ্পা-বাজ। তোমার ধাপ্পাবাজি আজ সবাই ধরে ফেলেছে বলেই আজ তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে পুলিসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু এই চেয়ার পাবার আগে তো তোমাকে এমন করে বডিগার্ড দিয়ে আত্মরক্ষা করতো হতো না ?

আজ জ্যোতির্ময় সেন নিজের দেশের লোকের কাছেই যেন পর হয়ে গেলেন। এত খাতিরের পাশাপাশি আবার এত অপমান।

সমস্ত সভাময় তখন একটা থমথমে ভাব। ময়নাডাঙা গ্রামে এই প্রথম কৃষিজীবীদের কন্‌ফারেন্স হচ্ছে। এতেই ধন্য হয়ে গেছে তারা। সারাদিন মাঠে মাঠে যারা সারা বছর খেটে বেড়ায় তারা আজকে মাঠের কাজ ছেড়ে সভায় এসে হাজির হয়েছে।

কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউই আসেনি। কেন আসেনি তার আসল কারণটা

জ্যোতির্ময় সেন জানেন। তিনি নিজেও একদিন পার্টির কাজ করেছেন। চাষীরা বড় নিরীহ প্রাণী। তারা নিজের ক্ষেত-খামার ছাড়া আর কিছু জানে না। তাদের ডেকে আনতে হয়। তাদের প্রলোভন দেখাতে হয়। বলতে হয় সভায় এলে তাদের ভালো হবে।

এই যে আজ এখানে সভা হচ্ছে এর জন্যে শঙ্কররা এতদিন ধরে প্রচার করে এসেছে গ্রামে গ্রামে। পার্টির ফাণ্ড থেকে কত হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে এর জন্যে। কত হাজার লিটার পেট্রল পুড়েছে জীপের পেছনে। শঙ্কররা জীপে চড়ে কত তেল পুড়িয়েছে তার হয়ত কোনও হিসেবই নেই পার্টির খাতায়। কিন্তু লোক তো এসেছে!

জ্যোতির্ময় সেনের হাসি পেতে লাগলো। কী বিরাট অপচয়, কী বিরাট ধাপ্পাবাজি। অথচ নাকি রাজনীতিতে এরও প্রয়োজন আছে! এই আড়ম্বর, এই অপব্যয় আর এই জাঁকজমক। চিরকাল তো এই রকমই চলে এসেছে। এমনি করেই তো আমরা ক্ষমতায় এসে উঠেছি। কিন্তু কার কী লাভ হয়েছে এতে? লাভ যদি হয়েই থাকে কারো তা হয়েছে আমার আর আমার মত আরো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের। আর লাভ হবে এই শঙ্করদের। লাভ হবে বলেই এত উৎসাহ তার আজ।

শঙ্কর আমার আশেপাশেই রয়েছে সব সময়। শঙ্কর জানে আমার কৃপাদৃষ্টির ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওর দাদা ওর মা-বাবাকে কিছু টাকা পাঠায় না। শঙ্কর পার্টির কাজে যা কিছু পায় তাই দিয়েই ওদের সংসার চলে।

শঙ্কর ঠিকই বলেছে—কংগ্রেসের কাজ করে এত লোক এত কিছু হাঁসিল করে ফেললে, আর তুই একটা অপদার্থ হয়ে রইলি!

এই কন্‌ফারেন্সটা হয়ে যাবার পরই হয়ত শঙ্কর একদিন রাইটার্স বিলডিং-এ গিয়ে হাজির হবে। শুধু শঙ্কর কেন? এখানকার মণ্ডল-কংগ্রেসের কর্তা ব্যক্তিরা সবাই আসবে। কাউকে অসন্তুষ্ট করলে চলবে না। সকলকে পারমিট কিম্বা লাইসেন্স দিয়ে নিজের গদি বজায় রাখতে হবে। নইলে সামনেই ভোট আসছে। ভোটের আগে তো এখানে এসেই আমাকে আবার মিটিং করতে হবে। তখন?

আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম। কোথায়? হুটু কোথায়? হুটুও আমার মত বুড়ো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সেও হয়ত এখন আমার দিকে চেয়ে দেখছে। সে শুনেছে নিশ্চয়ই যে আজ আমি এখানে এসেছি। কিন্তু কে তাকে

আমার কাছে আসতে দেবে? চারদিকে প্লেন-ড্রেস-পরা পুলিস সাজানো আছে। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে চারদিকে। কেউ বোমা না ফেলে। কেউ ইলেকট্রিকের তার না কেটে দেয়।

আশ্চর্য! জ্যোতির্ময় সেন সেই হাজার হাজার লোকের ভিড়ের মাথায় বসে নিজের তুচ্ছতায় নিজেই সংকুচিত হয়ে গেলেন। ওরা জানেও না যে যার জন্যে ওরা আজকে সসম্ভ্রমে সভায় এসে জড়ো হয়েছে সে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করছে। এও এক এ্যানোমেলি। এও এক পরিহাস।

এখানে বসে বসেই তাঁর মনে পড়তে লাগলো সব কথা। সেই রাইটার্স বিলডিং-এর ঘরখানার মধ্যেকার সেই নিরাপদ চেয়ারখানা। সেই চেয়ারে বসেই কত লোকের কত ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। কত লোকই তো সেজন্যে তাঁকে ঈর্ষা করে। ওই চেয়ারখানায় বসবার জন্যে কত পার্টি, কত পার্টি-বাজি! এত বছর ধরে ওই চেয়ারটাতে বসে আছি, আজ যদি অন্য কেউ আমাকে চেয়ার ছাড়তে বলে তো তাতে আমি অসন্তুষ্ট হই কেন? আমার কি তবে রিটায়ারমেণ্ট্ নেই? এতদিন যদি কারো ভালো করতে না পেরে থাকি তো আর কবে কার ভালো করবো? আসলে ভালো কে কার করতে পারে? আমার বদলে যারা আসবে তারাই কি দেশের কিছু ভালো করতে পারবে? আর পরের ভালো করবো বললেই কি করা যায়? বড়জোর চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু সেই চেষ্টা করতে গেলে আগে তো নিজেকে তৈরী করতে হবে। নিজেকে কি আমি তৈরী করেছি? এই চেয়ার পাবার আগে আমি যা ছিলাম এখন কি আমি তাই আছি? মানুষকে চরিত্র-গঠন করতে আমি বক্তৃতা দিই সভায় সভায়। কিন্তু নিজের চরিত্র কি গঠন করতে পেরেছি? জার্মানীর এক কবি বলেছিলেন যে—We learn from history that we do not learn from history. আমার আগে যে চীফ মিনিস্টার এসেছিলেন, তাঁকেও তো একদিন যেতে হয়েছে। ভোটের দিনে যেদিন আমি তাঁকে হারিয়ে দিলুম, সেদিন তাঁর সে কী যন্ত্রণা? এক মাস ধরে তাঁর ঘুম ছিল না। ভোটের দিন মুহুর্মুহু খবর আসছে আর তিনি হিসেব করছেন। যখন তিনি হারতে আরম্ভ করলেন তখন স্ট্রোক হলো। পরের দিন যখন পাকা খবর বেরোল তিনি আমার বাড়িতে এলেন।

আমি তো তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেছি।

বললাম—কী সৌভাগ্য আমার—আপনি এসেছেন?

তখনও থর-থর করে কাঁপছেন তিনি। যে-মানুষ রাজনীতি করে সে যে এত দুর্বল হয় তা জানতাম না।

তিনি বললেন—আমি তোমাকে congratulate করতে এসেছি জ্যোতি, তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ আমি এতে খুশী—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তার মানে?

—মানে we learn from history that we do not learn from history. কথাটা আগে পড়েছিলাম, কিন্তু মনে ছিল না। আমি হারবো না তো কে হারবে? আমি ভোটে জেতবার পর তো একবারও ভাবিনি যে আমাকে আবার ভোটে নামতে হবে। আমি ভেবেছিলুম আমি চিরকালই চীফ মিনিস্টার থাকবো।

তারপর আর কথা বললেন না। চলে যাচ্ছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত গেলাম।

গাড়িতে ওঠবার মুখে আমার দিকে ফিরে বললেন—কাল রাত্তিরে আমার স্ট্রোক হয়েছিল খবরটা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে ওই কবিতাটা মনে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বসলুম। কথাটা তোমাকেও বলে গেলুম। পাঁচ বছর তোমার মেয়াদ, পাঁচ বছর পরে আবার তোমাকেও ভোটে দাঁড়াতে হবে। আমার এই শেষ, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার লোকের অভাব হবে না। তখন যেন এই কথাটা তোমার মনে থাকে—We learn from history that we do not learn from history. আচ্ছা চলি—

আমার মনে হলো ভদ্রলোক যেন আমায় নোটিস দিয়ে গেলেন।

নোটিস!

আমার রাইটার্স বিলডিং-এ আবহমান কাল ধরে কত নোটিসই বেরিয়েছে। আমি আসবার আগেও বেরিয়েছে, আমি আসবার পরেও। কতবার কত নোটিসে আমার সেক্রেটারি আমার কাছ থেকে সইও নিয়ে গেছে। সে-নোটিস কেউ পড়েছে, আবার কেউ বা পড়েনি। যারা পড়েছে তাদের কী লাভ হয়েছে তা কেউ জানে না, আবার যারা পড়েনি তাদেরই বা যে কী লোকসান হয়েছে তা-ও কেউ জানে না।

আর তা ছাড়া আর একটা কথা। মানুষের স্বভাবই এই যে যেখানেই 'নোটিস' লেখা থাকবে সেটা না পড়া। নোটিসকে অনেকেই মনে করে উপদেশ। উপদেশ যেমন কেউ শুনতে চায় না, নোটিসও তেমনি কেউ পড়তে চায় না। আমার সরকার শহরের রাস্তায়, ঘাটে, রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফরমে, বাসে, ট্রামে, পার্কে, দেয়ালের গায়ে অনেক নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও দিন তা পড়ে না, পড়েওনি। না-পড়ার কারণ তারা প্রমাণ করতে চায় যে তারা নির্বোধ নয়। আর তুমি উপদেশ দেবে আর আমি তা শুনবো? তুমি এত বড় মহাপুরুষ আর আমি এত আহাম্মক!

ত্রৈলোক্যদা একবার বলেছিলেন—এই দেখ, এতদিন জেলখানায় কাটালাম এই নোটিসবোর্ডে কী লেখা আছে তা কখনও পড়িনি—

যেখানে লেখা থাকে 'Commit no nuisance', সেখানেই বেশি করে লোকে নুইসেন্স সৃষ্টি করে। যেখানে লেখা থাকে smoking prohibited, সেখানেই দেখা যায় লোকে বেশি করে বিড়ি খায়। কারণ যাদের জন্যে ওই নোটিস লেখা হয় তারা হয় লেখা-পড়া জানে না নয়তো লেখাটা পড়ে না, আর তা ছাড়া নিষিদ্ধ কাজ করার মধ্যেও বোধ হয় এক ধরণের আত্মরতি তৃপ্ত হয়। কে জানে!

ভূষণদাসবাবুর নোটিসের গল্পটাও বলেছিলেন ত্রৈলোক্যদা। ভূষণদাস সরকার কিম্বা ভট্টাচার্য। যাক্, পদবী নিয়ে আমার কি হবে ওটা তো ভুল-পরিচয়। ভুল-পরিচয়ের গল্প যখন নয় এটা তখন পদবী যা-ই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এটা ব্যক্তির কাহিনী, আর যেহেতু ব্যক্তির কাহিনী হয়েও এটা পৃথিবীর সব মানুষের কাহিনী তখন সকলের পক্ষেই এটা উপাদেয়।

ভূষণবাবু ছাপোষা মানুষ। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনী নিয়ে সংসার করেন। কলকাতার শহরতলীতে একটা বাড়ি করেছেন। সবটা শেষ করতে পারেননি। দু'ছেলে চাকরি করে। একটা মেয়ের বিয়ে দিতে তখনও বাকি। গৃহিণী নেই। কেন্তু যে-ছেলেটা সমস্ত সংসারটার ঝক্কি সামলায় সে হলো কেষ্ট।

আসলে ভূষণবাবুর বাড়িতে উঠতে কেষ্ট বসতে কেষ্ট। কেষ্ট, তামাক দে। কেষ্ট, দোকান থেকে আধপোয়া সরষের তেল নিয়ে আয়। কেষ্ট, খোকাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আয়।

কর্তার কাছেই হোক আর বৌমাদের কাছেই হোক কেষ্টই সব। হুকুম

করবার সবে-ধন-নীলমণি।

কিন্তু এই সবে-ধন-নীলমণিই একদিন মারা গেল।

কর্তা, ছেলেরা, বৌমারা সবাই চোখে অন্ধকার দেখলে। কেষ্ট নেই অথচ সংসার চলছে এটা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু দেখা গেল আবার সংসার ঠিক চলছে। রাজা চলে গেলেও যেমন রাজ্য চলে তেমনি কেষ্টর অবর্তমানেও সংসার চলতে লাগলো। তবে সব ঝক্কি এসে পড়লো বুড়ো-মানুষ ভূষণদাসবাবুর ঘাড়ে। কেষ্টর বদলে ভূষণবাবুর বৌমারা রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এসে বলে—বাবা, দোকান থেকে একটু নুন নিয়ে আসতে হবে, একেবারে নুন ফুরিয়ে গেছে—

এই রকম কোন দিন নুন, কোনও দিন সরষের তেল, কোনও দিন মশলা। এ ছাড়া সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাজার করা আছে, দুপুরবেলা বাড়ির ঝিকে দরজা খুলে দেওয়া আছে, দুধের দোকানে গিয়ে লাইন দেওয়া আছে। তারপর আছে নিজের হাতে তামাক সেজে খাওয়া। এর ওপর ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

ভূষণবাবু একেবারে নাজেহাল।

তা এই রকম একদিন সামনের পুকুরের ওপারে বসে নাতি-নাতনী সামলাচ্ছেন আর তামাক খাচ্ছেন। শীতকাল। বাড়িতে বৌমারা সংসারের কাজে ব্যস্ত। ছেলেরা অফিসে যাবে। কিন্তু কর্তার কোনও কাজ নেই তাই তিনি তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন আর হুকোটা নিয়ে তামাক খাচ্ছেন। আর তদারকী করছেন যেন কেউ পুকুরের ধারে না যায়।

হঠাৎ এক নাতি বলে উঠলো—দাদু, ওই যে কেষ্ট—

কেষ্ট! ভূষণবাবু অবাক হয়ে গেলেন নাতির কথা শুনে। বললেন—কী রে, কোথায় কেষ্ট?

নাতি বললে—ওই তো পুকুর-ঘাটে পৈঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—

সত্যিই তো! ভূষণবাবু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন। ঘাটে তখন বহু লোক চান করতে নেমেছে। একেবারে পৈঠের মাথার ওপর তাঁর কেষ্ট এক মনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এ কী রকম হলো! তিনি অবাক হয়ে গেলেন কেষ্টকে দেখে। তাঁর বেশ স্পষ্ট মনে আছে কেষ্ট মরে গেল, তিনি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে পুড়িয়ে এলেন। তাহলে আবার সে বেঁচে ফিরে এল কী করে?

তিনি আর কৌতূহল চাপতে পারলেন না।

চেঁচিয়ে ডাকলেন—কেষ্টা, এই কেষ্টা—কেষ্টা—

কেষ্ট দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে বললে—আজ্ঞে যাই বাবু—

বলে এক দৌড়ে কাছে এল। ভূষণবাবু বললেন—কী রে, তুই বেটা কোত্থেকে? তুই যে গেল বছরে মরে গেলি, আমি তোকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলুম, আবার তুই বেঁচে এলি কী করে?

—আজ্ঞে আমি তো এখন আর বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই মানে? বেঁচে নেই তো এখানে কী করছিস?

—আজ্ঞে আমি এখন যমরাজার কাছে কাজ করছি। যমরাজার হুকুম তামিল করতেই তো এখানে এইচি—আমি ওই হরিপদবাবুর ছেলেকে নিয়ে যেতে এইচি। ওঁকে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে আমার ওপর—

ভূষণদাসবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন। ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলেন। সত্যিই পাড়ার হরিপদবাবুর মেজ ছেলেটা তখন গায়ে তেল মেখে চান করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূষণবাবু বললেন—ওকে তুই নিয়ে যাবি? জোয়ান ছেলে যে—বলছিস কী? ও চান করে খেয়ে অফিসে যাবে যে—

কেষ্ট বললে—তা কী করবো বাবু, আমি তো হুকুমের চাকর, আমার ওপরে যে হুকুম হয়েছে, আমি হুকুম তামিল করেই খালাস—এখ্খুনি দেখুন না কী হয়—

বলতে-না-বলতে ওদিকে হরিপদবাবুর মেজ ছেলেটা জলে নামতে গিয়ে পেছল পৈঁঠের ওপর আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সব মানুষের ভিড় জমে গেল চারদিকে। ডাক্তার এল, ওষুধ এল, তাকে ধরাধরি করে সবাই বাড়িতে নিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

কেষ্ট বললে—তা হলে আসি বাবু, দেরি হয়ে গেলে আবার কর্তা বকাবকি করবে—

—কর্তা মানে?

—আজ্ঞে কর্তা মানে আমার প্রভু, যমরাজা—

বলে কেষ্ট চলে যাচ্ছিল। ভূষণবাবু বললেন—ওরে, একটু দাঁড়া, একটা কথা শুনে যা বাবা, তুই তো যমরাজার কাছে চাকরি করিস, তা আমার একটা কাজ করতে পারবি বাবা?

কেষ্ট তখন যাবার জন্যে ছট্‌ফট করছে। বললে—বলুন না কী কাজ?

ভূষণবাবু বললেন—আমাকে নিয়ে যাবার জন্যেও তো একদিন তোর ওপর হুকুম হবে, তা সেই হুকুম হবার আগে তিনি যেন আমাকে একটা নোটিশ দেন। এই ধর্, ছ'মাস আগে। ছ'মাস আগে নোটিশ পেলেই আমি কাজগুলো সব গুছিয়ে রাখতে পারি আর কি! পারবি বাবা কাজটা করতে? তুই এ্যাদ্দিন আমার বাড়িতে কাজ করেছিস, তোকে কত খাইয়েছি পরিয়েছি, এ কাজটুকু আমার জন্যে করতে পারবি নে বাবা?

কেষ্ট বললে—আজ্ঞে খুব পারবো। এ আর এমন বড় কথা কী! আমি কর্তাকে বললেই তিনি একটা নোটিশ দিয়ে দেবেন—বলে চলে গেল।

তখন থেকে ভূষণবাবু বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে লাগলেন। আর কোনও ভাবনা নেই। ছ'মাস আগে কেষ্ট নোটিশ দেবে। ছ'মাস হাতে পেলে তিনি সব কাজ গুছিয়ে নিতে পারবেন। ছ'মাস সময় অনেক সময়। তখন থেকে ভূষণবাবুর আর কোনও উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। বেশ আরামে খাওয়া-দাওয়া করেন, বেশ আরামে বাজার করেন, দিবানিদ্রা দেন। বড় নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন। কেষ্টই তাঁর জীবনে এই শান্তি এনে দিয়েছে। দীর্ঘজীবী হোক কেষ্ট।

তা এমনি করে যখন সময় কাটছে তখন হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা তাঁর বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে টোকা পড়লো। ভূষণবাবু তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। দরজায় টোকা পড়তেই ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। বোধ হয় ঠিকে-ঝি বাসন মাজতে এসেছে। এই সময়েই সে রোজ আসে।

কিন্তু দরজা খুলে দিতেই অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন কেষ্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বললেন—কী রে, তুই হঠাৎ?

কেষ্ট বললে—আজ্ঞে আপনাকে নিতে এসেছি, চলুন—

কথা শুনে ভূষণবাবু ভীষণ ধাক্কা খেলেন যেন। বললেন—নিতে এসেছিস মানে?

—আজ্ঞে কর্তা হুকুম দিয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে—

ভূষণবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন এবার। বললেন—সে কী রে? আমাকে নিয়ে যেতে হুকুম হয়েছে? তোকে যে বলা ছিল আমাকে ছ'মাস আগে নোটিশ দিতে? নোটিশ পেলে আমি এদিককার কাজ-কর্মগুলো গুছিয়ে নেব? তা তুই সব ভুলে মেরে দিয়েছিস?

কেষ্ট বললে—আজ্ঞে না বাবু আমি ভুলিনি। আমি আপনাকে নোটিশ দেবার কথা কর্তাকে বলেছিলুম। তা কর্তা শুনে রেগে গেলেন। বললেন—বুড়ো হলে দাঁত পড়ে, চুল পাকে, চোখে কম দেখে, ওইটেই আমার নোটিশ। ওই নোটিশ পেলেই কাজ-কর্ম গুছিয়ে নিতে হয়। অন্য নোটিশ দেবার নিয়ম আমার নেই—

ত্রৈলোক্যবাবুর গল্পটা আজ যেন আমার নিজের কাছেও সত্যি বলে প্রমাণ হলো। আজকের এই বিক্ষোভ, আজকের ওই স্লোগান, আর এই পুলিস-পাহারা, এও মনে হলো যেন আমার নোটিস। এই নোটিস দেখেই বুঝে নিতে হবে যে এবার আমায় যেতে হবে। এবার কাজ-কর্ম গুছিয়ে নিতে হবে। এবার বিদায়ের পালা।

কিন্তু তবু মনের ভেতর থেকে যেন কথাটার সায় পেলাম না। এমন সাজানো সংসার কী করে ছাড়ি? আমি বেঁচে থাকবো অথচ চীফ মিনিস্টার থাকবো না, এ দু'টোর সামঞ্জস্য কেমন করে করবো?

প্রত্যেক বিবেচক বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যেই বোধহয় এই রকম দু'টো মানুষ থাকে। একটা মানুষ বলে—চলো। আর একটা মানুষ বলে—থামো। একটা মানুষ চায় সংসার, আর একটা মানুষ চায় অমৃত। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়িতে গেলে বুকে বাজে'—এ-কথা তো আমাদের কবিই লিখে গেছেন। কিন্তু কবিরা তো অনেক কথাই লিখে যান আর মহাপুরুষরাও তো অনেক উপদেশই দিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের নিজেদের তো সে উপদেশ পালন করার দায় নেই। উপদেশ আর বাণী পালন করার দায়িত্ব সব আমাদের। আমরা বাস্তবকে অস্বীকার করে অমৃতের আস্বাদ নিতে নারাজ। বরং ঝঞ্ঝাট নেব তবু অধিকার আমরা ছাড়বো না। এই অধিকার ছাড়তে চাই না বলেই যারা সব কিছুর অধিকারী হয়ে বসে আছে তাদের অধিকার ছাড়ানোতেই আমাদের যত আনন্দ।

হঠাৎ চারদিকে হাততালির শব্দে আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

চেয়ে দেখলাম আমি সভাপতির আসনে বসে আছি। আর কখন যে আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমি টেরই পাইনি।

আরো চেয়ে দেখলাম খুব মোটা একটা ফুলের মালা। মালাটা গলা থেকে খুলে সামনের টেবিলের ওপর রাখলাম। মালাটার ওপর বড়-বড় গোলাপ ফুল। তার সঙ্গে রাংতার তবক। আগাগোড়াই গোলাপ ফুলের মালা। এত বড় গোলাপ সাধারণতঃ আমি খুব কমই দেখেছি।

আশে-পাশে অনেক গণ্যমান্য অফিসার আর লীডাররা সব ফিস্-ফিস্ করে কথা বলছিল। সভা যাতে নির্বিঘ্নে চলে তার জন্য সবাই সতর্ক হয়ে ছিল। দু'লাখ টাকা জমির ওপর দশ কি পনেরো লাখ টাকার মীটিং, এ কি সহজে পণ্ড হতে দেওয়া যায়! নইলে যে তাদের প্রমোশন বন্ধ হয়ে যাবে!

একজন কর্তা মতন নেতাকে নিচু গলায় ডাকলুম। বললুম—শুনুন—

আমার ডাক শুনে একেবারে তিন-চার জন শশব্যস্তে দৌড়ে এল।

বললে—স্যার, কিছু বলছেন?

বললাম—এ মালাটার দাম কত?

তারা তো অবাক! মালার দাম! মালার দামের খবর কে জানে! বৃহৎ ব্যাপারে সামান্য একটা মালা এমন কিছু জিনিস নয় যে মহারথীরা তার দাম নিয়ে মাথা ঘামাবে। সামান্য টাকার মামলা যেখানে সেখানে জজের যেমন মাথাব্যথা থাকে না, উকিল মুহুরি পেশ্‌কারেরও তেমনি কোনও মাথাব্যথা থাকে না। কারণ বড় মামলায় বড় ঘুঁষ, ছোট মামলায় কম ঘুঁষ। এ যুগে মালের গুণটা বড় কথা নয়, মালের মুনাফাটা নিয়েই যত দর কষাকষি। মালাটা যদি লাখ টাকার জিনিস হতো তাহলে সবাই দরটা জানতো। যেমন জমি-ভাড়ার দরটা সবাই জানে, প্যাণ্ডেলের দরটাও সবাই জানে। মালাটার দর এক টাকা হতে পারে, আবার একশো টাকাও হতে পারে। অত সামান্যর দিকে কারো ঝোঁক নেই। ঝোঁকটা বড়র দিকে। বড়র দিকে বটে কিন্তু ভূমার দিকে নয়।

মালার দর-দাম জানতে চেয়ে চীফ মিনিস্টার যে সকলকে এমন বিব্রত করে ফেলবে এ কথা আগে কেউই কল্পনা করতে পারেনি। নইলে আগে থেকেই মালার একটা ফাইল তৈরি হয়ে যেতো। কৃষি কনফারেন্সের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আলাদা-আলাদা ফাইল তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন মিস্টার রায়। কিন্তু মালার মত তুচ্ছ জিনিসের হিসেব কে আর রাখবে? বিয়ে বাড়ির উৎসবের আয়োজনে মাছ মাংস কেনার ব্যাপার নিয়ে কর্তামশাই নিজে মাথা ঘামান, কিন্তু কলাপাতা? কলাপাতা তো তুচ্ছ জিনিস। ওটা

হারাধন কিম্বা কেষ্টধন যে-কেউ গিয়ে কিনে নিয়ে আসুক। কিন্তু আমি জানি সবাই জিনিসের মূল্যমান নির্ণয় করে তার দামের তারতম্য দিয়ে। একই জিনিস, ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে। কিন্তু আগে তার দামটা জানা চাই। আগে বলো ওটা সস্তার জিনিস, না দামী! তাহলে আমি বলে দেব ওটা খারাপ জিনিস, না ভালো।

একবার আমার পি-ডব্‌লিউ-ডি মিনিস্টার একটা বিল্‌ দিয়েছিল খরচের। আমার ফাইন্যান্স সেক্রেটারি বিল্‌টা পাস করেনি। বলেছিল খরচের খতিয়ানটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিল্‌টা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসেছিল।

আমি দেখলুম তাতে লেখা আছে তিনটে ডিনার বাবদ খরচ হয়েছে তিন হাজার টাকা।

আমি অবাক হয়ে গেলুম টাকার অঙ্কটা দেখে! পি-ডবলিউ-ডি মিনিস্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—এ কী হে, তিনটে ডিনারে তিন হাজার টাকা খরচ দেখিয়েছ কেন?

পি-ডবলিউ-ডি মিনিস্টার বললে—আমি ওটা চেক্‌ করেছি স্যার, ওটা ঠিক আছে। ওরা তিন জনই আমেরিকান ডেলিগেট কি না। আমেরিকানদের তো আর তিরিশ টাকার ডিনার খাওয়াতে পারি না। ওরা তিন জনেই আবার ওয়ার্লড্‌ ব্যাঙ্কের মেম্বার! ইজিপ্ট্‌ কি নাইজেরিয়ার ডেলিগেট হলে অবিশ্যি একশো টাকাতেই কাজ সেরে দিতুম—

বললাম—কেন?

—কী বলছেন স্যার, আমেরিকা আর নাইজেরিয়া? আমেরিকা কত বড়লোক!

বললুম—কিন্তু ফরসা হোক আর কালোই হোক পেট তো দু'জনেরই সমান হে। আর তা ছাড়া তিন হাজার টাকায় তিন জনে কী এমন হাতী-ঘোড়া খেলে শুনি? সোনা খেলে নাকি?

পি-ডবলিউ-ডি মিনিস্টার বললে—কাকদ্বীপের মতন জায়গায় কিছু তো পাওয়া যায় না স্যার, তাই সবই তো নতুন করে কিনতে হলো। নতুন কাঁটা চামচ, টেবিল্‌ ক্লথ্‌, কাচের গেলাস, স্নায় টেবিল, চেয়ার, সবই তো কিনতে হলো নিউ মার্কেট থেকে। কাকদ্বীপের মতন জায়গায় তো কিছুই পাওয়া যায় না।

এতক্ষণে বুঝলুম। অথচ জাপানে গেলে জাপানীরা জাপানী খানা খেতে দেয়, চীনে গেলে চীনে-ম্যানরা চাইনিজ খাবারই খেতে দেয়। ইণ্ডিয়া গরীব দেশ, কিন্তু তাতে কী! আমেরিকানরা ইণ্ডিয়াতে এলে আমরা তাকে আমেরিকান খাবারই খেতে দেব। তাতে আমার যত হাজার টাকাই লাগুক। আমেরিকানরা ইণ্ডিয়াতে এলে তাদের আমরা আমেরিকান গাড়িতেই চড়তে দেব। ইণ্ডিয়াতে তৈরি গাড়িতে চড়তে দিলে লজ্জায় পড়বো। আমরা দেখবো কে বড়লোক, কে বড়লোক নয়। আমাদের ব্যবহারের তারতম্য হবে ব্যবহার-গ্রহীতার আর্থিক ঐশ্বর্য আর পদমর্যাদা বিচার করে।

ততক্ষণে 'বন্দে মাতরম' গান শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ ওদিক থেকে বিকট শব্দে একটা বোমা ফেটে উঠল। আমি চকিত না-হবার ভান করলুম। কিন্তু সভার বেশির ভাগ লোক তখন উঠে পড়েছে। পালাবে কিনা ভাবছে। ওদের জন্যেই আমার দুঃখ হতে লাগলো। ওই যাদের সভায় ডেকে আনা হয়েছে। ওরা ভোটার। ওরা না এদিকে, না ওদিকে। ওরা আমাকেও চেনে না, আমার আগে যে চীফ মিনিস্টার এসেছিল তাকেও চেনে না, আমার পরে যে চীফ মিনিস্টার আসবে তাকেও চিনবে না। আমার আগেও ওরা কত বোমার আঘাত খেয়েছে। ব্রিটিশরা ওদের মাথা লক্ষ্য করেই গুলি মেরেছে, এখন আমরা আবার ওদের বোমা মারছি। আবার আমাদের পরে যারা আসবে তারাও ওদেরই বোমা মারবে। এমনিই বরাবর অনাদিকাল থেকে চলে এসেছে, আবার অনাগত ভবিষ্যৎকালেও তাই চলবে। আগেও যেমন ওদের কেউ বাঁচাতে পারেনি, পরেও ওদের তেমনি কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আমার এস-ডি-ও লাউড-স্পীকারে চিৎকার করে ওদের উদ্দেশ্যে বললে—আপনারা উঠে যাবেন না, চুপ করে বসে থাকুন—কোনও ভয় নেই—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কেউ কেউ যেমন আমাদের কথায় ভরসা পায় কিন্তু কেউ কেউ তেমনি আবার ভয়ও পায়। আমরা ওদের অভয়দাতা, কিন্তু ভয়দাতাদেরও একেবারে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা নেই ওদের। কারণ ওরা এতদিনের অভিজ্ঞতায় জেনে ফেলেছে যে আজকের ভয়দাতারাই আবার দরকার হলে একদিন ভোল্ পালটে অভয়দাতা সাজে। ওদের এই জ্ঞানটুকু হয়েছে যে আসলে ওরা উলুখাগড়া। রাজায়-রাজায় ঝগড়ার বলি হবার জন্যেই ওদের

সৃষ্টি। সেক্সপীয়ারের নাটক 'জুলিয়াস সিজারে'র ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াসদের দাবাখেলার ঘুঁটি। যার নাম জনতা।

তা এ-সব বোমা গুলি বন্দুক আগেও আমি দেখেছি, এখনও দেখছি। আরো কিছুদিন রাজনীতিতে থাকলে হয়ত আরো দেখবো। আর শুধু রাজনীতিরই বা দোষ কী! সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, কোথায় রাজনীতি নেই? তবু ও-গুলোর সঙ্গে রাজনীতির একটা বিরাট ফারাক আছে। সাহিত্যে দর্শনে শিল্পে চিরকালটাই সব, কিন্তু রাজনীতিতে শুধুই ক্ষণকাল। রাজনীতিতে যে-নেতা মানুষের মনে যত আশার কুহক জাগাতে পারবে এবং শেষে তাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবে, সেই নেতাই নিজের আসন তত পাকা করে নিতে পারবে। সে-ই আরো বড় নেতা হতে পারবে। সেই নেতাই আরো বেশি ভোট পাবে। কিন্তু শিল্পের জগতের নিয়ম আলাদা। সেখানে ভোটপ্রথা অচল। শিল্পীও রাজনীতিকদের মত আশা দেবে আনন্দ দেবে। কিন্তু তার পর মই কেড়ে নিয়ে নিজের আসন পাকা করার অভিপ্রায় থাকা শিল্পীর পক্ষে অপরাধ। রাজনীতিক আর শিল্পী দু'জনেই আনন্দের শেয়ার কেনে। কিন্তু রাজনীতিক তার ডিভিডেণ্ড্ খায় নিজেই, আর শিল্পীর শেয়ারের ডিভিডেণ্ড্ খায় জনসাধারণ। রাজনীতিকের যশ পুরোন হলে তামাদি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু শিল্পের জগতে তামাদির আইন খাটে না।

হঠাৎ প্যাণ্ডেলের এক কোণে একটা আগুন দেখা দিলে।

আমার এস্-ডি-ও এবার আর থাকতে পারলে না। বললে—স্যার, আমি একবার উঠি—

বলে মিস্টার রায় উঠে দেখতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল তার আগেই আমার পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ তার দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

আমি স্থিতধী হতে চেষ্টা করলাম। 'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ' তো স্থিতধী মানুষেরই লক্ষণ। জ্যোতির্ময় সেন কোনও কিছুতেই বিচলিত হবেন না। জ্যোতির্ময় সেন একদিন ইংরেজের জেলখানাতে গিয়েও বিচলিত হন্‌নি। পুলিসের লাঠি খেয়েও বিচলিত হননি। জ্যোতির্ময় সেনই কতবার বক্তৃতায় সকলকে বলেছেন—অভয় হতে। কতবার তিনি বলেছেন—আমি ইংরেজদের জেলখানাকে ভয় করিনি, পুলিসের বন্দুককেও ভয় করিনি। একমাত্র যাকে ভয় করি সে হচ্ছে ভয়। আপনারা সেই ভয়কেই

জয় করতে শিখুন। তবেই আপনাদের মুক্তি। শৃঙ্খল থেকে মুক্তির চেয়ে বড় হলো ভয় থেকে মুক্তি! এ-সব কথা একদিন তিনিই বলেছেন, আর আজ কিনা তিনি নিজেই ভয় পাবেন!

এই আজকের বক্তৃতাতেও আমি এই ভয়ের কথা লিখেছি। আজকে জ্যোতির্ময় সেনের বক্তৃতার মধ্যে অনেক কথা আছে। অনেক ভালো ভালো কথা তাঁর সেক্রেটারি তাঁকে লিখে দিয়েছে। এমন সব কথা লিখে দিয়েছে যা কুইন ভিক্টোরিয়া, যিশুখৃষ্ট, লেনিন, তথাগত বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব, স্বামী বিবেকানন্দ সবাই বার-বার তাঁদের বক্তৃতায় বলে গেছেন। কোটি কোটি লোক এ-সব কথা আগেও শুনেছে, আজকেও আবার এরা সেই একই কথাগুলো শুনবে। তিনি বলবেন—আপনারা অন্ধকার থেকে আলোতে আসুন, মৃত্যু থেকে অমৃতে আসুন। ভয় থেকে অভয়ে আসুন! আপনারা অন্ধকার মৃত্যু আর ভয় জয় করুন। এই জয়ই হবে আপনাদের পুরস্কার, এই ভয়-জয়ের সংগ্রামই হবে আপনাদের পুনর্জন্ম!

এই সব ভালো ভালো কথা শুনে আমার শ্রোতারা জোরে জোরে হাততালি দেবে আর আমি ভাববো আমায় লোকে কত শ্রদ্ধা করছে, কত সম্মান করছে, কত ভালোবাসছে। তারপর সকলকে ধন্য করে আমি জন-সভার শেষে সকলের বিগলিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে হাত জোড় করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেব। এই লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্মেলনের খবর আর ছবি তার পরদিন এ দেশের সব কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে ছাপা হবে। আমি সকাল বেলা চা খেতে খেতে সেই খবরগুলো পড়বো আর ছবিগুলো দেখবো। এর পর রাইটার্স বিলডিংএ যখন খবরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টাররা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন খুশী হয়ে তাদের বলবো—আপনাদের কভারেজ খুব ভালো হয়েছে—

বরাবর এই-ই চলে এসেছে। আমি যতদিন চীফ মিনিস্টার হয়েছি ততদিন এই-ই করে আসছি। আমি ময়নাডাঙায় যাবার আগে সেখানে যত কর্ম-ব্যস্ততা ছিল, কনফারেন্সের শেষে আমি চলে আসবার পর আবার তত অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। এস-ডি-ও আবার তার হেড্-কোয়ার্টারে গিয়ে ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, টি-এ বিল্ করে যথাস্থানে পাঠাবে। আর বিল্ স্যাংশনের জন্যে বার বার রাইটার্স বিলডিংএ তাগাদা করবে। শঙ্কর আবার সেই তার মণ্ডল কংগ্রেসের অফিসে বসে বসে আড্ডা জুড়বে আর

চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে তার যে কত আলাপ আছে সেই কথাটা সবিস্তারে সাত কাহন করে দশজনকে শোনাবে। আর যাদের জন্যে কন্‌ফারেন্স, যাদের ভালোর জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ সেই শুটুয়া দিগম্বররা আবার ময়নাডাঙ্গার গঞ্জে সা'মশাইএর আড়তে কিম্বা বীরচকের ইটখোলায় কাজ করতে ছুটবে কিম্বা কোনও বড়লোকের মড়া পোড়াতে পাবার সুযোগের আশায় আকাশের দিকে চেয়ে দিন গুনবে।

—গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না—

ওই, আবার স্লোগান! কিন্তু এবার আরো অনেক দূরে। এবার নিশ্চয়ই আরো পুলিস-পাহারা বেড়েছে। আমায় এস-পি খুব বিচক্ষণ লোক। ইতিমধ্যে অন্ততঃ দু'শো লোককে নিশ্চয়ই গ্রেফ্‌তার করে ফেলেছে। আজকের মিটিং কিছুতেই পণ্ড করতে দেবে না সে। আর যদি পণ্ড হয় তো তার পদাবনতি আর বদ্‌লি কেউই যে রোধ করতে পারবে না এটা সে ভালো করেই জানে। আজকাল যারা চাকরি করে না তারা কাজ করে প্রাণের দায়ে, ভালোবাসার দায়ে নয়। আর যারা চাকরি করে তারা কাজ করে ভয়ের দায়ে, ভক্তির দায়ে নয়। প্রাণের দায়ে আর ভয়ের দায়ে যে কাজ হয় তা আসলে কাজ নয়, দায়সারা। এই দায়সারা কাজ করবার লোকের সংখ্যা এত বেড়েছে বলেই আজ কাজে এত ফাঁকি। এই শঙ্কর, এই রায়, এই মন্মথবাবু, এই কেষ্ট হালদার, রথীন সিকদার, এরা সবাই দায়সারার দলে। এদেরই তাই আজ এত বাড়-বাড়ন্ত। এদেরই আজ তাই এত প্রাধান্য।

আবার আর এক কোণ থেকে সেই পুরোন স্লোগান—গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না—

আমি আর পারলাম না! আমার তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো—তোমরা কারা আমি তা জানি, তোমাদের গলার আওয়াজ শুনে আমি বুঝতে পারি যে তোমরাও এই শঙ্কর এই মন্মথবাবু এই কেষ্ট হালদার আর এই রথীন সিকদারের দল। এরা যেমন আমাকে তোষামোদ করে সিদ্ধিলাভ করতে চায়, তোমরাও তেমনি আমাকে অপসারণ করে সিদ্ধিলাভ করতে চাও। কিন্তু আমাকে তোষামোদ করলেই কি তোমাদের সিদ্ধিলাভ হবে, না আমাকে অপসারণ করলেই গরীবদের স্বর্গলাভ হবে? গরীব বড়-লোক—ও-সব তো স্লোগান। স্লোগান দেওয়া ছাড়ো। কোনও কথা যখন

স্লোগানে পরিণত তখন কি তার আর কোনও দাম থাকে? তোমরা তো কোনও দিন বলোনি যে মানুষকে মানুষ হতে দিতে হবে! তোমরা তো কোনও দিন বলোনি যে মানুষকে ভালোবাসতে দিতে হবে! তোমরা তো কখনও এমন স্লোগান দাওনি যে—মানুষ দিয়ে মানুষ মারা চলবে না! তোমাদের দরকার নিজেদের মন্ত্রী হওয়া, তাই বুঝি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষেপিয়ে তোমরা মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী হবার ভান করছো। কিন্তু তোমরা কি সত্যিই মানুষ-দরদী? আসলে এ-কথা তো তোমরা জানো না যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে প্রথমেই মানুষ হওয়া দরকার! প্রথমে মানুষ না হলে মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব আছে তাকে নিঃশেষ করে কেমন করে তার মধ্যে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলবে? কখনও কি মানুষকে তোমরা আপন জন বলে অনুভব করেছ? আগে তো মানুষ হতে হবে তোমাকে, তবে তো ডাক্তার হয়ে সেই মানুষের চিকিৎসা করবে, বিজ্ঞানী হয়ে সেই মানুষকে জ্ঞান দেবে। তোমরা ডাক্তার হতে চাও, বিজ্ঞানী হতে চাও, মন্ত্রী হতে চাও, ইনজিনীয়ার হতে চাও, অনেক কিছুই তোমরা হতে চাও। কিন্তু এ-সব কিছু তো মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যেই। কিন্তু সেই মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরী করো। দিকে দিকে তোমাদের শুধু দরকারী কথার ভিড়, ভালোবাসার কথা কই? কেবল তোমাদের ক্ষণকালের কথা, চিরকালের কথা কই? কেবল তোমাদের সমাজের কথা, ব্যক্তির কথা কই? কেবল তোমাদের শান্তির কথা, সততার কথা কই? আমাকে হটালে আমি হটবো, সঙ্গে সঙ্গে আমার পার্টিও হটে যাবে, কিন্তু আমার পার্টির আদর্শ? আমাদের হটালেই কি আমাদের আদর্শকে হটাতে পারবে? দরকারী কথাকে হটালেই কি ভালবাসাকে হটাতে পারবে? ক্ষণকালকে হটালেই কি চিরকাল হটে যায়? সমাজকে অস্বীকার করলেই কি ব্যক্তি হটে? না শান্তির কথা বললে সততার আদর্শ মিথ্যে হয়? মেঘ সৃষ্টি হয় ধ্বংসের জন্যে, কিন্তু সূর্য? তিনশো কোটি বছরেরও বেশি দিন ধরে সূর্য কেমন করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে তা কি জানো? স্বাভাবিক নিয়মে এতদিনে তার ধ্বংস হলো না কেন? বিশ্বসৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কেমন করে সে একই হারে আলো আর উত্তাপ দিয়ে চলেছে? তার কারণ সূর্যের মধ্যেই সৃষ্টি আর সংহার একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে। একদিকে তৈরী হচ্ছে হিলিয়াম, আর একদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইলেক্‌ট্রন আর নিউট্রন্। মানুষের চরিত্রের মধ্যেও তেমনি যা

গ্রহণ করবার তাকে গ্রহণ করে যা কিছু বর্জন করবার তা বর্জন করতে হয়। এই গ্রহণ-বর্জনের সমন্বয় সাধনের মধ্যে যে-জীবন, তা-ই তো মহাজীবন। এই মহাজীবনের সাধনা যাতে সহজ হয় তার জন্যেই তো সাহিত্য, শিল্পী, বিজ্ঞান, সমাজ যা কিছু সব।

জ্যোতির্ময় সেনের মনে হলো সভার মানুষ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে খানিকক্ষণের জন্যে। তাঁর সামনে আর কিছু নেই, কেউ নেই। অনাদিকাল আর অনাগত ভবিষ্যৎ যেন তাঁর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। কবে একদিন তিনি শিশু ছিলেন, কবে বন্দী ছিলেন ব্যারিস্টার সেনের বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে, কবে সব বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়লেন। কবে নিজেকে জানার মধ্যে দিয়ে সকলকে জানবার চেষ্টা করলেন, সেই সমস্ত স্মৃতি যেন এক মুহূর্তে তাঁকে গ্রাস করতে এল! মনে হলো, কই, আমি তো নানার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে দিতে পারিনি। আগেও এক ছিলাম, এখনও সেই একই তো আছি। এ যেন সেই বহুর সম্মেলনেও বিশিষ্ট হয়ে বাঁচা। অথচ 'আমি'কে প্রসার না করতে পারলে আমার তো কোনও উপযোগিতা নেই। আমি তো সেই ব্যক্তি-বিন্দু হয়েই জীবন কাটিয়ে দিলাম, নিজেকে বহুর মধ্যে ব্যাপ্ত না করতে পারলে আমার অস্তিত্ব তো নিরর্থক।

ততক্ষণে চার দিকে ঝড় উঠেছে। এক-একটা বোমা ফাটে আর সমস্ত ডায়াসটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। কিন্তু না, আমি হেরে যাবো না। আমি বিচ্ছিন্ন হবো না, বিষণ্ণ হবো না, নিঃসঙ্গ হবো না। আমি যদি বাঁচি তো তোমাদের সকলকে নিয়ে বাঁচবো। যদি মরি তো সে শুধু আমার শারীরিক মৃত্যু হোক, আমার অদৃশ্য অন্তরাত্মা তোমাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করুক। একদিন বাড়ি ত্যাগ করেছিলাম বাড়ির চেয়ে বৃহত্তর বাড়ি পাবো বলে, বাড়ির চেয়ে আরো বড় বাড়ির আশ্রয় পাবো বলে। সে-বাড়ি আমি পেয়েছি। আমার এই দেশ, এই দেশের মানুষ, এই দেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছুর মধ্যে এখন আমি সেই আমার 'আমি'র সন্ধান পেয়েছি। আমার ব্যক্তি-বিন্দুকে আমি দিনে দিনে বিশ্ব-বিন্দুতে পরিণত করেছি, এখন এই কৃষি-সম্মেলনে এসে বিশ্ব-বিন্দুর স্বরূপ দেখতে চেয়েছি। তোমরা আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তো তোমাদের ত্যাগ করতে পারবো না। কারণ তোমাদের ত্যাগ করলে আমার যে নিজের 'আমি'কেও ত্যাগ করতে হয়।

হঠাৎ হাততালির শব্দে জ্যোতির্ময় সেনের যেন সম্বিৎ ফিরে এল।

—বাঃ চমৎকার! চমৎকার—

পাশে এস-ডি-ও নিজের মনেই কথাগুলো বললে। আমি মিস্টার রায়ের দিকে চেয়ে দেখলাম। মিস্টার রায় বললে—খুব চমৎকার হয়েছে স্যার আপনার লেকচার—দেখছেন, সবাই কেমন চুপ করে শুনছে। কেউ একটুকু গোলমাল করেনি—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আমি বক্তৃতা দিয়েছি নাকি?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু একটু আগেই যে বোমা ফাটার শব্দ হলো!

মিস্টার রায় বললেন—না স্যার, ও তো পুলিস টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছিল। প্রায় পঞ্চাশ জনকে অ্যারেস্ট করার পর আর কেউ টুঁ শব্দ করতে পারেনি, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—

আমি আরো অবাক। বক্তৃতাও বোধ হয় এক ধরণের নেশা। মদের নেশার মত এও যে মানুষকে এমন করে মাতাল করে দেয় আমি জানতুম না। নেশার ঘোরে আমি কিছুই টের পাইনি।

বললাম—দেখবেন, যেন ফায়ারিং না হয়—

—না স্যার, ফায়ারিং হবার আগে আপনার পারমিশন্ নিয়ে নেব—

—হ্যাঁ, ফায়ারিং মানেই হার মানা। ফায়ারিং হলে অপোজিশনের সুবিধে হয়ে যাবে।

এর পর সভা শেষ হবার কথা। আমার এস-ডি-ও বললে—আর একটু বসুন স্যার, আর এক মিনিট—

আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখলাম সামনের দর্শকদের মধ্যে থেকে কে একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি চমকে উঠেছি। এই তো নুটু! নুটু তাহলে এতক্ষণ আমার সামনেই বসে ছিল! ঠিক সেই নুটু। তবে অনেক বুড়ো হয়েছে। না, তার পায়ে আর কোনও খুঁত নেই। একেবারে শিরদাঁড়া সোজা করে আমার দিকে হেঁটে আসছে। মাথার চুলগুলো দেখছি সব পেকে গেছে। আমারও পেকেছে। কিন্তু নুটুর মাথার চুল যেন আমার চেয়ে বেশি পাকা। আমার দিকে হাত-জোড় করে অভিবাদন করার ভঙ্গি তার। আমাকে কি সে তার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে! কিম্বা অভিনন্দন! আমি চীফ মিনিস্টার হয়েছি বলে তার আনন্দ হয়েছে। দশ জনকে সে মাথা উঁচু করে বলতে পারবে যে আজকের এই চীফ মিনিস্টার

আমার বন্ধু। এই জ্যোতির্ময় সেন একদিন এই ময়নাডাঙ্গায় এসে আমার সঙ্গে একসঙ্গে সা'মশাই-এর আড়ত থেকে খড়ের খেপ নিয়েছে। বীরচকের ইটখোলায় মাথায় করে ইট বয়েছে। আমাদের বাড়িতে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খেয়েছে। এখন মন্ত্রী হবার পর আর আমাকে চিনতে পারবে না বটে, কিন্তু এককালে আমাদের দু'জনের খুব ভাব ছিল গো। আমি জ্যোতিদের বাড়িতে গিয়েছিলুম। কলকাতায় ওদের কত বড় বাড়ি কত ঘর। ময়নাডাঙার বাবুদের বাড়ির চেয়েও বড় বাড়ি।

এসো এসো হুটু, এসো। আজকে তুমি এই যাকে দেখছো এ আসলে সেই তোমার পুরোন জ্যোতিই। এ আমি সেই আগেকার আমিকে ভোলেনি তাই তোমাকেও ভোলেনি সে। এই যে আজ আমি ময়নাডাঙায় এসেছি সভা করতে, এ কিন্তু তোমাকে দেখবো বলেই। আজ হয়ত আর তোমার বাড়িতে যেতে পারবো না, তোমাদের বাড়ির মাটির দাওয়ায় বসে পান্তা ভাত খেতে পারবো না, তোমার সঙ্গে আমি আজ নিরিবিলিতে বসে সব কথা বলতেও পারবো না। আজ আমার এস-ডি-ও আমার এস-পি কেউই আর আমাকে তোমার সঙ্গে সেই আগেকার মত একাকার হয়ে মিশতে দেবে না। কিন্তু আমি সেই আমিই আছি। আমি সেদিনকার সেই ময়নাডাঙার জীবন অতিক্রম করে আরো অনেক দূরের পথ পরিক্রমা করে অনেক দেখে অনেক শিখে আবার এই ময়নাডাঙাতেই তোমার কাছে ফিরে এসেছি। আমি অনেক খ্যাতি, অনেক প্রতিষ্ঠা, অনেক সম্মান পেয়ে দেখেছি যে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সম্মান ও-সব কিছুই নয়। ওতে মন ভরে না। কিন্তু তবু ওই খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সম্মান সব কিছুর জন্যেই এখনও লড়াই করে চলেছি। মণিহারের মত ও এখনও আমার গলায় ঝুলছে। ও হার গলায় পরতে গেলেও লাগে, আবার খুলতে গেলেও বাজে। এ আমি কী করি? তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে অথচ আবার একাত্ম হতে গেলেও সঙ্কোচ এসে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ সেই স্বামী বিবেকানন্দের বলা গল্পটার মত। সে-গল্প তো তোমায় বলেছি। সেই তাতার সৈন্যটার মত। পালিয়ে আসতেও দেবে না, আবার বন্দী হতেও বাধা দেবে। এরই নাম তো সংসার হুটু! তাই তো বলছিলাম আমিই আমার চরম শত্রু আবার আমিই আমার পরম বন্ধু। রামকৃষ্ণদেব বলতেন—ভিবের ভেতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হয়ে গেলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়।

তখন গাছটা আপনিই মড় মড় করে ভেঙে পড়ে। কিন্তু আমি সরে দাঁড়াতে পারিনি। সরে দাঁড়াতে যেদিন পারবো সেদিন তোমার আমার মধ্যে আর বাধার ব্যবধান থাকবে না। তখন আমি আর চীফ মিনিস্টার থাকবো না। তখন মানুষ হবো তোমার মতো। আর সত্যিই তো, তোমার তো ভয় পাবারই কথা! মানুষে মানুষেই মিল হয়, চীফ মিনিস্টার তো আর মানুষ থাকে না। তাই মানুষ আর চীফ মিনিস্টারে মিলবে কী করে?

এতক্ষণে যেন নুটুর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিলে। সেই হাসির সঙ্গে যেন একটু ভয়ের ছিটেও মেশানো। যেন রেশনের চালের সঙ্গে কাঁকর।

আমি তখন দার্শনিক হয়ে উঠেছি। উদার হয়ে উঠেছি। আমি যে চীফ মিনিস্টার তা তখন ভুলে গিয়েছি। সে এসেই আমার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে মাথা নিচু করতে যাচ্ছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি। বললুম—ছিঃ নুটু, ছিঃ—

পাশ থেকে মিস্টার রায় বলে উঠলো—এ স্যার আমাদের এখানকার কৃষি প্রতিযোগিতায় এবার ফার্স্ট হয়েছে—এ স্যার এক বিঘে জমিতে পঁয়ত্রিশ মণ ধান ফলিয়েছে!

আমি নুটুর দিকে চেয়ে অবাক। নুটুর অবস্থা এত ভালো হয়েছে! এক বিঘেতে পঁয়ত্রিশ মণ ধান! একদিন এই নুটুই তো বীরচকের ইঁটখোলায় মাথায় করে ইঁট বয়েছে, সা'মশাই-এর আড়তে খড়ের খেপ্ নিয়ে গেছে রেলস্টেশনে। তখন এক ফোঁটা জমিও ছিল না। আজ যে নুটুর অবস্থা এত ভাল হয়েছে এ কৃতিত্বের পেছনে যেন আমারও খানিকটা ভূমিকা আছে। আমি আজ এ-রাজ্যের চীফ মিনিস্টার। আমার আমলেই এ-রাজ্যের চাষীদের উন্নতি হয়েছে, এ-রাজ্যের একজন চাষী অন্ততঃ এক বিঘে জমিতে পঁয়ত্রিশ মণ ধান ফলিয়েছে, একথা ভাবতেই আমার আনন্দ হলো।

আশে-পাশে তখন আমার মুখের দিকে চেয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখে এমন একটা ভাব যেন আমিই এই পঁয়ত্রিশ মণ ধানের ফসল ফলিয়েছি।

মন্মথবাবু বললেন—সবই আপনার জন্যে সম্ভব হয়েছে স্যার—

কেষ্ট হালদার রথীন সিকদার তাদেরও যেন সেই একই মত। তারা সবাই আমার চারদিকে দাঁড়িয়ে আমাকে তোষামোদ করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তখন আমার আর মনে হলো না যে তারা আমাকে তোষামোদ করছে। মনে

হলো ওটা আমার প্রাপ্য। মনে হলো ওরা একবারের জন্যে হলেও এবার সত্যি কথা বলছে।

এস-ডি-ও মিস্টার রায় আমার হাতে একটা ব্রোঞ্জ-এ তৈরি লাঙলের ছবি খোদাই-করা পাত্র দিলে। বললে—স্যার, এইটে আপনি হাতে করে ওকে দিন—

আমি পাত্রটা দেখতে লাগলাম। চমৎকার শিল্প-কর্ম। হুটু এটা তার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে। এটা সে তার জ্যোতির হাত দিয়ে পেয়েছে, এটাও তার একটা বাড়তি গৌরব।

হঠাৎ নজরে পড়লো ব্রোঞ্জের লাঙলের ছবির নিচে লেখা রয়েছে—ভোলাই মণ্ডল—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এখানে ভোলাই মণ্ডলের নাম লেখা রয়েছে কেন?

মিস্টার রায় বললে—এই চাষীর নাম স্যার ভোলাই মণ্ডল, অনেক জমি-জমা, প্রায় তিনশো বিঘে জমির মালিক এ, এর শ্বশুর উজির মণ্ডল এখানকার একজন মস্ত জোত্‌দার—

কথাটা পুরো শোনবার আগেই আমার হাত থেকে পাত্রটা ডায়াসের ওপর পড়ে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তবে কি আমি আমার সামনে ভূত দেখছি? আমার কি সত্যিই নেশা হয়েছে? আমি ভুল শুনছি? না এতক্ষণ যা-কিছু দেখছি সবই স্বপ্ন! না, এই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে মন্মথবাবু, শঙ্কর, কেষ্ট হালদার, রথীন সিকদার, মিস্টার রায়, এরাও সব হুটুর মতই মিথ্যে! ছিঃ ছিঃ, তাহলে কি বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছে!

সবাই একসঙ্গে ব্রোঞ্জের পাত্রটা আবার আমার হাতে তুলে দিলে। আমি কোনও রকমে সেটা ভোলাই মণ্ডলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যেন নিষ্কৃতি পেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু সেই হুটুর কী হলো? নটবর হালদার? ময়নাডাঙার দক্ষিণপাড়ায় গিয়ে যাকে ডেকে আনতে বলেছিলাম?

মিস্টার রায় বললে—আমি দক্ষিণপাড়ায় গিয়েছিলাম স্যার, নিজে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে তো নেই স্যার—

—সেখানে নেই? তা সেখানে নেই তো এখন যেখানে আছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করে ডেকে আনতে পারলে না? আমি তো তার সঙ্গে দেখা

করবার জন্যেই এখানে এসেছি—

মিস্টার রায় বললে—কিন্তু আমি গিয়ে শুনলাম সে মারা গেছে স্যার!

—মারা গেছে?

—হ্যাঁ স্যার, গেল বছরে নটবর হালদার মারা গেছে। তার ছেলে-মেয়ে বউ কেউই নেই, তারাও মারা গেছে—

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম—কী করে মারা গেল তারা?

মিস্টার রায় বললে—সেই যে লাস্ট্ ইয়ারে এখানে খরা হয়েছিল, সেই খরার সময় অনেক লোক মারা গিয়েছিল—

—তা সে-সময়ে তো আমি টেস্ট্-রিলিফ দিতে অর্ডার দিয়েছিলুম।

মিস্টার রায় বললে—টেস্ট্-রিলিফের জন্যে সাত লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল স্যার, কিন্তু তার অর্ধেক যে মেরে দিয়েছিল পে-মাস্টাররা। সেই জন্যেই চালের গুদাম লুঠ হলো। আর সেই লুঠের সময়েই নটবর হালদার পুলিসের গুলিতে মারা যায়—

আমি চম্‌কে উঠলাম—পুলিস ফায়ারিং করেছিল? কার হুকুমে?

—স্যার, আপনিই তো অর্ডার দিয়েছিলেন ফায়ারিং করতে। আমি এখান থেকে আপনাকে রাইটাস বিলডিং-এ টেলিফোন করলাম, আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম কী করবো, আপনিই তো বললেন ফায়ার করতে—

কথাটা শুনে আমি কিছুক্ষন স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। মনে হলো এতক্ষণে আমি যেন আমার প্রকৃত 'আমি'-কে দেখতে পেলাম। আমি আত্ম-দর্শন করলুম। এ-বড় মর্মান্তিক দর্শন আমার। দেখতে পেলুম এই 'আমি'ই আমাকে এতদিন মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, এই 'আমি'ই আমাকে সকলের 'আমি' হতে বাধা দিয়েছে। বুঝতে পারলুম কেন সব নদীই গঙ্গা নয়, কেন সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, কেন সব কবিই কালিদাস নয়, কেন সব দার্শনিকই কপিল নয়, কেন সব মৃগই কস্তুরি-মৃগ নয়, কেন সব মানুষই মানুষ নয়। ঠিক তেমনি আবার কেন সব আমিই 'আমি' নয়। তোমার মধ্যে আমি 'আমি'কে দেখতে পাই না, তাই তো 'তার' মধ্যেও 'আমি' অনুপস্থিত। তাহলে কী করে 'আমি' 'তোমার' হবো, 'তার' হবো, 'সকলে'র হবো? 'সকলে'র 'আমি'র সঙ্গে একাকার হবো, একাত্ম হবো? আর অন্তর্দিনেও যদি তা না হতে পেরে থাকি তো তাহলে আমার এই চীফ মিনিস্টার হওয়াও যে

মিথ্যে, আমার সব ত্যাগও যে মিথ্যে, আমার সব সম্মানও যে মিথ্যে, আর এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই কৃষি-কন্‌ফারেন্স, তাও যে মিথ্যে! আর আজকের দেওয়া এই ফুলের মালা? যে-মালা আমি এই গলায় ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি?

আমার সব কথা মনে পড়লো। কবে ময়নাডাঙাতে খরা হয়েছিল, কবে ফুড্-রায়ট হয়েছিল, সে কতদিন আগে। কিন্তু তখন কি জানি সেদিনকার সেই আমার হুকুম দেওয়া পুলিসের গুলি এত দিন পরে আবার আমার বুকে এসে বিঁধবে! কে আমার এ যন্ত্রণা বুঝবে? এ নিয়ে আমি কার কাছে অভিযোগ করবো, কার কাছে আমার আর্জি পেশ করবো! কে আমার এই খ্যাতির প্রায়শ্চিত্ত করবে! আমার আগের চীফ মিনিস্টারের শেষ কথাটা আমার বার বার কানে বাজতে লাগলো—We learn from history that we do not learn from history. We learn from history…

শঙ্করের কথায় আমার হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল—স্যার আপনি ফুলের মালাটার দর জিজ্ঞেস করেছিলেন?

আমি তার দিকে মুখ তুলে হতবাকের মতন চেয়ে দেখলাম।

—ওটার দাম দেড় শো টাকা স্যার। নিউ-মার্কেটের বেস্ট্ দোকান থেকে কিনেছিলুম। কিন্তু একটা পয়সাও দাম নেয়নি সে। বলেছিল চীফ মিনিস্টারের জন্যে মালা নিচ্ছেন, ওর জন্যে আবার দাম নেব কী? তার চেয়ে বরং চীফ মিনিস্টারের কাছ থেকে আমাকে একটা সার্টিফিকেট আদায় করে দেবেন—আমি আমার দোকানে সেটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখে দেব—

এতক্ষণ অনেক কষ্টে জ্যোতির্ময় সেন যেটা চেপে রেখেছিলেন, শঙ্করের কথা কানে যেতেই সেটা আর বাধা মানলো না। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। জল পড়তে লাগল বটে কিন্তু তা হুটুর শোকে নয়, তাঁর 'আমি'র শোকে।

॥ শেষ ॥